প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্য

(প্রথম খণ্ড)

শ্রীকালিদাস রায়।

রসচক্র সাহিত্য-সংসদ্

রসচক্র সাহিত্য-সংসদ্
হইতে শ্রীজয়দেব রায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।
সন্ধ্যার কুলায় ৭১।১৩, রসা রোড,
টালিগঞ্জ, কলিকাতা।

মূল্য—১।৷০
আশ্বিন, ১৩৪৯

মুদ্রাকর—শ্রীনীলকণ্ঠ ভট্টাচার্য্য
দি নিউ প্রেস
১, রমেশ মিত্র রোড, ভবানীপুর,
কলিকাতা।

ভূমিকা

এই গ্রন্থ প্রাচীন সাহিত্যের ইতিহাস নয়—ইহা প্রাচীন সাহিত্যের আলোচনা মাত্র। ঐতিহাসিক দিক হইতে বিচার করিলে কোথাও কোথাও ত্রুটী ধরা পড়িতে পারে।

ছন্দে লিখিত প্রাচীন পাণ্ডু-লিপি যাহা কিছু আবিষ্কৃত হইয়াছে—সে সমস্তকেই এদেশে প্রাচীন সাহিত্য বলিয়া চালানো হয়। যাহা প্রকৃত সাহিত্য নয়—তাহা এগ্রন্থের আলোচনার বিষয়ীভূত নয়।

বৈষ্ণবপদাবলীর বিচারে একটা বড় অসুবিধা আছে। একই পদ একাধিক কবির নামে পাওয়া যায়। এ জন্য দুই এক স্থলে ভুলভ্রান্তি ঘটিতে পারে। ৩১ পৃষ্ঠার ২য় ৩য় পংক্তিতে একটি ভুল চোখে পড়িল, ১৪৬ পৃষ্ঠায় ২য় ৩য় পংক্তিতে তাহা অবশ্য সংশোধিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় খণ্ডে গৌরাঙ্গ চরিত, গৌরাঙ্গ-গীতিকা, মঙ্গলকাব্য, শিবায়ন ও রামপ্রসাদ ইত্যাদি কবিদের রচনা সম্বন্ধে আলোচনা থাকিবে। মাত্রাজ্ঞানের অভাবে 'কৃত্তিবাস প্রসঙ্গ' অযথা দীর্ঘ হইয়াছে। পাঠকগণের সমীপে নিবেদন, যদি কোন দোষ ত্রুটী চোখে পড়ে, দয়া করিয়া জানাইলে পরবর্ত্তী সংস্করণে সংশোধন করিয়া লইব। ইতি

সন্ধ্যার কুলায়
টালিগঞ্জ, কলিকাতা।

শ্রীকালিদাস রায়।

সূচি-পত্র

প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্য

বিদ্যাপতি

বিদ্যাপতি বাঙ্গালী বৈষ্ণব কবিদের গুরুস্থানীয়। গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস ইত্যাদি বহু বাঙ্গালী কবি বিদ্যাপতির ভাব ও ভাষা গ্রহণ করিয়া পদ রচনা করিয়াছেন। ইঁহারা অনুকরণ ও অনুসরণের দ্বারা গুরুর মর্য্যাদা বাড়াইয়াছিলেন। ইঁহাদের রচনা যে হিসাবে বাংলা কবিতা বলিয়া আদৃত হইয়াছিল বিদ্যাপতির পদও সেই হিসাবে বাঙ্গালীর সম্পত্তি বলিয়া গণ্য। ভাষার জন্য বিদ্যাপতিকে বাদ দিলে এইরূপ অনেক শ্রেষ্ঠ কবিকেই বাদ দিতে হয়। তাহা ছাড়া—খাটি বাংলার কৃষ্ণকীর্ত্তন, ময়নামতীর গান ও শূন্যপুরাণের ভাষার তুলনায় বিদ্যাপতির বঙ্গদেশে প্রচলিত পদাবলীর ভাষা আমাদের কাছে ঢের বেশি পরিচিত ও অন্তরঙ্গ। সে যুগের অন্যান্য কবির ভাষার মত বিদ্যাপতির ভাষাও বাংলা ভাষারই একপ্রকার প্রাচীন রূপ। বাংলা দেশের সীমা তখন পশ্চিমে অনেক দূর পর্যান্ত বিস্তৃত ছিল। সেকালের বাংলার পশ্চিম অঞ্চলের কোন কোন স্থানের ভাষা ও তথাকথিত মৈথিলীতে বিশেষ কোন প্রভেদ ছিল না। প্রভেদ সামান্য ছিল বলিয়াই বাঙ্গালী কবিরা এত সহজে বিদ্যাপতির ভাষা আয়ত্ত করিয়া সেই ভাষায় বিদ্যাপতির মতই পদ রচনা করিতে পারিয়াছিলেন।

শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্বেই বিদ্যাপতির পদাবলী বঙ্গদেশে সমাদৃত হইয়াছিল। স্বয়ং শ্রীচৈতন্যদেব স্বরূপ দামোদরের মুখে বিদ্যাপতির

পদের আবৃত্তি শুনিয়া আনন্দ উপভোগ করিতেন। ইহাতে মিথিলার কবি বঙ্গদেশে অভিনব মর্য্যাদা ও অধিকতর সমাদর লাভ করিয়াছিলেন।

বিদ্যাপতির পদাবলী বঙ্গদেশে শ্রীচৈতন্য-প্রবর্ত্তিত আবেষ্টনীর মধ্যে যে সমাদর ও রসব্যঞ্জনা লাভ করিয়াছে, তাহাতে বঙ্গদেশে যেন তাহাদের পুনর্জ্জন্ম হইয়াছে। এই জন্মান্তরে হয়ত কিছু রূপান্তরও ঘটিয়াছে। মিথিলায় উহাদের মূল্য এক, বাংলায় মূল্য আর। বাংলা দেশ ঐগুলিকে যে-ভাবে প্রাণের বস্তু বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে, মিথিলা তাহা পারে নাই; এমন কি বাঙ্গালা দেশে বিশিষ্ট সমাদরের ফলে মিথিলায় বিদ্যাপতির সমাদর বাড়িয়া গিয়াছে—বাংলার রসবোধ এবিষয়ে মিথিলার রসবোধকে প্রভাবান্বিত করিয়াছে। কীর্ত্তন-সঙ্গীতের মধ্যেই ঐ পদগুলি অভিনব লোকোত্তর জীবন লাভ করিয়াছে। শ্রীচৈতন্য-প্রবর্ত্তিত রসাদর্শ ঐগুলিতে আধ্যাত্মিক অর্থগৌরব (Spiritual Interpretation) দান করিয়াছে। সঙ্কলয়িতারা ও রসজ্ঞগণ বিদ্যাপতির পদগুলিকে শ্রীচৈতন্য-প্রবর্ত্তিত রসাবেষ্টনীর মধ্যে চণ্ডীদাস, লোচনদাস, গোবিন্দদাস ইত্যাদি সাধক কবিগণের পদের সঙ্গে গুম্ফিত করিয়া এবং কীর্ত্তনিয়ারা পদে নূতন নূতন ভক্তি-রসাত্মক আঁখর সংযোগ করিয়া একদিকে যেমন সেগুলিকে লোকোত্তর বা মিস্‌টিক ঐশ্বর্য্যে মণ্ডিত করিয়াছে, অন্যদিকে সেগুলিকে তেমনি বাঙ্গালীর নিজস্ব সম্পদ্ করিয়া লইয়াছে।

বিদ্যাপতি যে ভাষায় পদগুলি রচনা করিয়াছেন—সে ভাষার মত রাগমাধুর্য্য বর্ণনার উপযোগী ললিত, মধুর, স্বচ্ছ, সরল ভাষা আর্য্যাবর্ত্তে আর নাই। বিদ্যাপতির পদাবলীর সম্পাদক ৺নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় বলেন—"বিদ্যাপতি খাঁটি মৈথিলীতেই পদগুলি রচনা করিয়াছিলেন। বাংলাদেশে ঐগুলি বিকৃত রূপ ধারণ করিয়া বাংলা ভাষার কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছে। এই বিকৃত রূপই বাংলাদেশে ব্রজবুলি নামে পদ রচনার ভাষারূপে চলিয়াছে।"

কিন্তু আমরা মনে করি, কেবল গীতি-রচনার জন্যই এই ভাষা কবির নিজেরই

বা মিথিলার কবি-সম্প্রদায়ের সৃষ্টি। সুললিত মৈথিল ও সংস্কৃত শব্দের মিশ্রণে যতদূর সম্ভব যুক্তাক্ষর বর্জন করিয়া মাগধী প্রাকৃত কবিতার ভাষাকে কবি এই অভিনব রূপ দান করিয়াছিলেন এবং ইহার তিনি নাম দিয়াছিলেন অবহট্‌ঠা। (দেসিল বয়না সবজন মিঠ্‌ঠা তেঁ তইসন জম্পও অবহট্‌ঠা)। বঙ্গদেশে বাংলা শব্দের প্রভূত মিশ্রণে ইহাই ব্রজবুলি নামে চলিয়াছে। *

পিঙ্গল-সঙ্কলিত বাছাবাছা প্রাকৃত ছন্দগুলিই কবি পদরচনায় গ্রহণ করিয়াছিলেন। যাঁহাদের প্রাকৃত পিঙ্গলের দৃষ্টান্তগুলির সহিত পরিচয় আছে, তাঁহারা সহজেই বিদ্যাপতির ভাষা ও ছন্দের জন্ম-কোষ্ঠী ধরিতে পারিবেন।

বিদ্যাপতি মিথিলার রাজা শিবসিংহের সভাকবি ও সভা-পণ্ডিত ছিলেন। ইনি ১৫শ শতাব্দীর লোক। ** ইনি সংস্কৃতে শাস্ত্রগ্রন্থ এবং ব্রজবুলিতে পদাবলী রচনা করেন। প্রাকৃত ভাষার দুর্মিলবেন্দ্র, ভরহট্ট, দোহা ইত্যাদি ছন্দে ও জয়দেব-প্রবর্ত্তিত ছন্দে ইহার পদাবলী রচিত। ইনি বৈষ্ণব ছিলেন না—ইনি ছিলেন শৈব অথবা পঞ্চোপাসক।

বিশেষজ্ঞগণ বলেন,—নরনারীর চিরন্তন প্রেমলীলার নানা বৈচিত্র্য লইয়া প্রাকৃত রসরচনাই ছিল কবির অভিপ্রেত। অনেক পদে রাধাকৃষ্ণের নামগন্ধও নাই। বাঙ্গালার বৈষ্ণবগণ বিদ্যাপতির পদাবলীর প্রাকৃত প্রেম-মাধুর্যকে শ্রীচৈতন্য-প্রবর্ত্তিত রস-সাধনার অঙ্গীভূত এবং কীর্ত্তনের পালার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট করিয়া লইয়াছে।

* বাংলার জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস ইত্যাদি কবিগণ প্রচলিত বাংলাভাষা ত্যাগ করিয়া কেন যে এই ব্রজবুলিতে পদ রচনা করিয়াছিলেন সে কথার পরে আলোচনা করা যাইবে।

** বেকচেও চোরি গুপুতকর কতিংগ বিদ্যাপতি কবি ভাণ।
মহলম যুগপতি চিরে জীব জীবথু গ্যাসদেব সুলতান॥

গ্যাসদেব—গিয়াসুদ্দিন সুলতান। ইনি মিথিলারও সুলতান ছিলেন। বিদ্যাপতি সম্ভবতঃ বাঙ্গালার সুলতান গিয়াসুদ্দিনের সময়ের লোক।

বৃন্দাবনের রস-সৌন্দর্য্যের পরিবেষ্টনীর মধ্যে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা অবলম্বনে রতি-রসাত্মক কবিতা রচনা করিলে তাহা আধ্যাত্মিক ও মিষ্টিক অভিব্যঞ্জনা লাভ করিবে, এই ধারণাও সম্ভবতঃ তাঁহার মনে ছিল।

বিদ্যাপতির কবিশেখর, কবিরঞ্জন ইত্যাদি অনেক উপাধি ছিল। বিদ্যাপতির প্রবর্ত্তিত ভাষায় অর্থাৎ ব্রজবুলিতে কবিরঞ্জন, কবিশেখর, কবিবল্লভ, চম্পতি, ভূপতি ইত্যাদি ভণিতা দিয়া বাঙ্গালী কবিরাও বহু পদ লিখিয়াছেন। এজন্য অনেক বাঙ্গালী কবির পদকে বিদ্যাপতির পদ বলিয়া মনে করা হয়।

নগেনবাবু কবিরঞ্জন, কবিবল্লভ, কবিশেখর, চম্পতি ও ভূপতির পদগুলিকেও বিদ্যাপতির পদ বলিয়া ধরিয়াছেন। পদকল্পতরুর সম্পাদক সতীশবাবু এই বিষয়ে যুক্তি সাহায্যে নগেনবাবুর ভ্রম দেখাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার দুই একটি যুক্তির এখানে উল্লেখ করা যাইতেছে।

কবিবল্লভের "সখি হে কি পুছসি অনুভব মোয়। সেই পিরীতি অনুরাগ বখানইতে তিলে তিলে নূতন হোয়।" এই কবিতাটি বিদ্যাপতির হইতে পারে না। রূপগোস্বামী অনুরাগ শব্দটির যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন—তাহা তাঁহার নিজস্ব। সেই অর্থে এখানে অনুরাগ ব্যবহৃত হইয়াছে। বিদ্যাপতি তাহা কোথায় পাইবেন? গোবিন্দদাসের "আধক আধ আধ দিঠি অঞ্চলে" পদটির ভাব ও কবিবল্লভের কবিতার ভাব একই। এইপদে গোবিন্দদাস করিয়াছেন—"গোবিন্দদাস ভণে শ্রীবল্লভ জানে সদবতি রসনিরযাস।" এই শ্রীবল্লভ বা কবিবল্লভ বাঙ্গালী কবি।

কবিশেখর বিদ্যাপতির উপাধি হইলেও কবিশেখর ভণিতার পদমাত্রই বিদ্যাপতির নয়। বাংলায় চন্দ্রশেখর, শশিশেখর ইত্যাদি পদকর্ত্তা ছিলেন। রায়শেখর-ভণিতা ও শুধু শেখর-ভণিতার পদও বিদ্যাপতির হইতে পারে না। কবিশেখর-ভণিতা-যুক্ত বহুপদের ভাষায় মৈথিলী শব্দের বদলে সংস্কৃত শব্দ এবং

শ্রীচৈতন্য ও [illegible] দ্বারা প্রবর্ত্তিত নব ভাবের আভাস-ইঙ্গিত দৃষ্ট হয়, পদকর্ত্তার সখী-স্থানীয়তা-সূচক ভণিতাও দেখা যায় এবং বিশাখা, ললিতা, কুটিলা, জটিলার উল্লেখ দেখা যায়। এসমস্ত বিদ্যাপতির অজ্ঞাত ছিল। অতএব কবিশেখর-ভণিতা থাকিলেই বিদ্যাপতির পদ হইতে পারে না।

'কাজর রুচিহর রয়নি বিশালা' ও 'ঈ ভরা বাদর মাহ ভাদর শূন্য মন্দির মোর'—বিশেষজ্ঞদের মতে এই দুইটি পদও কবিশেখরের, বিদ্যাপতির নয়।

বিদ্যাপতির ভণিতায় কতকগুলি বাংলাপদও পাওয়া যায়। হরেকৃষ্ণ বাবুর মতে এইগুলি শ্রীখণ্ডবাসী কবিরঞ্জন বিদ্যাপতির রচনা। ইঁহাকে ছোট বিদ্যাপতি বলা হইত। কেবল বাংলা পদ নয়—ইঁহার অনেক ব্রজবুলির পদে কবিরঞ্জন ও বিদ্যাপতি ভণিতা আছে। সেগুলিকে মিথিলার বিদ্যাপতির পদ বলিয়া ভুল করা হয়। কেহ কেহ মনে করেন—এই বিদ্যাপতির সহিতই গঙ্গাতীরে দীন চণ্ডীদাসের মিলন ও সহজিয়া তত্ত্ব-বিচার হইয়াছিল।

বিদ্যাপতির অনেক উৎকৃষ্ট পদ নগেনবাবু মিথিলায় পান নাই—পাইয়াছেন বাংলায়। এই পদগুলি যদি বাঙ্গালী বিদ্যাপতির হয়, তাহা হইলে মিথিলার বিদ্যাপতি বাঙ্গালী বিদ্যাপতির কাছে নিষ্প্রভ হইয়া যান। আর যদি সেগুলি মৈথিল বিদ্যাপতির হয়, তাহা হইলে বলিতে হয় বিদ্যাপতির যে মর্য্যাদা মিথিলা বুঝে নাই—সে মর্য্যাদা বুঝিয়াছিল বাংলা। মিথিলার লোকেও সেগুলিকে রক্ষা করে নাই, বাঙ্গালীরাই ঐপদগুলিকে বুকে করিয়া রক্ষা না করিলে সেগুলি লুপ্ত হইয়া যাইত। মিথিলায় জন্মগ্রহণ করিলেও বিদ্যাপতি বাংলারই প্রাণের কবি।

বিদ্যাপতির পদাবলী সংস্কৃত কবিদের দ্বারা প্রভাবিত। হালা সপ্তশতী আর্য্যাসপ্তশতী, অমরুশতক, ঋতুসংহার, শৃঙ্গারতিলক, শৃঙ্গারশতক, শৃঙ্গারাষ্টক ইত্যাদি আদিরসের সংস্কৃত ও প্রাকৃত কাব্য হইতে বিদ্যাপতি

বহু ভাব সংগ্রহ করিয়াছেন। সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রের পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া সংস্কৃত কবি-প্রৌঢ়োক্তি, সংস্কৃত অলঙ্কার ইত্যাদি তিনি ভূরিভূরি গ্রহণ করিয়াছেন। নায়িকা-বৈচিত্র্য-বিন্যাসেও কবি সংস্কৃত আলঙ্কারিকদেরই অনুসরণ করিয়াছেন। বহু সংস্কৃত শ্লোকের ভাব তাঁহার রচনায় রূপান্তরিত হইয়াছে। সংস্কৃত কবিদের অনুসরণে তিনি ঋতুবর্ণনায় স্বভাবোক্তি অলঙ্কারেরও প্রয়োগ করিয়াছেন। সংস্কৃত কবির ভাবে ও রসোপাদানে তিনি নিজের মনের মাধুরী যথেষ্টই যোগ দিয়াছেন।

জয়দেবের মত বিদ্যাপতি সম্ভোগাথ্য শৃঙ্গার-রসের কবি—সৌন্দর্য্য-পিপাসার কবি। সম্ভোগের কোন লীলা-বিলাস কবির কাব্যে বাদ যায় নাই। মনে হয় কবি বাৎস্যায়নের কামসূত্র এবং জয়দেবের গীতগোবিন্দ-অনুসরণ করিয়াই যেন সম্ভোগলীলার বর্ণনা করিয়াছেন।

রাধার রূপবর্ণনার প্রত্যেক অঙ্গটি কবি সংস্কৃতকাব্য হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। বিদ্যাপতির কৃতিত্ব,—ঐগুলিকে তিনি বিবিধ অলঙ্কারে সাজাইয়াছেন। ইহা সম্পূর্ণ মণ্ডন-শিল্পের অন্তর্গত। কবি তাঁহার রচিত উপমাহৃত রূপোচ্চয়কে অনেক স্থলে জীবন্ত করিতে পারেন নাই—তাঁহার তিলোত্তমা জড় প্রতিমাই থাকিয়া গিয়াছে। এই প্রাণহীন মণ্ডন-শিল্পকেও (Decorative art) সেকালে উচ্চাঙ্গের কবিত্বই মনে করা হইত।

কলানৈপুণ্যে, গঠন-সৌষ্ঠবে, ছন্দঃশ্রীসম্পাদনে, পদবিন্যাসে বিদ্যাপতি অদ্বিতীয়। রচনার বহিরঙ্গের এইরূপ সর্ব্বাঙ্গীণ সৌষ্ঠব এক গোবিন্দদাস ছাড়া আর কাহারও রচনায় দেখা যায় না।

প্রার্থনার পদ ছাড়া বিদ্যাপতির কবিতায় শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যের কথা কোথাও নাই—কোন প্রকার মিষ্টিক ইঙ্গিত-ব্যঞ্জনাও কোথাও নাই। নাই বলিয়াই বোধ হয় শ্রীচৈতন্যদেব ঐগুলিকে উপভোগ করিতে পারিয়াছিলেন এবং শ্রীচৈতন্য-প্রবর্ত্তিত রসসাধক-সম্প্রদায় ঐগুলির এত সমাদর করিয়াছিলেন। কোন প্রকার

ঐশ্বর্য্যের বা আধ্যাত্মিকতার ব্যঞ্জনা থাকিলে শ্রীচৈতন্য-প্রবর্ত্তিত রসাদর্শের মতে রসাভাসের সৃষ্টি হইত। "ঐশ্বর্য্য-শিথিল প্রেমে নাহি মোর প্রীতি" (শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত)। রাধাকৃষ্ণের লীলা-প্রসঙ্গে প্রেমের গূঢ়তা, গাঢ়তা ও আত্মবিস্মরণের ব্যঞ্জনাই ঐ পদাবলীকে বৈষ্ণব-সমাজে পরমাস্বাদ্য ধন্ করিয়া তুলিয়াছে। বৃন্দাবনের অপ্রাকৃত পরিবেষ্টনীর মধ্যে রাধাকৃষ্ণের প্রাকৃত লীলা-মাধুর্য্য ছাড়া অন্য কিছুই বৈষ্ণব রসিক চাহে না। বিদ্যাপতি তাহা দিতে পারিয়াছেন বলিয়াই তিনি বাংলার বৈষ্ণব কবিদের গুরুস্থানীয়।

কবির রূপবর্ণনা মণ্ডন-শিল্পের অন্তর্গত, প্রকৃতিবর্ণনা অনেক ক্ষেত্রে গতানুগতিক (Conventional)। উহা রাগলীলা-বৈচিত্র্যের পটভূমিকা ও আবেষ্টনী মাত্র। সম্ভোগের বর্ণনায় কবি সুরুচির পরিচয় দেন নাই— বয়ঃসন্ধি, পূর্ব্বরাগ ইত্যাদির বর্ণনায় আলঙ্কারিকতার কৃতিত্বই দেখাইয়াছেন— অভিসার, মান, মানভঞ্জন ইত্যাদিতে মাধুর্য্য অপেক্ষা চাতুর্য্যেরই পরিচয় দিয়াছেন, একথা সত্য—কিন্তু যেখানে কবি মিলনোচ্ছ্বাসের কথা বলিয়াছেন, সেখানে তাঁহার লেখনী রসমহোৎসবে প্রমত্ত হইয়া উঠিয়াছে। উল্লাসরসের এমন উন্মাদনা প্রাচীন কবিদের মধ্যে এক গোবিন্দদাস ছাড়া আর কোন কবির রচনায় পাওয়া যায় না। আবার কবি যখন বিরহের কথা লিখিয়াছেন—তখন মনে হয় না যে—এই বিদ্যাপতিই অলঙ্কারিকতার বৈচিত্র্য ও চাতুর্য্য সৃষ্টি করিয়া একদিন তুষ্ট ছিলেন—অথবা সম্ভোগ-বর্ণনায় আত্মবিস্মৃত হইতে পারিয়াছিলেন।

যেখানে তিনি প্রেমার্ত্ত হৃদয়ের গভীর ও গূঢ় বার্ত্তা শুনাইয়াছেন—সেখানে তাঁহার আবেদনের সুরও চিরন্তন প্রেম-লোক স্পর্শ করিয়াছে এবং দেশ কাল পাত্রের সীমা লঙ্ঘন করিয়া তাহা অতীন্দ্রিয় ভাবলোকে উঠিয়াছে।

কবির কৃষ্ণগতপ্রাণা রাধার অন্য সমস্ত বিষয়ে অনাসক্তি ও ঔদাসীন্য, সুখে দুঃখে, সম্ভোগে, নৈরাশ্যে, মিলনে, বিরহে, বাগাসক্তায়, উৎকণ্ঠায় সব সময়ই

রাধার বাস্তবস্তুতে বৈরাগ্য, তাঁহার কাব্যে যে রসের সৃষ্টি করিয়াছে—তাহা চিত্তকে উদাস করিয়া তোলে। তখন জগৎ সংসারকে অসার ও এই জীবনকে মায়ার খেলা বলিয়া মনে হয়—চিরন্তন ধনের জন্য একটা অপূর্ব্ব তৃষ্ণায় প্রাণ যেন ব্যাকুল হইয়া উঠে। ইহা Mystic appeal না হইতে পারে, কিন্তু ইহার Transcendental ও Universal appealকে উপেক্ষা করা যায় না।

কবি যে সকল রচনায় মাধুর্য্য অপেক্ষা চাতুর্য্যকে প্রাধান্য দিয়াছেন, সেগুলিতে কোন অনির্বচনীয় রসের সৃষ্টি না হউক, সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি হইয়াছে। Sensuousness বলিয়া ইহাকে বিদায় করা যায় না। ইহাও এক প্রকারের আর্ট। ভাষার স্বচ্ছতা, ভঙ্গীর পরিচ্ছন্নতা, ছন্দের বৈচিত্র্য ও অনবদ্যতা, পদ-বিন্যাসের পারিপাট্য সমস্ত মিলিয়া চিত্তে এমন একটা তৃপ্তি-সুখের সৃষ্টি করে—তাহা রসানন্দ না হউক, রূপানন্দ আখ্যা পাইতে পারে। কবি কোথাও কোন অঙ্গহানি বা অক্ষমতার দ্বারা তৃপ্তিসুখ-প্রসন্ন চিত্তের প্রশান্তি নষ্ট হইতে দেন নাই। যে অপূর্ব্ব লাবণ্যে চিরসুন্দর শ্রীকৃষ্ণ আত্মবিস্মৃত, সেই লাবণ্যের পরিচয় দিতে গিয়া কবি দিশেহারা হইয়া গিয়াছেন, অলঙ্কারের ভাণ্ডার একেবারে নিঃশেষ করিয়া ফেলিয়াছেন। তিনি বিশ্বের প্রত্যেক মনোহর বস্তুর কথা ঔপম্যচ্ছলে স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন। বিশ্ব-প্রকৃতির সকল সৌন্দর্য্য সকল মাধুর্য্যের মধ্যেই যেন তিনি রাধাকে দেখিয়াছেন। বিদ্যাপতির রাধা বিশ্বসৌন্দর্য্যময়ী,—একটি লাবণ্যময়ী নারী মাত্র নয়।

বিদ্যাপতির রাধা অনবদ্য বনকুসুমের মত ফুটিয়া উঠিয়াছে। অঙ্গলাবণ্য ও বর্ণচ্ছটার গৌরবই ইহার প্রধান সম্বল নয়—মাধুর্য্য ও সৌরভই ইহার প্রধান সম্পদ্। এই মাধুরী ও সৌরভ ফুটিয়াছে—রাধার হাস্যে, লাস্যে, ভাষায়, ভূষায়, চাহনিতে, গতিভঙ্গীতে, ছলনায়, কৌতূহলে, আশায়, বৈরাগ্যে, লজ্জায়, ভয়ে, উদ্বেগে, আকুলতায়, আত্মগোপনে, আত্মপ্রকাশে, বিলাসে,

উল্লাসে, হাবভাবে এবং রসচঞ্চল কৈশোর-জীবনের নবনব ভাবরহস্যের উচ্ছল তরঙ্গ-লীলায়।

রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাপতির রাধা সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

"রাধা অল্পে অল্পে মুকুলিত বিকশিত হইয়া উঠিতেছে। সৌন্দর্য্য চলচল করিতেছে। শ্যামের সহিত দেখা হয় এবং চারিদিকে একটা যৌবনের কম্পন হিল্লোলিত হইয়া উঠে। খানিকটা হাসি, খানিকটা ছলনা, খানিকটা আড়চোখে দৃষ্টি। একটু ব্যাকুলতা, একটু আশা-নৈরাশ্যের আন্দোলনও আছে। কিন্তু তাহা তেমন মর্ম্মঘাতী নহে। * * * বিদ্যাপতির রাধা নবীনা নবস্ফুটা, আপনাকে এবং পরকে ভাল করিয়া জানে না। দূরে সহাস্য সতৃষ্ণ লীলাময়ী, নিকটে কম্পিত শঙ্কিত বিহ্বল। কেবল একবার কৌতূহলে চম্পক অঙ্গুলির অগ্রভাগ দিয়া অতি সাবধানে অপরিচিত প্রেমকে একটু মাত্র স্পর্শ করিয়া অমনি পলায়নপর হইতেছে। * * * যৌবন, সে-ও সবে আরম্ভ হইতেছে, তখন সকলি রহস্য-পরিপূর্ণ। সদ্যোবিকচ হৃদয় সহসা আপনার সৌরভ আপনি অনুভব করিতেছে। আপনার সম্বন্ধে আপনি সবে মাত্র সচেতন হইয়া উঠিতেছে। তাই লজ্জায় ভয়ে আনন্দে সংশয়ে আপনাকে গোপন করিবে, কি প্রকাশ করিবে ভাবিয়া পাইতেছে না। "কবহুঁ বান্ধয়ে কচ কবহুঁ বিথারি। কবহুঁ ঝাঁপয়ে অঙ্গ কবহুঁ উঘারি।"

হৃদয়ের নবীন বাসনা সকল পাখা মেলিয়া উড়িতে চায়। কিন্তু এখনো পথ জানে নাই। কৌতূহলে এবং অনভিজ্ঞতায় সে একবার ঈষৎ অগ্রসর হয়, আবার জড়োসড়ো অঞ্চলটির অন্তরালে আপনার নিভৃত কোমল কুলায়ের মধ্যে ফিরিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে। এখন প্রেমে বেদনা অপেক্ষা বিলাস বেশি। ইহাতে গভীরতার অটল স্থৈর্য্য নাই, কেবল নবানুরাগের উদ্‌ভ্রান্ত লীলা-চাঞ্চল্য।

বিদ্যাপতির এই পদগুলি পড়িতে পড়িতে একটি সমীর-চঞ্চল সমুদ্রের

উপরিভাগ চক্ষে পড়ে। ঢেউ খেলিতেছে, যেন উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে, মেঘের ছায়া পড়িতেছে, সূর্য্যের আলোক শত শত অংশে প্রতিস্ফুরিত হইয়া চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়াছে। তরঙ্গে তরঙ্গে স্পর্শ এবং পলায়ন, কলরব, কলহাস্য, করতালি, কেবলি নৃত্য এবং গীত, আভাস এবং আন্দোলন, আলোক এবং বর্ণ-বৈচিত্র্য। এই নবীন চঞ্চল প্রেম-হিল্লোলের উপর সৌন্দর্য্য যে কত ছন্দে, কত ভঙ্গীতে বিচ্ছুরিত হইয়া উঠে বিদ্যাপতির গানে তাহাই প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু সমুদ্রের অন্তর্দ্দেশে যে গভীরতা, নিস্তব্ধতা যে আত্মবিস্মৃত ধ্যানশীলতা আছে, তাহা বিদ্যাপতির গীতি-তরঙ্গের মধ্যে পাওয়া যায় না।"

বিদ্যাপতির পদাবলী মধুচক্রের মত—ইহার কুহরে কুহরে মাধুর্য্য। কবি ভাষার ভাণ্ডারে, ভাবলোকে, বিশ্বপ্রকৃতিতে, মনোজগতে যেখানে যত মাধুর্য্য পাইয়াছেন সমস্তই তাঁহার রচনার চাতুর্য্যের বঙ্কনীতে একত্র করিয়াছেন। সর্ব্বত্রই উৎকৃষ্ট কবিতা হইয়াছে তাহা নয়, কিন্তু সর্ব্বত্রই কিছু-না-কিছু মাধুরীর উপচয় হইয়াছে। অধিকাংশ পদে দেহ ছাড়িয়া কবির কল্পনা অতীন্দ্রিয় লোকে পৌঁছায় নাই—প্রেমের গভীর স্বরূপও প্রবেশ করে নাই। হৃদয়-সমুদ্র-মন্থনের যে অমৃত রসিক জনের অঞ্জলিতে মহাকবিরা পরিবেশন করেন—বিদ্যাপতি তাহাও করিতে পারেন নাই। তবু বিদ্যাপতির তুলনা নাই।

বিদ্যাপতির বর্ণিত বর্ষা-প্রকৃতি ও বসন্তশ্রী রতিরসের উদ্দীপন-বিভাবের কার্য্য করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই। মানব-প্রকৃতির সহিত বিশ্ব-প্রকৃতির যে একটা গূঢ় গভীর চিরন্তন সংযোগ আছে—তাহারও আভাস দিয়াছে। কবি বিরহের দিনে বসন্তকেও উপেক্ষা করিয়াছেন—কিন্তু বর্ষা-প্রকৃতির দুর্দ্দম প্রভাবকে উপেক্ষা করিতে পারেন নাই।

শেখর মোঞে পিক অলিকুল বারব কর কঙ্কণ ঝমকাই।
জপনে জলদে ধবলা গিরি বরিসব তপস্তক কওন উপাই॥

মনের যে উদাসভাব জন্মিলে মানবাত্মা দেশে দেশে যুগে যুগে বলে—পরম কাম্য ধনের সাক্ষাৎ বিনা কি করিয়া জীবন ধারণ করিব, বিদ্যাপতির বর্ষা-প্রকৃতি-চিত্রণ সে ভাব কি জাগায় না? বিদ্যাপতির রাধাহৃদয়ের হাহাকার গগনের হাহাকারের মধ্য দিয়া কি বিশ্বময় ছড়াইয়া পড়ে না?

সংস্কৃত কবিদের অনুকারক হইলেও বিদ্যাপতির আলঙ্কারিকতায় মৌলিকতাও যথেষ্ট আছে। মৌলিকতা এই হিসাবে বলিতেছি—সকল ক্ষেত্রে তিনি সংস্কৃত কাব্য নাট্যের দাগা বুলান নাই। উৎপ্রেক্ষা, অতিশয়োক্তি, ব্যতিরেক ও দৃষ্টান্ত অলঙ্কারের এত বৈচিত্র্য ও প্রাচুর্য্য কোন কবির কাব্যে আমরা দেখি নাই। কবি সব সময়ে চাতুর্য্যশ্রী ফলাইবার জন্যই অলঙ্কারের বীথি সাজান নাই, অনেক সময় দৃষ্টান্ত, প্রতিবস্তূপমা, উৎপ্রেক্ষা ইত্যাদির সমাবেশ রসকেই ঘনতর করিয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ—"সজনি কে কহ আওব মধাই" পদটির উল্লেখ করা যাইতে পারে।

বিদ্যাপতির অলঙ্কারিকতার কয়েকটি উদাহরণ দিই—

মালারূপক—শীতের ওড়নী পিয়া গিরিষির বা।
বরিষার ছত্র পিয়া দরিয়ার না॥

সমুচ্চয়—

(ক) হরি গেও মধুপুর হাম কুলবালা। বিপথে পড়ল যৈছে মালতীমালা॥
নয়নক নিঁদ গেও বয়ানক হাস। সুখ গেও পিয়া-সঙ্গ দুঃখ মম পাশ॥

(খ) ভাগে মিলয় ইহ শ্যাম রসবন্ত। ভাগে মিলয় ইহ সময় বসন্ত॥
ভাগে মিলয় ইহ প্রেম সংঘাতি। ভাগে মিলয় ইহ সুখময় রাতি॥

পরিণাম—

পিয়া যব আওব এ মঝু গেহ। মঙ্গল যতহুঁ করব নিজ দেহ॥
বেদী করব হাম আপন অঙ্গমে। ঝাড়ু করব তাহে চিকুর বিছানে॥
আলিপনা দেওব মোতিম হার। মঙ্গল-কলস করব কুচভার॥

বিনোক্তি—(ক) আন অনুরাগে পিয়া আনদেশে গেলা।
পিয়া বিনু পাঁজর ঝাঁঝর ভেলা॥
(খ) সরসিজ বিনু সর সর বিনু সরসিজ কী সরসিজ বিনু সূরে।
যৌবন বিনু তন তনু বিনু যৌবন কী যৌবন পিয় দূরে॥

ব্যাজোক্তি—নাহিয়া উঠল তীরে রাই কমল মুখী সমুখে হেরল বর কান।
গুরুজন সঙ্গে লাজে ধনী নত-মুখী কৈছন হেরব বয়ান॥
তঁহি পুন মোতিহার টুটি ফেলাওল কহত হার টুটি গেল।
সভজন এক এক চুনি সঞ্চরু শ্যাম দরশ ধনী কেল॥

ননদী স্বরূপ নিরূপহ দোষে ইত্যাদি পদটিও ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

বিভাবনা—চরণে যাবক হৃদয়ে পাবক দহই সব অঙ্গ মোর।

অর্থধ্বনি—

(ক) সোই কোকিল অব লাখ লাখ ডাকউ লাখ উদয় করু চন্দা।
পাঁচ বাণ অব লাখ বাণ হউ মলয় পবন বহু মন্দা॥

(খ) করে কর ধরি যে কিছু কহল বদন বিহসি থোর।
যৈছে হিমকর মৃগ পরিহরি কুমুদ কয়ল কোর।

(গ) চাতুর বরদন তুঁহি বনচারী। শিরীষ কুসুম হম কমলিনী নারী॥

স্বভাবোক্তি—

আওল যৌবন শৈশব গেল। চরণক চপলতা লোচন নেল॥
করু দুহুঁ লোচন দূতক কাজ। হাস গোপত ভেল উপজল লাজ।
অব অনুখন দেই আঁচরে হাথ। সগর বচন কহ নত করি মাথ

কবির বসন্তবর্ণনায় ইহার দৃষ্টান্ত যথেষ্ট মিলিবে।

প্রতিবস্তূপমা—

(ক) পুন ফিরি সোই নয়নে যদি হেরবি পাওব চেতন নাহ।
ভুজঙ্গিনী দংশি পুনহি যদি দংশয় তবহি সময় বিষ যাহ।

(খ) নির্ধনকা জঞো ধন কিছু হোয় করএ চাহ উছাহ।
শিয়ারকা জঞো শিঙ জনমএ শিরি উপারএ চাহ।
পপড়ীকা জঞো পাখা জনমএ অনল করয়ে ঝপান।
ছোটা ছোটা পানি চহচহ কর পোঠী কে নহি জান।
যই এ যকর মুহ পেচ সম দূষএ চাহএ আন।
হম তহ কে বিধহ আগর ঢোঁড়হ কাথিক ভান।
থরক পানি ডোভক কোঁঙ্গ গরব উপজু যাহি।
ভণে বিদ্যাপতি দহক কমল ভূষয় চাহএ তাহি।

অতিশয়োক্তি—

(ক) প্রথম শিরীফল গরবে গমওলহ জোগুণ গাহক আবে।
গেল যৌবন পুন পালটি না আবয় কেবল রহ পচতাবে।

(খ) মালতি সফল জীবন তোর।
তোরে বিরহে ভুবন ভময়ে ভেল মধুকর ভোর।
জাতকী কেতকী কত না আছএ সবহি রস সমান।
স্বপনেহু নহি তাহি নিহারয় মধু কি করত পান।

কণ্টক-দোষে কেতকী সঞো ঝবল হঠে আএল তুয় পাশে। ইত্যাদি পদটিও ইহার দৃষ্টান্ত।

দৃষ্টান্ত—

(ক) অধর নীরস মধু করলনি মন্দা। রাহু গরাসি নিশি তেজল চন্দা।
(খ) কুলকামিনী ভই নিজ পিয় বিলসে অপথে নহি যাই।
কি মালতী মধুকর উপভোগয় কিংবা লতাহি শুখাই।

যথাসংখ্য—

হরিণ ইন্দু অরবিন্দ করিনি হিম পিকবর বুঝ অনুমানী।
নয়ন বয়ন পরিমল গতিরুচি অও অতি সুবলনী বাণী॥

নিদর্শনা—

(ক) কুসুম বসন হিয়া ভুজে রহু সাঁঠি। বাহির রতন আঁচরে দেই গাঁঠি।

(খ) যাবৎ জনম হাম তুয়া পদ না সেবিনু যুবতি মতিময় মেলি।
অমৃত তেজি কিয়ে হলাহল পীয়লুঁ সম্পদে বিপদহি ভেলি।

(গ) অধর সুরঙ্গ জনি নীরস পবার। কোন লুটল তুয় অমিয় ভাণ্ডার।

(ঘ) হরিণী জানয়ে ভাল কুটুম্ব-বিবাধ। তবহুঁ ব্যাধক গীত শুনি করু সাধ।

ভ্রান্তিমান্—কতয়ে মদন তনু দহসি হামারি—পদটি ইহার দৃষ্টান্ত।

সমাসোক্তি—মাঘমাস শিরি পঞ্চমী গঞ্জাইলি নবএ মাস পঞ্চমহু রুয়াই…
ষোড়শ সপুণে বত্তিশ লক্ষণে জনম লেল রিতুরাই হে।

বিষমালঙ্কার—

(ক) পিয়া পরদেশ আশ তুয় পাশহি তেঁ বোলহ সখি কান।
যে প্রতিপালক সে ভেল পাবক ইথি কি বোলত আন।

(খ) কমল বদন কুবলয় দুইলোচন অধর মধুরি নিরমানে।
সকল শরীর কুসুম তুয় সিরজল কিঅ দহি হৃদয় পষানে॥ (অনুবাদ) ১

ভাবিক—অগনে আওব যব রসিয়া……বিদ্যাপতি কহ ধনি তব ধেয়ানে
ইত্যাদি পদটি ইহার দৃষ্টান্ত।

পরিবৃত্তি—কটিক গৌরব পাওল নিতম্ব। একক খীণ অওকে অবলম্ব।
প্রকট হাস অব গোপত ভেল। উরজ প্রকট অব তন্হিক গেল।
চরণ চপল গতি লোচন পাব। লোচনক ধৈরজ পদতলে যাব। ২

একাবলী—

জনম হোয়য়ে জনি জএো পুনু হই। যুবতী ভই জনময় জনু কোই।
হোইহ যুবতী জনু হো রসবতী। রসও বুঝয় জনু হো কুলবতী।

(১) ইন্দীবরেণ নয়নং মুখমম্বুজেন কুন্দেন দন্তমধরং নবপল্লবেন।
অঙ্গানি চম্পকদলৈঃ স বিধায় বেধাঃ কান্তে কথং ঘটিতবানুপলেন চেতঃ॥

(২) ইহা সম্ভবতঃ বাঙ্গালার কবিশেখরের। কিন্তু বিদ্যাপতিরই রচনার মত।

আক্ষেপ —

পিয়াক পিরিতি হাম কহই না পার। লাখ বদন বিহি না দিল হামার।

যমক —

সারঙ্গ নয়ন বচন পুন সারঙ্গ সারঙ্গ তসু সমাধানে।
সারঙ্গ উপর উগল দশ সারঙ্গ কেলি করথি মধুপানে।
[সারঙ্গ—মৃগ, কোকিল, মদন, পদ্ম, ভ্রমর]

এইগুলি বিশিষ্ট অলঙ্কারের দৃষ্টান্ত। বহু স্থলেই অলঙ্কার-সাঙ্কর্য্যের সৃষ্টি হইয়াছে। রূপকের সহিত অন্যান্য অলঙ্কার মিশ্রিত আছে। অনেক স্থানে অতিশয়োক্তির মিশ্রণ।

মিশ্র (অতিশয়োক্তি, উৎপ্রেক্ষা ও যথাসংখ্য)—

বদন মেরাএ রহল মুখমণ্ডল কমল মিলল জনু চন্দা!
ভমর চকোর দুঅও অবসায়ল পীবি অমিয় মকরন্দা।

অর্থান্তরন্যাস + বিষমালঙ্কার —

দিনকর বন্ধু কমল সভে জানয়ে জল তঁহি জীবন হোয়।
পঙ্কবিহিন তসু ভানু শুখায়ত জলহি পচায়ত সোয়।
নাহ সমীপে সুখদ যত বৈভব অনুকূল হোয়ত যোই।
তাকর বিরহে সকল সুখসম্পদ খেনে খেনে দগধই সোই।

শ্লেষাত্মক অতিশয়োক্তি —তড়িত লতা তলে জলদ সমারল
......চঞ্চরিগণ কক কোলে—ইত্যাদি

মালারূপকাত্মক উল্লেখ —

হাথক দরপণ মাথক ফুল। নয়নক অঞ্জন মুখক তাম্বূল॥
হৃদয়ক মৃগমদ গীমক হার। দেহক সরবস গেহক সার॥
পাখীক পাখ মীনক পানি। জীবক জীবন হম তুহুঁ জানি॥

সমাসোক্তিমূলক পর্য্যায়োক্তি—

চাতক চাহি তিয়াসল অম্বুদ চকোর চাহি রহু চন্দা।
তরু লতিকা অবলম্বন কারী মঝু মনে লাগল ধন্ধা॥

এইগুলি ছাড়া বিদ্যাপতির পদে রূপক, উপমা, উৎপ্রেক্ষার ছড়াছড়ি। যে কোন পদ হইতেই ইহার দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। অনেকস্থলে কবির বক্তব্য উপমা ও উৎপ্রেক্ষার দ্বারাই শুধু সফল নয়—সুস্পষ্টও হইয়াছে—যেমন—সখীশিক্ষায় শিরীষকুসুম ও ভ্রমরের বারবার উপমা দ্বারাই উপদেশ সার্থক হইয়াছে।

উৎপ্রেক্ষা—

(১) কনকলতা অবলম্বনে উয়ল হরিণহীন হিমধামা।

(২) গিরিবর গুরুয়া পয়োধর পরশত গীম গজ মোতিম হারা।
কামকম্বু ভরি কনয়া শম্ভু পরি ঢারত সুরধুনি ধারা॥

(৩) নীরে নিরঞ্জন লোচন রাতা। সিন্দূর মণ্ডিত পঙ্কজ পাতা॥

(৪) একে তনু গোরা কনক কটোরা অতনু কাঁচলা উপাম।
হারে হরল মন জনু বুঝি ঐছন ফাঁস পরায়ল কাম॥

(৫) লোচন জনু থির ভৃঙ্গ আকার। মধু মাতল কিয়ে উড়ই না পার।

(৬) চিকুরে গলয়ে জলভার। মুখশশি ভয়ে কিয়ে রোয়ে অন্ধার।

(৭) কেশ নিঙাড়িতে বহে জলধারা।
চামরে গলয়ে জনু মোতিম হারা॥

(৮) সুন্দর বদন সিন্দূর বিন্দু সামর চিকুর-ভার।
জনি রবি শশী সঙ্গহি উগল পাছ কএ অন্ধকার॥

(৯) সুরত সমাপি সুতল বর নাগর পানি পওধর আপি।
কনক শম্ভু জনু পূজি পূজারে কএল সরোরুহে ঝাঁপি।

[সেলি কামিনি গজহু গামিনি—পদটি উৎপ্রেক্ষা মালার দৃষ্টান্ত।]

(১০) মরকতস্থলী উতলি আছলি বিরহে সে ক্ষীণ দেহা।
নিকষ পাষাণে যেন পাঁচ বাণে কষিল কনক রেহা।
(উৎপ্রেক্ষার দ্বারা এখানে বস্তুধ্বনি হইয়াছে)

উপমা—

(ক) তৈলবিন্দু যৈছে পানি পসারল তৈছন তুয়া অনুরাগে।
সিকতা জল যৈছে খনহি শুকায়ল ঐছন তোহারি সোহাগে।

(খ) তাতল সৈকতে বারি-বিন্দু সম সুতমিত রমণী-সমাজে।

(গ) যৌবনরূপ তাবে ধরি সাজত যাবে মদন অধিকারী
দিন দশ গেলে সেহও পলায়ত সকল জগৎ পরচারী।
দিনে দিনে আগে সখি ঐছনি হোবহ ঘোষিণী ঘোরক মূলে।
(গোয়ালিনীর ঘোলের মত)

(ঘ) ক্ষীর দণ্ড দেই নিরসত পানি·········বিরহ বিয়োগ তবহু দূর গেল।

(ঙ) আঁচর পরশি পয়োধর হেরু। জনমপঙ্গু যেন ভেটল সুমেরু।

(চ) বেরি এক কর ধরি মুদিত নয়ান। রোগী করয়ে জনি ঔখদ পান।

(ছ) উরে দোলে শামর বেণী। কমলিনী কোরে জনু কাল সাপিনী।

রূপক—

(১) সে অতি নাগর তোঞে সব সার। পসরও মহী পেসপসার।
যৌবন নগরী বেসাহবরূপ। তাতে মূল হইহ যতে স্বরূপ॥

(২) দ্বিজপিক লেখক মসি মকরন্দা। কাঁপ ভ্রমর পদ সাখী চন্দা॥

(৩) পানি পলব গত অধর বিম্বরত দশন দালিম বীজ তোরে।
কীর দূর গেল পাশ ন আবয় ভৌহ ধনুকি কে ভোরে।

আওল ঋতুপতি রাজ বসন্ত—পদটি সাঙ্গরূপকের প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। 'আলিপন দেওব মোতিম হার······অভিষেকে' পর্যন্ত ও 'হরি যব আওব গোকুলপুর'—পদের অংশটিও একটি দৃষ্টান্ত।

কবি রাধিকার রূপবর্ণনায় বহু বার ব্যতিরেক অলঙ্কারের প্রয়োগ করিয়াছেন। উপমেয় রাধার অঙ্গের তুলনায় উপমানের অপকর্ষ দেখাইবার জন্য কবি নানা ছল-কৌশল অবলম্বন করিয়াছেন। নায়িকার রূপ-বর্ণনায় উপমেয় উপমানকে জয় করিতেছে,—এইরূপ অত্যুক্তি চির প্রচলিত প্রথা।

কবিবর রাজহংস জিনি গামিনি চললিহু সঙ্কেত গেহা।
অমল তড়িত দণ্ড হেমমঞ্জরী জিনি অতি সুন্দর দেহা।
উরুযুগ কদলী করিবর-কর জিনি স্থলপঙ্কজ পদ পাণি।
নখ দাড়িম বিজ ইন্দু রতন জিনি পিকু জিনি অমিয়া বাণী।

[এই দীর্ঘ পদটি রীতিমত উপমানের তালিকা, সংস্কৃত সাহিত্য হইতে সংগৃহীত।

কবি তাহাতেও তুষ্ট না হইয়া রাধার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের রূপজ্যোতির ভয়ে উপমানগুলিকে পলাতক করিয়াছেন।

কবরী ভয়ে চমরী গিরি কন্দরে মুখ ভয়ে চান্দ আকাশ।
হরিনি নয়ন ভয়ে স্বর ভয়ে কোকিল গতিভয়ে গজ বনবাস॥

ইহাতেও তুষ্ট না হইয়া কবি উপমানগুলিকে একত্র সন্নিবেশ করিয়া রাধার অঙ্গশ্রীর আভাস দিয়াছেন। এইরূপ উপমান-বিন্যাসকে প্রথমোক্তি অলঙ্কার বলে।

পল্লব রাজ চরণ যুগ শোভিত গতি গজরাজক ভাণে।
কনক কদলী পর সিংহ সমারল তাপর মেরু সমানে।
মেরু উপর দুই কমল ফুটায়ল নাল বিনা রুচি পাই।
মণিময় হার ধার বহু সুরসরি তঁই নহি কমল শুখাই।

আবার রাধার মুখে শ্রীকৃষ্ণের রূপ—

বিমল বিম্বফল যুগল বিকাশ। তাপর কীর ধির করু বাস।
তাপর চঞ্চল খঞ্জন জোড়। তাপর সাপিনি ঝাঁপল মোর।

পরবর্ত্তী কবিদের দ্বারা এই পদ্ধতি অনুকৃত হইয়াছিল। ইহা ছাড়া

প্রসঙ্গান্তরে 'কদলী উপরে কেশরী দেখল কেশরী মেরু চড়লা' * ইত্যাদি আছে। রাধার বদনের সহিত চন্দ্রের উপমা দিতে গিয়া কবি রাধাকে চন্দ্রাপহারিকা বলিয়াছেন। কবি রাধাকে বলিতেছেন—রাজা চুরি ধরিবার জন্য লোক লাগাইয়াছেন,— আঁচলে বদন ঝাঁপায়হ গোরি। রাজা শুনইছে চান্দকি চোরি। উপমা দিয়া আরম্ভ করিয়া কবি 'ব্যতিরেকে' শেষ করিয়াছেন—"ভয় নাই, প্রহরীকে বলিও—গগনের চাঁদ কলঙ্কী, এ চাঁদ সে চাঁদ নয়, এ চাঁদ নিষ্কলঙ্ক।"

কবি অঙ্গের উপমানগুলিকে প্রাধান্য দিয়া স্থলে স্থলে চমৎকার অর্থধ্বনির সৃষ্টি করিয়াছেন। এখানে উপমেয় গৌণ হইয়া পড়িয়াছে। উপমানের উৎকর্ষই ধ্বনিত হইয়াছে।

(১) এ ধনি মানিনি করহ সঞ্জাত।
তুয়া কুচ হেমঘট হার ভুজঙ্গিনি তাক উপরে ধরি হাত॥
তোহে ছাড়ি হাম যদি পরশব কোয়। তুয়া হার নাগিনি কাটব মোয়॥
(২) পাণি পল্লব গত অধর বিম্বরত দশন দালিম বীজ তোরে।
কীর দূরে ভেল পাশ ন আবয় ভৌহ ধনুকি কে ভোরে।

রাধার অঙ্গ-বিশেষের উপমা যোগাইতে বিদ্যাপতি জড় জীব কিছুই বাকি রাখেন নাই,—বদরী, নারঙ্গ হইতে আরম্ভ করিয়া দাড়িম্ব, বেল, তাল, চকেবা (চক্রবাক), কনক কটোরা, স্বর্ণকুম্ভ, গজকুম্ভ পর্যন্ত। বেল তাল যুগ হেমকলস গিরি কটোর জিনিয়া কুচ সাজা। কিয়ে গিরিবর কনয়া কটোরে তা দেখি লাগয়ে ধন্ধ)। তাহাতেও তুষ্ট না হইয়া কবি স্বয়ং শম্ভুকে টানিয়াছেন। শম্ভুর উপর সুরধুনীধারা ঢালিয়াই ক্ষান্ত হ'ন নাই। শ্রীকৃষ্ণের করসরোরুহে পূজিত বলিয়াই ক্ষান্ত হ'ন নাই। তাহাকে নখক্ষতের দ্বারা চন্দ্রচূড় করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন। (হিয়ার উপরে শম্ভু পূজিত বেড়িয়া বালক চন্দ্র)। কেহ কেহ বলেন—ইহাতে গঙ্গাধরের অমর্যাদা হয় নাই, পয়োধরেরই শুচিতা দ্যোতিত হইয়াছে।

এক একটি অঙ্গের লাবণ্য যেন বিশ্বপ্রকৃতির এক একজনের নিকট হইতে পাইয়া রাধা 'তিলে তিলে উত্তমা' হইয়াছিলেন। পিয়া যখন বৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন—তখন রাধার দেহে আর সে লাবণ্য থাকিল না। কবি কৌশলে সে কথা বলিয়াছেন, উপমানকে উপমেয়ের গৃহীত দান প্রত্যর্পণ করিয়া। রাধা বিশ্বপ্রকৃতিকে তাহার দান ফিরাইয়া দিতেছেন—

শরদক শশধর মুখরুচি সোপলক হরিণক লোচন-লীলা।
কেশপাশ লয়ে চমরীকে সোপল পায়ে মনোভব পীলা॥
দশনদশা দাড়িবকে সোপলক বন্ধুকে অধর রুচি দেলি।
দেহদশা সৌদামিনী সোপলক কাজর সম সখি ভেলি।

কবি অনেক স্থলে দৃষ্টান্ত, নিদর্শনা, প্রতিবস্তূপমা ও অর্থান্তরন্যাস অলঙ্কারের সাহায্যে (Epigram ও Maxim জাতীয়) সুভাষিতের সৃষ্টি করিয়াছিলেন—মৌলিক সমাশ্রয় হইতে বিচ্যুত করিলেও সেগুলি হীনপ্রাণ বা প্রাণহীন হয় না। যেমন—

১। সুজনক প্রেম হেম সমতুল। দহইতে কনক দ্বিগুণ হয় মূল।
টুটইতে নাহি টুটে প্রেম অদভুত। যৈছনে বাঢ়ত মৃণালক সূত॥
২। গণইতে দোষ গুণ-লেশ না পাওবি যত তুহুঁ করবি বিচার।
৩। সুজনক পীরিতি পাষাণক রেহা।
৪। মাণিক তেজি কাচে অভিলাষ। ক্ষীর সিন্ধু তেজি কূপে নিবাস।
৫। তিল তিল আধ যৌবন রাখবি বহই দিবস সব যাব।
ভালমন্দ দুই সঙ্গে চলি যাওব পর উপকার সে লাভ।
৬। কুক্কুরক লাঙ্গুড় নহত সমান। ৭। আশাভঙ্গ দুখ মরণ সমান।
৮। চৌরি পিরিতি হয়ে লাখগুণ রঙ্গ। ৯। ভমরা ভয়ে মাঁজরী ন লাগে।
১০। বড়েও ভুখল নহি দুহু কওরে খাএ
১১। সব সঞো বড় খিক আঁখিক লাজ

১২। নিধনকা জঞো ধন কিছু হো করএ চাহ উছাহ।
শিয়ার কা জঞো সিঙ্গ জনমএ গিরি উপারএ চাহ।

১৩। কৌড়ি পঠওলে পাব নাহি ঘোর। ধীব উধার মাগ মতিভোর।
বাস না পাবএ মাগ উপাতি। লোভক রাশি পুরুষ থিক জাতি।

১৪। সুন্দর কুলশীল ধনী বর যুবক কি করব লোচনহীনে।
কি করব তপজপ দান ব্রতাদিক যদি করুণা নহি দীনে।

১৫। ন থির জীবন ন থির যৌবন ন থির এ সংসার।
গেল অবসর পুনু না পাইঅ কীরিতি অমর সার।

১৬। থির নহি যৌবন থির নহি দেহ। থির নহি রহয় বালভু সঞো নেহ।
থির জত্তু জানহ ইহসংসার। একমাত্র থির রহ পর উপকার।

১৭। জলমধে কমল গগনমধে সূর। আঁতর চাঁদ কুমুদ কত দূর।
গগন গরজ মেহ শিখর ময়ুর। কতজন জানসি নেহ কতদূর।(অনুবাদ)

১৮। সহজে চাতক না ছাড়য় বরত না বৈসে নদী-তীরে।
নবজলধর বরিখন বিনু ন পিয়ে তাহারি নীরে।
যদি দৈববশে অধিক পিয়াস পিবয় হেরয় খোর।
তবহুঁ তোহর নাম সুমরি গলে শতগুণ লোর।

১৯। পুন ফিরি সোই নয়নে যদি হেরবি পাওব চেতন নাহ।
ভুজঙ্গিনী দংশি পুন যদি দংশয় তবহি সময় বিষ যাহ।

২০। পিতল কাটারি কামে নাহি আওল উপরহি ঝকমকি সার।

বিদ্যাপতি সাধারণতঃ চাতুর্যের কবি। সাধারণ অলঙ্কার-প্রয়োগ ও ব্যঞ্জনা-ধ্বনির সাহায্যেই তিনি এই চাতুর্যের সৃষ্টি করিয়াছেন। দুইএক স্থলের দৃষ্টান্ত দেওয়া হইতেছে। ঝাঁপয়ে বদন ঝাঁপাওহ গোরি—পদটি একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এ ধনি মানিনি করহ সঞ্জাত—পদটিও আর একটি দৃষ্টান্ত। কবির বয়ঃসন্ধি-বর্ণনার পদ দুইটি খুবই প্রসিদ্ধ। এই দুটি পদ

চাতুর্য্যের প্রকৃষ্ট নিদর্শন। 'চৌরি পিরিতি' লইয়া বিদ্যাপতি চাতুর্য্যের সহিত কত রঙ্গই না করিয়াছেন—শ্যাম ঘুমায়ত কোরে আগোরি। তহি রতি চৌট পীঠ রহুঁ চোরি—পদটি লক্ষ্য করিতে বলি। জয়দেবের ভাবানুসরণে রচিত নিম্নলিখিত পদটী অপূর্ব্ব চাতুর্য্যের দৃষ্টান্ত—

কতয়ে মদন তনু দহসি হামারি। হাম নহ শঙ্কর হঁও বর নারি।
নাহি জটা ইহ বেণি বিভঙ্গ। মালতি মাল শিরে নহ গঙ্গ॥
মোতিম বন্ধ মৌলি নহ ইন্দু। ভালে নয়ন নহ সিন্দুর বিন্দু।
কণ্ঠে গরল নহ মৃগমদ-সার। নহ ফণিরাজ উরে মণিহার॥
নীল পটাম্বর নহ বাঘছাল। কেলি কমল ইহ না হয়ে কপাল।
বিদ্যাপতি কহে এহেন সুছন্দ। অঙ্গে ভসম নহে মলয়জপঙ্ক॥

চাতুর্য্যের সহিত মাধুর্য্যের অপূর্ব্ব সংযোগের দৃষ্টান্ত-স্বরূপ একটি পদ এখানে উদ্ধৃত করি—

এ সখি রঙ্গিণি কি কহব তোয়। অরু এক কৌতুক কহনে না হোয়।
একলি আছহুঁ ঘরে হীন পরিধান। অলখিতে আওল কমল নয়ান।
এদিকে ঝাঁপিতে তনু ওদিকে উদাস। ধরণী পশিয়ে যদি পাউ পরকাশ।
করে কুচ ঝাঁপিতে ঝাঁপন না যায়। মলয় শিখর জনু হিমে না লুকায়।
ধিক্ যাউক জীবন যৌবন লাজ। আজু মোর অঙ্গ দেখল ব্রজরাজ।
ভণয়ে বিদ্যাপতি রসবতী রাই। চতুরক আগে কিয়ে চতুরাই।

সম্পূর্ণ মাধুর্য্য সৃষ্টির দৃষ্টান্ত-স্বরূপ পদেরও বিদ্যাপতিতে অভাব নাই। দু' একটির উদাহরণ দিই। আক্ষেপানুরাগের পদ—

অগোর চন্দন তনু অনুলেপন কো কহে শীতল চন্দা।
পিয়া বিনে সো পুন আনল বরিখয়ে বিপদে চিনিয়ে ভালো মন্দা।
সজনি—কানুকে কহবি বুঝায়।
রোপিয়া প্রেমবীজ অঙ্কুরে মোড়লি বাঢ়ব কওন উপায়।

তৈল বিন্দু যৈছে পানি পসারল তৈছন তুয়া অনুরাগে।
সিকতা জল যৈছে খণহি শুখায়ল ঐছন তোহারি সোহাগে।
কুলকামিনি ছিলুঁ কুলটা ভৈ গেলুঁ তাকর বচন লোভাই।
আপন করে হাম মূড় মুড়ায়লুঁ কানুসে প্রেম বাঢ়াই॥
চোর রমণি জনু মনে মনে রোয়ই অম্বরে বদন ছাপাই।
দীপক লোভে শলভ জনু ধায়ল সো ফল ভুঁজইতে চাই।
এখন তখন করি দিবস গোঙায়লুঁ দিবস দিবস করি মাস।
মাস মাস করি বরিখ গোঙায়লুঁ ছোড়লুঁ জীবনক আশ।
বরিখ বরিখ করি জনম গোঙায়লুঁ জরা আরত তনুপাশে।
হিম গরল জনু হিমগিরি বরিখয়ে কি করব মাধবি মাসে।
ভণয়ে বিদ্যাপতি ইহ কলিযুগ রীতি চিন্তা না কর কোই।
আপন করম দোষ আপহি ভুঞ্জই যো জন পরবশ হোই।

যিনি লিখিয়াছেন—

তিন বাণে মদন জিতল তিন ভুবনে অবধি রহল দুই বাণে।
বিধি বড় দারুণ বধিতে রসিকজন—সোঁপল তোহারি নয়ানে॥

তিনিই আবার লিখিয়াছেন—

নারীর দীঘ নিশাস পড়ুক তাহার পাশ মোর পিয়া যার কাছে বৈসে।
পাখী জাতি যদি হউ পিয়া পাশে উড়ি যাউ সবদুখ কহোঁ তছু পাশে।

প্রথম অংশ পড়িয়া বিদ্যাপতিকে সংস্কৃত কবিদের অনুকারক মাত্র মনে হয়, দ্বিতীয় অংশেই তিনি প্রকৃত কবি।

কবি বৃন্দাবনের ক্ষণিক বিরহে ও মানজনিত বিরহে প্রচলিত রীতি কাঁটায় কাঁটায় অনুসরণ করিয়াছেন—কিন্তু মাথুর বিরহে আর কবিপ্রসিদ্ধির অনুসরণ করেন নাই। এই বিরহেই বিদ্যাপতির প্রকৃত কবিত্ব বিকসিত হইয়াছে। এখন আর—'সজল নলিনী দল শেজ বিছাইঅ পরশে বা

অমিলাএ। চন্দনে নহি হিত চান্দ বিপরীত করব কওন উপাএ।' কিংবা—

মধুর মধুর পিক রব তরু তরুসব করু করু লতিকা সঙ্গ।
ঐসন শোহাওন সুরভি সময় বন পুনমতী রচ রতি-রঙ্গ।
দখিণ পবন বহ শীতল সবহু তহ মলয়জ রজ লয় আব।
কত ন যুবতীমন মননিজ নহি হন সবে কর রস পরথাব।

—এই সকল উক্তির দ্বারা বিরহগীতি মামুলী আক্ষেপেই পর্য্যবসিত হয় নাই। এ বিরহ সকল Convention ছাড়াইয়া উঠিয়াছে। যাহার সঙ্গে অন্তর ঘটিবে বলিয়া 'চুয়া চন্দন হার'ও বজ্জিত হইয়াছিল, পুলক-সঞ্চারও যাহার অঙ্গের সঙ্গে অঙ্গের দূরত্ব ঘটাইবে বলিয়া ভয় হইত—সে আজ "নদীগিরি অন্তরে" চলিয়া গিয়াছে। সেই সঙ্গে নয়ানের নিদ, বয়ানের হাস ও সকল সুখ চলিয়া গিয়াছে। আজ পিয়া বিনা পাঁজর ঝাঁঝর ভেলা। কঙ্কণবলয়া গলিত চুর্ণ হাত। বসন্ত-সমাগমে রাধার বুক চিরিয়া হাহাকার উঠিয়াছে—

অনিমেখ নয়নে নাহ মুখ নিরখিতে তিরপিত ন ভেল নয়ান রে।
ই সুখ সময়ে সহয় এত সঙ্কট অবলা কঠিন পরাণ রে।
দিনে দিনে ক্ষীণ তনু হিম-কমলিনী জনু না জানি কি জীব পরিযন্ত রে।
বিদ্যাপতি কহ ধিকধিক জীবন মাধব নিকরুণ অন্তরে।

* * *

এখন তখন করি দিবস গমাওল দিবস দিবস করি মাসা।
মাস মাস করি বরিখ গমাওল ছোড়ল জীবনক আশা।
বরস বরস করি সময় গমাওল খোয়ল তনুক আশে।
হিমকর কিরণে নলিনী যদি জারব কি করব মাধবী মাসে।

* * *

সরসিজে বিনু সর সর বিনু সরসিজ কী সরসিজ বিনু সূরে।
যৌবন বিনু তন তনু বিনু যৌবন কী যৌবন পিয় দূরে।

চৌদিশ ভমর ভম কুসুমে কুসুমে রম নীরসি মাঁজরি পীবই।
মন্দ পবন বহ পিক কুহকুহ কহ বিরহিণী কৈসে জীবই।

* * *

শঙ্খ কর চূর বসন কর দূর তোড়হ গজমোতি হার রে।
পিয়া যদি তেজল কি কাজ শিঙারে যামুন সলিলে সব ডার রে।

* * *

প্রেমক অঙ্কুর জাত আত ভেল না ভেল যুগল পলাশা।
প্রতিপদ চাঁদ উদয় যৈছে যামিনী সুখলব ভৈ গেল নিরাশা।

* * *

সুরসরি তীরে শরীর তেজব সাধব মনক সিধি।
ভুলহ পহু মোর সুনহ হোয়ব অনুকূল হোয়ব বিধি।

সখীরা বলেন—দেহত্যাগ করিবে কেন? সে সঙ্গ ত্যাগ করিয়াছে, দর্শনের সাধ ত রহিয়াছে "সময় বশে মধু না মিলয় সজনি সৌরভ কে করে বাধ?" ঐ স্মৃতির সৌরভটুকু সম্বল করিয়া 'তন্তুক দোসর দেহে' শ্রীমতী বাঁচিয়া রহিলেন—প্রতীক্ষায় প্রতীক্ষায়। "অঙ্গুলক অঙ্গুরী সে ভেল বাহুটি হার ভেল অতিভার।"

"কালিক অবধি করিয়া পিয়া গেল। লিখইতে কালি ভীত ভরি গেল।"

সখীরা শ্রীমতীর দশা দেখিয়া বলিতেছে—

ধরণী ধরিয়া ধনী যতনহি বৈঠত পুনহি উঠয় না পারা।
সহজই বিরহিনী জগমাহা তাপিনী বৈরী মদন শর-ধারা।
অরুণ নয়ন লোরে তিতল কলেবর বিলুলিত দীঘল কেশা।
মন্দির বাহর করইতে সংশয় সহচরী গণতহি শেষা।

শ্রীমতী সখীদের বলিতেছেন—

কাঁচ সাঁচ পহু দেখি গেল সজনি তসু মন ভেল কুহ ভান।
দিনদিন ফল তরুণিত ভেল সজনি অহুখন না কর গেয়ান।

কহও পিশুন শত অবগুণ সজনি তনি সম মোহি নহিঁ আন।
কতেক যতন সোঁ মেটিয় সজনি মেটয় ন রেখ পষাণ।
যে দুরজন কটু ভাষয় সজনি মোর মন না হোয় বিরাম।
অনুভব রাহু পরাভব সজনি হরিণ ন তেজ হিম-ধাম॥
যইও তরনী জল শোষয় সজনি কমল না তেজয় পাঁক।
যে জনি রতল যাহি সোঁ সজনি কি করত বিধি ভই বাঁক॥
প্রথম বয়স হম কি কহব সজনি পহু তেজি গেলাহ বিদেশ।
কত হম ধৈরয বাঁধব সজনি তনি বিনু সহব কলেশ।

আবার বর্ষা আসিল—

আওন অবধি অতীত ভেল সজনি জলধর ছপল দিনেশ।
শিশির বসন্ত উষম ভেল সজনি পাউষ লেল পরবেশ।

* * *

বরিষয় লাগল গরজি পয়োধর ধরণী দন্তুদি ভেলি
নবী নাগরী রত পরদেশ বল্লভ আওত আশা দূর গেলি।

'ফিরি ফিরি উতরোল ডাকে ডাহুকিনী'—বিরহিণী কি করিয়া বাঁচিবে? 'যৌবন ভেল বন বিরহ হুতাশন।' রাধা বলেন—কোকিলকে না হয় কর কঙ্কণের ঝঙ্কারে তাড়াইতে পারি, ধবল গিরি হইতে তাহার বর্ণ গায়ে মাখিয়া মেঘ আসিতেছে —তাহাকে কি করিয়া নিবারণ করিব? বেয়াজ কইয়ে পিয়া পরদেশ গেল—সত্বর ফিরিবে বলিয়া—আমি "নখর খোয়ায়লুঁ দিবস লিখি লিখি। নয়ন আন্ধায়লুঁ পিয়া পথ পেখি।"

গাবই সব মধু মাস। তনু দহ বিরহ হুতাশ॥
হুতাশ সাদৃশ চাঁদ চন্দন মন্দ পবন সন্তাপই।
মাধবী মধু মত্ত মধুকর মধুর মঙ্গল গাবই।
নব—মঞ্জু বঞ্জুল পুঞ্জ রঞ্জিত চূত কানন সোহই

রস—লোল কোকিল কোকিলা কুল কাকলী মন মোহই।
মোহই মাধবি মাস। চৌদিকে কুসুম বিকাশ।
বি—কাশ হাস বিলাস সুললিত কমলিনী রস জৃম্ভিতা।
মধু—পান চঞ্চল চঞ্চরিকুল পদুমিনী মুখ চুম্বিতা।
নব—মুকুল পুলকিত বল্লী তরু অরু চারু চৌদিসে সজ্জিতা।
হম সে পাপিনি বিরহ তাপিনি সকল সুখ পরিবর্জ্জিতা।
বঞ্চিত রহ নিশি বাস। ভৈগেল জৈঠহি মাস।
মাস ইহ রচ যাক পয় পহু সোই সুলখিনী কামিনী।
করয়ে সুখ সম্ভোগ বঞ্চয় চাঁদ উজোর যামিনী।
দহই দাহুরি দিনহি বঞ্চয় কেলি করয় সরোবরে।
পেম পেসলি পুরুষ পেয়সি পেখি তাপিত অন্তরে।
অন্তরে আওয়ে আষাঢ়। বিরহিণী বেদন বাঢ়।
বাঢ় ফুল্লিত বল্লি তরু বর চারু চৌদিশে সঞ্চরে।
তাপে তাপিত ধরনি মঞ্জরি নিরখি নব নব জলধরে।
পপীহা পাখিয় পিয়াসে পীড়িত সঘনে পিউ পিউ রাবিয়া।
পিক—নাদ শুনি চিত চমকি উঠয় পিয়া সে পেখি না পাপীয়া॥ *

কবি বলিয়াছেন—এই ভাবে শ্যাম নাম জপ করিতে করিতে রাধার শ্যামের সহিত অভেদ জ্ঞান জন্মিল।

অনুখন মাধব মাধব সোঙরিতে সুন্দরি ভেল মাধাই।
ও নিজ ভাব সোভাব হি বিসরল আপনগুণ অনুধাই।
আপন বিরহে আপন তনু জর জর জীবইতে ভেলি সন্দেহা।

* ইহা বিদ্যাপতি-রচিত বারমাস্যার চারি মাসের বর্ণনা। পদকল্পতরুতে যে বারো মাসের বর্ণনা আছে—তাহার বাকি মাসগুলি দুই গোবিন্দদাসের। নগেনবাবু বলেন,—সবটাই বিদ্যাপতির। যাহাই হউক, বিদ্যাপতি বৈষ্ণব সাহিত্যে বারমাস্যা-রচনার প্রবর্ত্তক।

শ্রীমতীর এমনই তদ্‌গতভাব জন্মিল যে, নিজেকেই মাধব মনে করিতে লাগিলেন। নগেনবাবু বলিয়াছেন—"ইহা সমাধির অবস্থা, দ্বৈতভাবের পরিবর্ত্তে অদ্বৈতভাব, ভেদাভেদজ্ঞানের তিরোভাব।" তাহা হইলে ইহাই শ্রীমতীর সান্ত্বনা হইতে পারিত, কিন্তু কবি বলিতেছেন—'বাঢ়ত বিরহক বাধা।' দশ দিশ দারু দহনে দগধই আকুল কীট-পরাণ। কীট কথাটি ব্যবহারের কি কোন সার্থকতা নাই? আমরা একথাও বলিতে পারি—বিদ্যাপতি যাহা রাধার সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন—তাহা শ্রীচৈতন্যের জীবনে সম্পূর্ণ সার্থকতা লাভ করিয়াছিল।

কেবল এই কথাটি কেন—বিদ্যাপতির পদের অনেকস্থলেই এইরূপ আধ্যাত্মিক অর্থ দেওয়া যাইতে পারে।

যইঅও সরোবর হিমকর নিজ করে পরশয় সবহু সমানে।
কুমুদিনী কাঁ শশী শশীকাঁ কুমুদিনী জীবন কে নহি জানে।

বহুবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের সহিত রাধার সম্পর্কের কথা এখানে বলা হইয়াছে। ইহার আধ্যাত্মিক অর্থ করিলে চন্দ্রাবলীর প্রসঙ্গ পরম প্রেমের মধ্যে কোথায় নিমগ্ন হইয়া যায়।

মোটের উপর, বিদ্যাপতির পদাবলীর ব্যাখ্যা দেশ, কাল বিশেষতঃ পাত্রের উপরই নির্ভর করিতেছে। সমস্ত পদকেই নরনারীর প্রাকৃত প্রেমের বর্ণারূপ মনে করিলেও কেহ দোষ দিতে পারে না—কবিতার মধ্যে প্রচ্ছন্ন কোন আধ্যাত্মিক ইঙ্গিত নাই। বিরহের কবিতাগুলিকে যে কোন অনুরাগিণী প্রোষিত-ভর্ত্তৃকার হৃদয়াবেগের অভিব্যক্তি বলা যাইতে পারে। আবার ভক্তের কাছে এই পদাবলীর অর্থ স্বতন্ত্র। শ্রীচৈতন্যদেব সেজন্য এই পদগুলি শুনিতে শুনিতে ভাবে তন্ময় হইতেন। রাধাশ্যামের ভাগবত স্বরূপই সাধারণ পাঠকেরও মনে আধ্যাত্মিক অর্থ স্বতই প্রবুদ্ধ করে। শ্রীচৈতন্যদেব নিজের জীবনলীলার দ্বারা এইগুলিতে যে অর্থ আরোপ করিয়াছেন—তাহাই বা আমরা ভুলি কি করিয়া?

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার বাধা হয় অনঙ্গলীলার আতিশয্য। এমন কি বিরহের রসঘন পদগুলিতেও 'কাম দুরন্তের' উল্লেখ বারবারই আছে। এ বাধা বৈষ্ণব সাহিত্যের ভক্ত রসজ্ঞের পক্ষে উত্তরণ করা কিছুমাত্র কঠিন নয়। সে যুগে প্রেম ও কামকে পৃথক করিয়া দেখা হইত না—কামলীলাকে প্রেমলীলার অঙ্গস্বরূপই মনে করা হইত। প্রেমকে abstraction হইতে রক্ষার জন্য কামলীলায় তাহাকে প্রাকৃতরূপ দেওয়া হইত। ইহাকে কবি-পদ্ধতি বলিয়া মনে করিয়া লওয়াও যাইতে পারে। যে লীলাই হউক—বিরহই যেখানে সমস্তকে গ্রাস করিতেছে, তখন সমস্তটাই বেদনা এবং তজ্জনিত বৈরাগ্যের গেরুয়া রঙ্গে অভিরঞ্জিত হইয়া যাইতেছে। বিশেষতঃ বিদ্যাপতির 'তাতল সৈকতে বারি বিন্দুসম' ও 'মাধব বহুত মিনতি করি তোয়' এই পদ দুটি অন্য পদগুলিরও লোকাতীত ব্যঞ্জনারই ইঙ্গিত করে।

কবির ভাব-সম্মিলনের পদগুলি মিলনানন্দের পদ। কিন্তু প্রাকৃত মিলনের পদগুলির সহিত ইহার ঢের প্রভেদ। একটা অতীন্দ্রিয় মিলনের নিরানন্দ লাভের ব্যঞ্জনা যেন এইগুলিতে বিদ্যমান। শ্রীমতী যেন দীর্ঘ বিরহের তপস্যায় তাঁহার প্রেমাস্পদকে চিরদিনের জন্য অন্তর্লোকে লাভ করিয়াছেন—আর তাঁহার উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা, লোকভয়, বিরহের ভয়ও সর্ব্ববিধ লজ্জা দ্বিধা জয় করিবার চেষ্টা বা মানসিক দ্বন্দ্ব যেন কিছুই নাই। তিনি যেন শান্ত সমাহিত চিদানন্দময় অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন। এখন মদনের পাঁচ বাণ লাখ বাণই হউক, আর লক্ষ কোকিলই ডাকুক, তাহাতে তাঁহার কিছু আসে যায় না।

প্রেমের ঠাকুর পরম তৃষ্ণা জাগাইবার জন্য অহৈতুকী করুণা করেন একবার, তারপর অন্তর্হিত হ'ন—তারপর ঐ তৃষ্ণা সাধনায় প্রণোদিত করে—তপস্যায় মগ্ন করায়। এই সাধনা ও তপস্যার দ্বারাই তাঁহাকে

চির দিনের জন্য পাওয়া যায়। বিনা সাধনায় ঐহিক বা দৈহিক গুণাতিশয্যে যাহা পাওয়া যায়, তাহাকে হারাইতে হয়, তাহা চিরদিনের ধন হইয়া থাকে না। শ্রীমদ্‌ভাগবতে এই কথাই আছে। শ্রীমতীর নিদারুণ বিরহকে তপস্যা মনে করিয়া ভাবসম্মিলনের যদি এই ব্যাখ্যা দেওয়া হয়—তাহা হইলে বোধ হয় অসঙ্গত হয় না। তপস্যার অনলে দৈহিকতা ধ্বংস পাইলে বিদেহ প্রেম ভাবসম্মিলনের দিব্যানন্দে আত্মপ্রকাশ করিবে তাহাতে সন্দেহ কি?

সাধারণ কাব্য-বিচারের দিক হইতে ইহা স্বপ্ন সুখ ও তন্ময় স্মরণ-মননের দ্বারা কল্পনায় মিলনানন্দ উপভোগ। মনস্তত্ত্বের সহিত এই ভাবেরও যোগ আছে। প্রাকৃত জীবনে এই ভাবাকুলতা সাময়িক,—কাব্যে তাহাকে চিরন্তন বলিয়া ধরা হইয়াছে রসসৃষ্টির জন্য।

লালসার পঙ্কে জন্ম যে মৃণালের, সেই মৃণালেই ফুটিয়া উঠে কামনাময় প্রেমের পঙ্কজ। তাহার স্বর্গীয় সৌরভটুকু পঙ্কজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কিছুক্ষণের জন্যও ভাবের মলয়ানিলকে আশ্রয় করে। কবি এই বিদেহ ভাব-সৌরভকে কবিতায় চিরন্তন করিয়া রাখিয়াছেন।

বিদ্যাপতি শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলার পদ রচনা করেন নাই। বাল্যলীলায় কবিত্বের অবসর অল্প। যশোদার মধুর বাৎসল্যের ভাবটি বাঙ্গালার নিজস্ব সম্পদ। বিদ্যাপতি মুগ্ধা নায়িকার বর্ণনায় সংস্কৃত কবিদেরই অনুসরণ করিয়াছেন। নবোঢ়া বালাবধূর কিলকিঞ্চিত ভাবও সংস্কৃত আলঙ্কারিকদের অনুসরণে ফুটাইয়াছেন। এ বিষয়ে মৌলিকতা তাঁহার নাই। এ বিষয়ে মৌলিকতা দেখাইয়াছেন আমাদের চণ্ডীদাস। পূর্ব্বরাগের মাধুর্য্যও বিদ্যাপতির পদাবলী অপেক্ষা বঙ্গীয় কবির পদে অধিকতর ফুটিয়াছে। বিদ্যাপতির বয়ঃসন্ধি বর্ণনার চাতুর্য্যে ও মাধুর্য্য দুইই অতুলনীয়।

বিদ্যাপতির পূর্ব্বরাগে বংশীধ্বনির মাদকতা নাই—শুধু রূপেরই মোহনতা।

"সুরপতি পায়ে লোচন মাগঞো গরুড় মাগঞো পাখি। নন্দেরি নন্দন সঞে দেখি আবঞো মন মনোরথ রাখি।" "দাহিন নয়ন পিশুনগণ বারণ পরিজন বামহি আধ। আধ নয়ন কোণে যব হরি পেখল তাহি ভেল এত পরমাদ।"

এ সকল চরণ তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

রূপানুরাগের ক্রমবিকাশও আছে—

"একদিন হেরি হেরি হাসি হাসি যায়। অরু দিন নাম ধরু মুরলী বাজায়।
আজু অতি নিয়ড়ে করল পরিহাস। না জানিয় গোকুল ককর বিলাস।
পরিচয় নহি দেখি আন কাজ। না করয় সম্ভ্রম না করয় লাজ।

শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ বর্ণনায় বিদ্যাপতি অজস্র উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কারের সমুচ্চয় করিয়াছেন, কিন্তু দুইটি পংক্তিতে রাধিকার রূপের দুর্নিবার প্রভাব যেমন ফুটিয়াছে তেমন আর কিছুতেই নয়।

১। মেঘমালা সঞে তড়িৎলতা জনু হৃদয়ে শেল দেই গেল।

২। নব জলধর বিজুরি রেহা দন্দ (দ্বন্দ্ব) পসারিয়া গেলি।

শ্রীমতীর স্নানাং রূপ ফুটাইয়া বিদ্যাপতি রাগ-সাহিত্যে ও চিত্রশিল্পে একটি নূতন সম্পদ দান করিয়াছেন। 'ততুতুপ বসন ততু হিয়লাগি। যো পুরুখ দেখত তারক ভাগি।' বিদ্যাপতি যে রসের কবিতা রচনা করিয়াছেন—সে রসের পক্ষে এই চিত্র অপূর্ব্ব। যে পদে ইহা রসের পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছে, সে পদ লোচনেরই হউক আর চণ্ডীদাসেরই হউক,—বাঙ্গালী কবিরই কৃতিত্ব।

শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগে অতিরিক্ত অলঙ্কারের ঘটায় শ্রীকৃষ্ণের প্রেমার্ত্তি তেমন পরিস্ফুট হয় নাই। অবশ্য কামার্ত্তি ফুটাইতে কবি ত্রুটী করেন নাই। কামার্ত্তির আভিজাত্য সম্পাদনের জন্যই এত বেশি আভরণ অলঙ্কারের সাহায্য লইতে হইয়াছিল—নিরাভরণ হইলে গ্রাম্যতা দোষ ঘটিত।

প্রথম সম্ভোগের বর্ণনায়—বালা মুগ্ধা নায়িকা শ্রীরাধিকার প্রথম রস মিলনে কবি অলঙ্কার দিয়াও গ্রাম্যতা আচ্ছন্ন করিতে পারেন নাই—বোধহয়

আচ্ছন্ন করিবার ইচ্ছাও কবির ছিল না। কবি হয়ত ভাবিয়াছেন—পঙ্কজের ক্রমবিকাশ দেখাইতে গিয়া পঙ্কপ্রোথিত মৃণালের পরিচয়টা অপরিহার্য্য।

খণ্ডিতা নায়িকার রোষ, মান, মানভঙ্গ ইত্যাদি প্রকরণে যে পদ্ধতি পূর্ব্ব হইতে প্রচলিত ছিল কবি তাহাই কাঁটায় কাঁটায় অনুসরণ করিয়াছেন। এই পর্য্যায়ের পদগুলির মধ্যে সখীর উক্তিগুলিতে বিদ্যাপতির মৌলিকতা পরিস্ফুট। মানিনী রাধার আক্ষেপোক্তির পদগুলিতে কবি অনেক সাংসারিক অভিজ্ঞতার কথা, মানব-জীবনের বহু ভুল ভ্রান্তির কথা প্রকাশ করিয়াছেন। সেই সঙ্গে প্রকৃত সজ্জনের লক্ষণ কি, প্রকৃত বিদগ্ধজনের ধর্ম্ম কি, রাধার আক্ষেপচ্ছলে কবি তাহা বিবৃত করিয়াছেন। এই পদগুলির মধ্যে বৈরাগ্যের উদ্দীপক শান্ত রসের ধারা প্রবাহিত।

এই সঙ্গে রাধার অনুতাপের পদও কয়েকটি আছে। এইগুলি শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের বিরহের পদগুলিকে স্মরণ করায়। বিদ্যাপতির মানভঞ্জনের পদাবলীর মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের পক্ষ হইতে আবেদন অলঙ্কারের ঝঙ্কারে নিমগ্ন—রাধার পক্ষের আবেদনই মর্ম্মস্পর্শী। বিদ্যাপতি পুরুষবেশে শ্রীরাধিকাকে অভিসারিকা করিয়াছেন—আবার শ্যামকে মানভঞ্জনের জন্য গোপীবেশ পরাইয়াছেন। বিদ্যাপতির "যামিনী ঘোর আঁধিয়ার। মনমথ হিয় উজিয়ার।" অপেক্ষা শেখরের 'অন্তরে শ্যামচন্দ্র পরকাশ' এক ধাপ উচ্চ স্তরের কথা।

অভিসার প্রকরণ সংস্কৃত সাহিত্য হইতে বিদ্যাপতি পাইয়াছেন। নারীর পক্ষে দুরপথ দিয়া বনপ্রান্তর পার হইয়া নায়কের সঙ্কেত-স্থানে গমন স্বাভাবিক নয়। তবু কবিরা মাধুর্য্য সৃষ্টির জন্য ও প্রেমের আহ্বানের দুর্নিবারতা দেখাইবার জন্য নারীকে অভিসারিকা করিয়াছেন। বোধহয়—নদীধারার দুর্গমপথে উদ্দাম বেগে মহাসিন্ধুর পানে অভিযাত্রা এই কল্পনায় সাহায্য করিয়া থাকিবে। বিদ্যাপতি প্রচলিত প্রথাই অনুসরণ করিয়াছেন।

রজনী কাজর বম ভীমভূজঙ্গম কুলিস পড়য় দুরবার।
গরজতরঙ্গ মন রোষে বরিষ ঘন সংশয় পড় অভিসার।

বর্ষার ঘন অন্ধকারের মধ্যে এই অভিসার,— এমন কি জ্যোৎস্নালোকে অভিসারের কথা সংস্কৃত সাহিত্যে আছে। ইহাতে নারীর পক্ষে যথেষ্ট প্রগল্‌ভতা প্রকাশ পায়। বিদ্যাপতি পুরুষবেশে অভিসার করাইয়া নায়িকাকে প্রগল্‌ভতরা করাইয়াছেন।

এই অভিসার বাঙ্গালার বৈষ্ণব সাহিত্যে অন্য সার্থকতা (Interpretation) লাভ করিয়াছে। ইহা পরম ইষ্টদেবের আকর্ষণে ভক্তের অভিযান, এইরূপ আধ্যাত্মিক অর্থ লাভ করিয়াছে। তাহার ফলে অভিসার-পথকে অত্যন্ত বিঘ্নসঙ্কুল করিয়া তোলা হইয়াছে এবং অভিসারের বৈচিত্র্যও ইহাতে বাড়িয়া গিয়াছে। গভীর শীতের অভিসার, দারুণ গ্রীষ্মের মধ্যাহ্ন কালের অভিসার (তপনক তাপে তপত ভেল মহিতল তাতল বালুকা দহন সমান ইত্যাদি) ইত্যাদিও বাণীরূপ লাভ করিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনির আহ্বানকে দুর্নিবার বলিয়া বুঝাইবার জন্যই কবিগণ শ্রীমতীর অভিসার-পথকে দুর্গম করিয়া তুলিয়াছেন। এই অভিসার—বংশীধ্বনি শুনিয়া কুলশীল, সমাজ সংস্কার ও সংসার বন্ধনের পিঞ্জরে আবদ্ধ হরিণীর লোকালয় হইতে অতিদুর্গম পথে গভীর অরণ্যের দিকে অভিযান।

বিদ্যাপতির ভাষা, ছন্দ, ভঙ্গী, বৃন্দাবন-লীলার পর্যায়-বিভাগ—সমস্তই বৈষ্ণব কবিগণ অনুকরণ করিয়াছেন। বিদ্যাপতি সে-জন্য কবিগুরু। বাঙ্গালী কবিরা গীতগোবিন্দ হইতে অনেক বাগ্‌ভঙ্গী পাইয়াছেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের ছদ্মবেশ-ধারণের রসবস্তুর প্রবর্ত্তক বোধ হয় বিদ্যাপতি। বিদ্যাপতির ব্যবহৃত বহু অলঙ্কারও বৈষ্ণব কবিগণ গ্রহণ করিয়াছেন। বড়ু চণ্ডীদাসের রাধাকৃষ্ণের রসকলহ বিদ্যাপতির রসকলহের (গোবে চরাবএ গোকুল মাঝ। গোপক সঙ্গম কর পরিহাস ইত্যাদি) পদকে স্মরণ করায়।

পদের মধ্যকার অনেক বাক্যও বাঙ্গালী কবিরা গ্রহণ করিয়াছেন। —যেমন—বিদ্যাপতির—"আঁচরে কাঞ্চন ঝলকে দেখি। প্রেম কলেবর দিয়াছে সাখী।" এই পংক্তিরই রূপান্তর—'আঁচরে কাঞ্চন ঝলকে মুখে। মরমে পিরিতি বেকত অঙ্গে'—জ্ঞানদাস। 'গাঠিক হেম বদনমাহা ঝলকই এতদিনে পেখলুঁ আঁখি'—গোবিন্দদাস। বিদ্যাপতির 'অঙ্গুরি বলয়া পুন ফেরি'—বাক্যের রূপান্তর 'অঙ্গুল অঙ্গুরি বলয়া ভেল।' (জ্ঞানদাস)। বিদ্যাপতির 'সুন্দর বদনে সিন্দুর বিন্দু···আঁধিয়ারের' ভাব চণ্ডীদাসের "কপালে ললিত চাঁদ সে শোভিত" ইত্যাদি বাক্যে দৃষ্ট হয়। বিদ্যাপতির "চোর রমণী জনু মনে মনে রোয়ই অম্বরে বদন ছপাই"—চণ্ডীদাসের পদে "চোরের মায়ে যেন পোয়ের লাগিয়া ফুকারি কাঁদিতে নারে"—এই রূপ লাভ করিয়াছে। বিদ্যাপতির—"সাগরে তেজব পরাণ। আন জনমে হোয়ব কান॥ কানু হোয়ব যব রাধা। তব জানব বিরহক বাধা"—এই অংশ চণ্ডীদাসের একটি চমৎকার পদে পরিণত হইয়াছে।

বিদ্যাপতি লিখিলেন 'রোগী করয়ে জনু ঔষদপান'; ভারতচন্দ্র লিখিলেন—'রোগী যেন নিম খায় মুদিয়া নয়ন।' বিদ্যাপতি লিখিলেন—"মন্ত্র না শুনয়ে জনু বালভুজঙ্গ।" নিধুবাবু লিখিলেন "ভুজঙ্গ শিশু যেমন মন্ত্রৌষধি মানে না।" বিদ্যাপতি লিখিলেন, "কতয়ে মদন তনু দহসি হামারি।" রামবসু লিখিলেন —"হর নই হে আমি যুবতী। কেন জ্বালাতে এলে রতিপতি"—ইত্যাদি

বিদ্যাপতি দীর্ঘস্বরের দীর্ঘ উচ্চারণ কোথাও ধরিয়াছেন—কো···ও ধরেন নাই। যেখানে যে সুবিধা হইয়াছে—সেই সুবিধাই গ্রহণ করিয়াছেন। বিদ্যাপতির কোন কোন পদের নির্দোষ পারিপাট্য দেখিলে মনে হয়, তিনি ছন্দের নিয়ম সতর্ক ভাবেই মানিয়া চলিতেন। কিন্তু তাঁহার পদসংগ্রহ-গ্রন্থগুলিতে ছন্দের অসংখ্য ত্রুটী দৃষ্ট হয়। সম্ভবতঃ এইগুলি ছাপরিয়া ও কীর্ত্তনিয়াদের দোষেই ঘটিয়াছে। নগেনবাবুর সম্পাদিত পুস্তকে ছন্দের

দোষ খুব বেশী দেখা যায়। প্রচলিত পদগুলিকে মৈথিলী ভাষায় রূপান্তরিত করিতে গিয়া ছন্দের দোষ ঘটিয়াছে বলিয়া মনে হয়। সংগ্রাহকগণের নিজেদের যদি ছন্দ সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান থাকিত, তাহা হইলে তাঁহারা ঠিক পাঠটি ধরিতে পারিতেন।

বিদ্যাপতির ভাষা অনুপ্রাসে ঋদ্ধ। তিনি তাঁহার বাঙ্গালী শিষ্যদের মত বৃত্ত্যনুপ্রাসের পক্ষপাতী ছিলেন না—ছেকানুপ্রাসের পক্ষপাতী ছিলেন। বিদ্যাপতির অনুপ্রাস প্রয়োগের উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত—'জোরি ভুজযুগ মোড়ি বেঢ়ল ততহি বয়ন সুছন্দ। দাম চম্পকে কাম পূজল যৈছে শারদ চন্দ।' যমক-মূলক অনুপ্রাসও মাঝে মাঝে আছে। যেমন—

"শ্যামর ঝামর কুটিলহি কেশ। কাজরে সাজল মদন-সন্দেশ।
জাতকী কেতকী কুসুম নিবাস। তাদেখি মনমথ উপজল হাস॥"

বিদ্যাপতির ছন্দ সম্বন্ধে পৃথক আলোচনার প্রয়োজন। বাঙ্গালায় যাঁহারা ব্রজবুলিতে লিখিয়াছেন তাঁহারা সকলেই বিদ্যাপতির প্রবর্ত্তিত ও গীতগোবিন্দে ব্যবহৃত ছন্দগুলি গ্রহণ করিয়াছেন। এসকল ছন্দের লক্ষণ প্রাকৃত পিঙ্গল সূত্রে দেওয়া আছে। বিদ্যাপতির প্রধান ছন্দ পজ্ঝটিকা। এই ছন্দ হইতেই পয়ারের জন্ম হইয়াছে। **পজ্ঝটিকা**—

৪+৪+৪+৩—দিনে দিনে। উন্নত। পয়োধর। পীন।
বাঢ়ল। নিতম্ব। মাঝ ভেল। খীণ॥

উল্লিখিত শ্যামর ঝামর কুটিলহি কেশ ইত্যাদি উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

৪+৪+৪+৪—অধর নি। রস মধু। করলহি। মন্দা।
রাহু গ। রাসি নিশি। তেজল। চন্দা॥

মিশ্র পজ্ঝটিকা—

(১) ৪+৪+৪—চিকুরে গ। লয় জল। ধারা।

(২) ৪+৪+৪+৪—জনি মুখ-। শশী ডরে। রোয় অন্। ধারা।

প্রাকৃত **ভরহট্টা** ও **বৃত্ত নরেন্দ্রের** মিশ্রণ। ইন্দ্রবজ্রা ও উপেন্দ্রবজ্রার মিশ্রণে উপজাতির মত। শেষ পর্ব্বে ২—৩—৪ মাত্রা থাকিতে পারে। ১ম দুইপর্ব্বে মাত্রা ৮+৮, কিংবা ৭+৯ দুইই হইতে পারে।

৮+৮+৮+২—নব বৃন্দাবন। নব নব তরুগণ। নব নব বিকসিত। ফুল
৭+৯+৮+২—নবল বসন্ত। নবল মলয়া নিল। মাতল নব অলি। কুল।
৭+৯+৮+৩—অভিনব কাম। নাম পুন শুনইতে। রোখত গুণ দর। শাই
৮+৮+৮+৩—অবিরম গঞ্জয়ে। মন পুন রঞ্জয়ে। অপন মনোরথ। সাই
৮+৮+৮+৪—আজু রজনী হাম। ভাগে পোহাইনু। পেখল পিয়া মুখ। চন্দা
জীবনযৌবন। সফল করি মানল। দশ দিশ ভেল নির। দ্বন্দা
৮+৪— সজনি—অপরূপ পেখল। রামা
৮+৮+৮+৪ কনকলতা অব। লম্বনে উয়ল। হরিণহীন হিম। ধামা।
৮+৭+৮+৩—'সময়পদটিতে (২৫—২৬ পৃষ্ঠা দেখ) প্রত্যেক ২য় পর্ব্বে 'সজনি' কথাটির সমাবেশের জন্য ছন্দটি অপূর্ব্বতা লাভ করিয়াছে।
'কাচ সাঁচ পহু। দেখি গেল সজনি। তসু মন ভেল কুহ। ভান
দিন দিন ফল তুরু-। পিত ভেল সজনি। অহখন না কর গে। মান।"
৮+৮+৮+৬—অলস গমন তোর। বচন বলসি ভোর।
মদন মনোরথ। মোহগতঃ।
জ্রকুমি পুনুপুনু। যামি অরস তনু।
আতপে ছুইনি মু-। পদ্মলতা॥

প্রাকৃত পিঙ্গলে নিম্নলিখিত ছন্দ **দোহা** নামে অভিহিত।

৮+৫+৮+৩—কম্বুকণ্ঠ মু-। ণালভুজ। বলিত পয়োধর। হার
কনক-কলস রসে। পূরি রহু। সঙ্কিত মদন ভ°। ডার।
৮+৬+৮+৩—শ্যামর চন্দ উগ। লাহ রে। চান্দ পুন গেল অ। কাশ।
এত বহি পিয়া কৈ। অয়বা রে। পলটত বিরহিনী। সাঁস॥

দোহার অন্য রূপও আছে। ৮+৬+৬+৩

মোর মন হরি হরি। লই গেল রে। অপনো মন। গেল।
গোকুল তেজি মধু-। পুর বস রে। কত অপযশ। লেল।
বিদ্যাপতি কবি। গাওল রে। ধনি ধরু পিয়। আশ।
আওত তোর মন। ভাবন রে। এহি কাতিক। মাস।

লঘু ত্রিপদী—

৬+৬+৬+৩(১)—আওর পেখল। কুচযুগমাঝে। লোহিত মোতিম। হারে
কনক মহেশ। কামল পূজল। জনি সুর নদী। ধারে।

প্রাকৃত রীতির লঘু ত্রিপদী—

৬+৬+৬+৩—ভিন ভিন অঙ্গ। ভবি আবথু। জনি পাবথু। খেদ
এক রস নহি। পুরুষ বুঝল। গুণ দূষণ। ভেদ।

অক্ষর-মাত্রিক লঘু ত্রিপদী—

৬+৬+৬+২—এহনি সুন্দরি। গুনক আগরি। পুনে পুনমত। পাব
ই রস বিন্দক। রূপ নারায়ণ। কবি বিদ্যাপতি। গাব।

অধিকাংশ লঘু ত্রিপদীর পদগুলিতে অক্ষর-মাত্রা ও স্বর-মাত্রার মিশ্রণ আছে।

মিশ্র লঘু ত্রিপদী—

২–৬+৪(৩)— ধনী—অলপ বয়সী। বালা
২–৬+৪(৩) জনি—গাঁথলি পুহপ। মালা
৬+৬+৬+৪(৩) থোরি দরশনে। আশ না পূরল। বহল মদন। জ্বালা। *(১)

লঘু ত্রিপদীর দুই পর্ব্বেও চরণ গঠনের দৃষ্টান্ত আছে।

৬+৬— তেঁ ধসি ময়ূরে। জোড়ল ঝাঁপ।
৬+৬ নখর গাড়ল। হৃদয় কাঁপ। * (২)

* (১) পঞ্চনদীর তীরে বেণী পাকাইয়া শিরে—এই ছন্দে রচিত। (২) লঘু ত্রিপদীর

একাবলী ছন্দের ধরণে ৬+৫ এর চরণও আছে—

কতয়ে গুঞ্জা। কতয়ে ফুল। কতয়ে গুঞ্জা। রতনতুল।

পাঁচমাত্রার ছন্দ—(স্তবক-বন্ধ)

৫+৫–৫+৫—বচনে বস। হোসি জম্বু। সসরি ভিন। হোইহ তম্বু।

৫+৫+৫+২—সহজে বক্র। ছাড়ি দেব। শয়ন সী। মা

প্রথম রস। ভঙ্গ ভেলে। লোভে মুখ। শোভ গেলে

বাঁধি ভুজ। পাশে পিয়। ধরব গাঁ। মা। * (৩)

চর্চরী—

৭+৭+৭+৩(৪)—গেলি কামিনী। গজহু গামিনী। বিহসি পলটি নি। হারি

ইন্দ্র জালক। কুসুম শায়ক। কুহকি ভেলি বর। নারী॥

সাতমাত্রার চর্চরী ছন্দের স্তবক-(stanza) বন্ধনের দৃষ্টান্ত।

৭+৭—৭+৭—যখনে মধুরিপু। ভবন আওব—দূরে রহি মুছে। কহি পা-ঠাওব

৭+৭—৭+২—সকল দূষণ। তেজি ভূষণ। সমক সাজব। রে॥

৭+৭--৭+৭—লাজ নতিভয়ে। নিকটে আওব। রসিক ব্রজপতি।

হিয়ে সন্তাওব।

৭+৭—৭+২—কাম কৌশল। কোপ কাজর। তবহু রাজব। রে॥

প্রচলিত পয়ারের মত পংক্তিগুচ্ছও মাঝে মাঝে আছে। স্বরের হ্রস্ব-দীর্ঘের কোন বালাই নাই।

দূতী—যদি তোরা নহি ক্ষণ নহি অবকাশ।

পরকে যতনে কতে দেল বিশবাস।

রাধা—কর জোরি পৈয়া করি কহবি বিনতি।

বিসরি ন হলবিএ পুরুব পিরীতি॥

স্তবকের অন্তরা। (৩) জয়দেবের বদসি যদি কিঞ্চিদপি ইত্যাদি ছন্দোবন্ধনের অনুযায়ী। একলা তুমি অঙ্গ ধরি ফিরিতে নব ভুবনে মরি-মরি অনঙ্গ দেবতা—ইত্যাদি বর্ত্তমান রূপ।

প্রথম পহর রাতি রভসে বহলা।
দোসর পহর পরিজন নিন্দে গেলা॥

শুধু ৮, ৮+৩, ৮+৪ মাত্রাতেও পংক্তি গঠনের ছন্দ আছে

৮—৮—কুয়ল কবরী মোর। অধরু আচর ওর।
চকোর চপল চাঁদ। পড়ল প্রেমক ফাঁদ।

৮+৩, ৮+৩—মধুঋতু মধুকর। পাঁতি। মধুর কুসুম মধু। মাতি

৮+৪, ৮+৪ ভনই বিদ্যাপতি। ভানরে। সুপুরুখ না কর নি। দানরে

৮+৪—নকে বিকে ঐলিহু। আপে॥ বেড়লিহু মোহি বড়ে। সাপে॥
(২)—৪+২ মোরে—পাপে লো।

৮+৪—করিবহুঁ পর উপ। হাসে। পড়ি কহ ভান বিধি। ফাঁসে॥
(২)—৪+২ নহি—আশে লো॥

৮+৫—রজনী ছোটি ভেল। দিবস বাঢ়। জনি কামদেব কর। বাল কাঁঢ়।

৮+৬—মলয়ানিল পিব। যুবতীমান। বিরহিনী-বেদন। কেও ন জান।

পাঁচমাত্রার পর্ব্বে অপূর্ব্ব বৈচিত্র্য—৫+৪—(২)+৫+২

মান পরি। হর ভে। (করু)—বচন মো। রা।
মার মনো। ভব ভে। (ধরু)—শরণ তো। রা।

কৃত্তিবাস

কৃত্তিবাস যে রামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন, ঠিক সেই রামায়ণই আমরা পাই না, এ কথা সকলেই জানেন। তিনি বাল্মীকির রামায়ণ অবলম্বন করিয়া একখানি সংক্ষিপ্ত রামায়ণ লিখিয়াছিলেন। পরে নূতন নূতন গল্প রামায়ণের মধ্যে ঢুকিয়াছে—বিশেষতঃ বৈষ্ণব ধর্ম্মের অভ্যুদয়ের পর সমস্ত রামায়ণখানি বৈষ্ণব ভাবে তুলসীপত্রে সুবাসিত হইয়া পড়িয়াছে এবং হরি-ভক্তি-মূলক অনেক উপাখ্যান উহার মধ্যে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। রাক্ষসদের মধ্যে বিষ্ণুভক্তির আতিশয্য থাকিবার কথা নয়। আর্ষ রামায়ণে নাই, কৃত্তিবাসের পুঁথিতেও ছিল না। এইগুলি পরবর্ত্তী বৈষ্ণব রামায়ণ-রচয়িতাদের সৃষ্টি। দেশে বৈষ্ণব ভাবের বন্যা বহিয়া যাওয়ার পর জনসাধারণের চাহিদাতেই ঐরূপ উপাখ্যান রচিত ও কৃত্তিবাসের রামায়ণের অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছে। পরবর্ত্তী রামায়ণ-রচয়িতাদের রচিত কোন্ কোন্ অংশ কৃত্তিবাসের রামায়ণে প্রবেশ লাভ করিয়াছে এবং কৃত্তিবাসেরই কোন্ কোন্ অংশ পরবর্ত্তী রচয়িতারা গ্রহণ করিয়াছেন এ বিষয়ে এখনও সুচারুরূপ গবেষণা হয় নাই।

কৃত্তিবাসের রামায়ণের ভাব ও ভাষা অনুসরণেই পরবর্ত্তী রামায়ণ-প্রণেতারা স্বস্ব গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন—তবে তাঁহারা একমাত্র বাল্মীকিকেই আশ্রয় করেন নাই। তাঁহারা জৈন রামায়ণ, অধ্যাত্ম পুরাণ, তুলসীদাসের রামায়ণ ইত্যাদি হইতেও কোন কোন অংশ গ্রহণ করিয়াছেন।

এই যে বহু নূতন নূতন রামায়ণ * রচিত হইয়াছিল ইহারা সব গেল কোথায়? অনেকগুলির রচনা কৃত্তিবাসের রামায়ণ হইতে অপকৃষ্টও নয়—

* ষষ্ঠীবর ও গঙ্গাদাস সেনের রামায়ণ, কবিচন্দ্রের রামায়ণ, জগৎ রামের রামায়ণ, শিবচন্দ্র সেনের সারদামঙ্গল ইত্যাদি বহু রামায়ণ রচিত হইয়াছিল। অমৃতকুণ্ডগ্রামের নিত্যানন্দ

শুধু কৃত্তিবাসের রামায়ণই চলিল এবং অপরের যাহা কিছু ভাল তাহা কৃত্তিবাসের নামেই চলিয়া গেল। ইহার কারণ কি? ইহার প্রধান কারণ বোধ হয়, কৃত্তিবাস বঙ্গদেশের সভ্যতম হিন্দুজনবহুল অংশে জন্মগ্রহণ করিয়া তাঁহার গ্রন্থের প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহার রামায়ণকে বাঁচাইয়া রাখিবার-লোকের কোন দিন অভাব হয় নাই। বাল্মীকির রামায়ণের সহিত অধিকাংশস্থলে সাদৃশ্য থাকার জন্য শিক্ষিত লোকেরা এবং অপেক্ষাকৃত প্রাঞ্জল ও সংক্ষিপ্ত বলিয়া অশিক্ষিত লোকেরা কৃত্তিবাসের রামায়ণই ভাল বাসিত। অশিক্ষিত লোকেরা রামায়ণ শুনে বটে, কিন্তু শিক্ষিত লোকেরা না বাঁচাইলে এবং না পড়িয়া শুনাইলে তাহারা কি করিয়া এ সৌভাগ্য লাভ করিবে? যে অঞ্চলে শিক্ষিত লোকের সংখ্যা বেশি ছিল—কৃত্তিবাস সেই অংশে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন ও তাঁহার রামায়ণ সেই অংশে প্রচারিত হইয়াছিল।

কৃত্তিবাস নিজেই আত্ম পরিচয় লিখিয়া গিয়াছিলেন, তাহা প্রাচীন পুঁথি হইতে পাওয়া গিয়াছে। ইহা হইতে জানা যায়—কৃত্তিবাসের কোন পূর্ব্বপুরুষ পূর্ব্ববঙ্গ

নামে এক ব্রাহ্মণ একখানি রামায়ণ রচনা করিয়া অদ্ভুতাচার্য্য আখ্যা প্রাপ্ত হ'ন। ইনি সীতাকে কালীর অবতার বলিয়া গণ্য করিয়াছেন। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় কৃত্তিবাসের রামায়ণের আদিকাণ্ডের একটি সংস্করণ বাহির করিয়াছেন—তাহাতে ইহার বিস্তৃত পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার বক্তব্যের ভাবার্থ—'অদ্ভুতাচার্য্যের রামায়ণ উত্তর-পূর্ব্ববঙ্গে পঠিত হইত, কৃত্তিবাসের প্রতিপত্তি ছিল দক্ষিণ ও পশ্চিমবঙ্গে। অনেক স্থলে দুই রামায়ণের একটা মিশ্রণ ঘটিয়াছিল। এইরূপ সঙ্কর-পাঠের পুঁথিই পরিমার্জ্জিত করিয়া শ্রীরামপুরের মিশনারীরা মুদ্রিত করিয়াছিল। তাহাই কৃত্তিবাসের নামে বর্ত্তমান সময়ে চলিতেছে। কৃত্তিবাসের তুলনায় অদ্ভুতের রচনা তরলতর ও চটুলতর। কৃত্তিবাস বাল্মীকির রামায়ণ ও রামলীলামূলক সংস্কৃত পুরাণ, কাব্য ও নাট্য হইতে তাঁহার বিষয়বস্তু গ্রহণ করিয়াছেন। অদ্ভুত মূল উপাখ্যানের বাহিরের অনেক সরস, চিত্তাকর্ষক জনপ্রিয় উপাখ্যান রামায়ণের সঙ্গে যুক্ত করিয়াছেন। কৃত্তিবাসের রচনায় কোন অঙ্গে দৈন্যও নাই, আতিশয্যও নাই—অদ্ভুতের রামায়ণে আবেগোচ্ছ্বাসের বাড়াবাড়ি আছে এবং পরিচ্ছন্নতা ও পারিপাট্যের দৈন্য আছে।

হইতে আসিয়া গঙ্গাতীরে ফুলিয়া গ্রামে বাস করেন। তাঁহার পৌত্র মুরারি ওঝা। তাঁহার পৌত্র কৃত্তিবাস। ইনি নানা বিদ্যায় সুপণ্ডিত ছিলেন। ইনি তৎকালীন গৌড়েশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তাঁহার আদেশে ইনি রামায়ণ রচনা করেন। এই গৌড়েশ্বর কে তাহা জানা যায় না—এবং কৃত্তিবাসের রামায়ণ রচনার ঠিক সময়ও জানা যায় না। তবে পঞ্চদশ শতাব্দীতে তিনি আবির্ভূত হ'ন—বিশেষজ্ঞেরা এইরূপ বলিয়া থাকেন। আত্ম-চরিত হইতে এই জানা যায় যে, তিনি কোন ঐহিক লাভের আশায় গৌড়েশ্বরের সভায় শ্লোক পাঠ করেন নাই। রামায়ণ-রচনার জন্য কোন বৃত্তিও তিনি গ্রহণ

কৃত্তিবাসের কল্পিত চরিত্রগুলি অনেকটা মূল রামায়ণের সঙ্গে সুসমঞ্জস, অদ্ভুতাচার্যের রামায়ণের চরিত্রগুলি মূল ছাড়াইয়া বহুদূরে চলিয়া আসিয়াছে এবং তাহারা পুরাদস্তুর বাঙ্গালী হইয়া পড়িয়াছে।—বাঙ্গালীচরিত্রের হৃদয়বত্তা, আবেগাকুলতা, ভাববিহ্বলতা সর্বপ্রকার দুর্বলতা সেগুলিকে আশ্রয় করিয়াছে। কাব্যরসের দিক হইতে বিচার করিলে অদ্ভুত অনেকাংশে কৃত্তিবাসকে পরাভূত করিয়াছেন।'

রঘুনন্দন গোস্বামী কৃত রামরসায়ন একখানি উৎকৃষ্ট রামায়ণ। গোস্বামী প্রভুর রচনা, অতএব ইহা বৈষ্ণবভাবে অভিরঞ্জিত এবং বহুস্থলে ইহাতে ভাগবতের ছাপাপাত হইয়াছে। কৃত্তিবাস বা অদ্ভুতের মত এই রামায়ণ তেমন প্রাঞ্জল নয়। কবি শোকের দৃশ্যগুলিকে তাঁহার রামায়ণ হইতে বাদ দিয়াছেন—বৈষ্ণব হইয়া পাঠকের মনে কষ্ট দিবেন কি করিয়া?

সপ্তদশ শতাব্দীতে রামানন্দ ঘোষ নামক এক ব্যক্তি এক অদ্ভুত রামায়ণ লেখেন—তাঁহার পরিচয় আমরা দীনেশ বাবুর মারফতে প্রাপ্ত হই। ইনি নিজেকে বুদ্ধদেবের অবতার বলিয়া জাহির করিতেন—পুরীর জগন্নাথদেবকে বুদ্ধদেবেরই দারুব্রহ্মমূর্তি বলিয়া প্রচার করিতেন। মুসলমানগণ এই মন্দির ও মূর্তির অবমাননা করিয়াছিল এবং বৈষ্ণবগণ উঁহাকে বিষ্ণু-মূর্তি বলিয়া পূজা করে, সেজন্য এই নবীন বুদ্ধদেবের ক্রোধ ঐ দুই সমাজের উপর। রামচন্দ্রকে বুদ্ধের অবতার বলিয়া মনে করিয়া তিনি রামায়ণ লিখিয়াছিলেন এবং তাঁহার রামায়ণে মুসলমান ও বৈষ্ণবদের প্রতি দারুণ ঈর্ষা প্রকাশ করিয়াছেন। সম্ভবতঃ তিনি বিলীয়মান বৌদ্ধ সমাজের একজন নেতা ছিলেন। তাঁহার রামায়ণে আস্ফালনই খুব বেশি।

করেন নাই। 'গৌড়েশ্বর পূজা কৈলে গুণের হয় পূজা।' এজন্যই গৌড়েশ্বরের সভায় আপনার কবিকৃতিত্ব দেখানোর প্রয়োজন হইয়াছিল।

পাত্রমিত্র সবে বলে শুন দ্বিজরাজে। যাহা ইচ্ছা হয় তাহা চাহ মহারাজে।
কারো কিছু নাহি লই করি পরিহার। যথা যাই তথা গৌরবমাত্র সার।

ইহা হইতে বুঝা যায়—কবির যাহা শ্রেষ্ঠ কাম্য অর্থাৎ গৌরব, তাহা ছাড়া কৃত্তিবাসের কিছুই প্রার্থনীয় ছিল না।

কৃত্তিবাসের রামায়ণের 'খোল নলিচা' দুইই বদলাইয়াছে। প্রচলিত রামায়ণ কৃত্তিবাসের ক্ষেত্রজ সন্তান,—আজকাল অনেকের ইহাই অভিমত। কিন্তু একথাও খুব জোর করিয়া বলা যায় না। ভাষার পরিবর্ত্তন হইয়াছে—সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। পণ্ডিত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার ইহাকে ঢালিয়া সাজিয়াছেন। নূতন নূতন প্রসঙ্গ যে উহার মধ্যে প্রবেশ লাভ করিয়াছে এবং অনেক অংশ বর্জ্জিত হইয়াছে সে বিষয়েও সন্দেহ নাই। কিন্তু মূল উপাখ্যানটি বজায় না থাকিবে কেন? ভাষা যদি বদলাইয়া থাকে তবে বহিরঙ্গেরই বদল হইয়াছে। যাহার রামায়ণের এত নাম, এত প্রচার তাহার রচনা কিছুই থাকিবে না, ইহা ভাবিবার কি কারণ আছে? যাহাই হউক নানা প্রকার প্রক্ষেপ সত্ত্বেও বর্ত্তমানে প্রচলিত রামায়ণের মূল উপাখ্যানটিকে কৃত্তিবাসের বলিয়াই মনে করা যাইতে পারে। শ্রদ্ধেয় যোগীন্দ্রনাথ বসুর কথায় বলা যাইতে পারে—"ভগীরথ-সমানীত স্রোতের পূর্ব্ববারি এক্ষণে কণামাত্র না থাকিলেও ভাগীরথী যেমন পূজিত, কৃত্তিবাস-প্রণীত রামায়ণের পংক্তিমাত্র না থাকিলেও কৃত্তিবাসী রামায়ণ সেই রূপ সমাদৃত হইয়া রহিয়াছে।"

সাহিত্য পরিষদ হইতে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়া কৃত্তিবাসী রামায়ণের অযোধ্যা কাণ্ডের কতকটা ও উত্তরাকাণ্ড সম্পূর্ণ মুদ্রিত হইয়াছে। ইহা প্রাচীন পুঁথি হইতে গৃহীত হইয়াছে। ইহাকে খাঁটী কৃত্তিবাসী রামায়ণের অংশ বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

বাল্মীকির রামায়ণের সঙ্গে প্রচলিত রামায়ণে উপাখ্যানাংশে কি কি

প্রভেদ আছে তাহা দেখা যাক। বাল্মীকির রামায়ণের সঙ্গে যে যে অংশ মিলে না—তাহাদের কোন' কোন' অংশ কৃত্তিবাসের নিজেরও কল্পিত হইতে পারে।

বিষ্ণুর চারি অংশে বিভক্ত হইয়া অবতরণ-সংকল্পে কৃত্তিবাসের রামায়ণ আরব্ধ হইয়াছে। তারপর রত্নাকরের কাহিনী। এই কাহিনীটির জন্ম কখন হইয়াছে জানা যায় না। ইহার মূল অধ্যাত্ম রামায়ণ। বাঙ্গালাদেশে যে ইহা পল্লবিত হইয়াছে তাহা বোঝা যায়—'রামের' আক্ষরিক পরিবর্ত্তনে 'মরা' শব্দের প্রয়োগে। মরা খাটী বাঙ্গালা শব্দ। ঢাকাই সংস্করণে এ কাহিনীটি গোড়ায় নাই। না থাকিতেও পারে। কারণ, পরে হনুমান এই কাহিনী সম্পাতির কাছে বিবৃত করেন। এই কাহিনীর দ্বারা রাম-ভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে। রামের মহিমা এমনই যে—রামভক্তি একজন নরঘাতক দস্যুকেও কুলপতি ঋষি এবং ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি করিয়া তুলিয়াছে। *

বাল্মীকির রামায়ণ বাল্মীকির কবিত্ব-লাভ দিয়া আরব্ধ হইয়াছে। নারদ রামচরিত্রের সন্ধান দিয়াছিলেন মাত্র, যোগবলে বাল্মীকি রামচরিত্র জানিতে পারেন, রামায়ণ রচনা করিয়া তিনি লবকুশকে রামায়ণ শিক্ষা দান করেন। কুশলব অযোধ্যার রাজসভায় রামচন্দ্রকে রামায়ণ শুনাইলেন। রামায়ণের কাহিনী ইহাতেই আরব্ধ হইল। ঢাকা হইতে প্রকাশিত কৃত্তিবাসের আদি কাণ্ডের প্রারম্ভ অনেকটা বাল্মীকিরই অনুসৃতি।

প্রচলিত রামায়ণে রাম-চরিতের আখ্যান-বস্তু নারদ বাল্মীকিকে দিলেন

* রবীন্দ্রনাথ এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—করুণাপূর্ণ হৃদয়ের স্বাভাবিক মহত্ত্বে বাল্মীকিকে এবং ভক্তির অলৌকিক শক্তিতে রত্নাকরকে কবি করিয়া তুলিয়াছে। পাপিষ্ঠ রত্নাকর রামচরিত গান করিয়া পরিত্রাণ পাইয়াছে। পুণ্যবান্ মহর্ষি রামচরিত অবলম্বন করিয়া নিজের মহোচ্চ কাব্য শক্তিকে যথার্থভাবে সফল করিয়া তুলিয়াছেন।

ইহাই বলা হইয়াছে। তারপর কৃত্তিবাস সূর্য্যবংশ, চন্দ্রবংশ, হরিশ্চন্দ্র, সগর, ভগীরথ, সৌদাস, দিলীপ, রঘু ও অজ রাজার কাহিনী ক্রমে বর্ণনা করিয়া দশরথে পৌছিয়াছেন। গঙ্গাবতারণ ভগীরথ-প্রসঙ্গে বর্ণিত হইয়াছে। *

বাল্মীকি প্রথমেই অযোধ্যা-বর্ণনা করিয়া একেবারে রাজা দশরথের রাজত্বকালে উপস্থিত হইয়াছেন। তারপর পুত্র-কামনায় দশরথের অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন—ঋষ্যশৃঙ্গের আগমন, যজ্ঞানুষ্ঠান, পুত্রেষ্টি যজ্ঞ—বিষ্ণুর অংশে রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্নের জন্ম।

বাঙ্গালীকবি রাজা দশরথের বিবাহ—দশরথের ভোগ-লালসায় আসক্তি, রাজ্যে শনির দৃষ্টি—অনাবৃষ্টি—গণেশের জন্ম—শনির তুষ্টিসাধন—অন্ধক মুনির পুত্রবধ—অভিশাপ—সম্বরাসুরের সঙ্গে দশরথের যুদ্ধ—কৈকেয়ীকে বর দান ইত্যাদি বর্ণনার পর ঋষ্যশৃঙ্গের আনয়ন ও যজ্ঞানুষ্ঠানের কথা বলিয়াছেন। তারপর সীতার জন্ম-কথা বলিয়া বাঙ্গালী কবি রামাদির জন্মের কথা বলিয়াছেন। তারপর চারি ভ্রাতার বাল্য-জীবন, শিক্ষা ইত্যাদির বিবরণ আছে। রাজর্ষি জনকের হরধনু লাভ ও ধনুর্ভঙ্গ-পণের কথা—রাজ রাজন্যদের ধনুর্ভঙ্গে অক্ষমতা, গুহকের সহিত রামের মিতালি ইত্যাদির পর বিশ্বামিত্রের আগমনের কথা।

বাল্মীকির রামায়ণে রামাদির জন্মের কথার পর একেবারে ৫।৭ ছত্র পরেই বিশ্বামিত্রের আগমনের কথা। রামাদির জীবনের ১৫।১৬ বৎসরের কথা কিছুই বলা হয় নাই। বিশ্বামিত্রের সহিত রাম-লক্ষ্মণের গমন—তারকা বধ, যজ্ঞরক্ষা, মারীচ ও সুবাহুর সহিত যুদ্ধ, সুবাহু-বধ—জনক-সভায় গমন। তারপর হরধনুর্ভঙ্গ হইবার আগে অনেকগুলি কাহিনী আছে। সে কাহিনীগুলি এই—বিশ্বামিত্র নিজ বংশের উৎপত্তি, কুশনাভের কন্যাদের শাপ ও শাপ-মোচন, কার্ত্তিকেয়ের জন্ম, সগর রাজার উপাখ্যান, গঙ্গাবতরণ, সগর-বংশের

* পরিষদ হইতে প্রকাশিত 'রামায়ণের উত্তরাকাণ্ডে' দিলীপ রঘুর কাহিনী অতি বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। প্রচলিত রামায়ণে উহা সংক্ষিপ্ত হইয়া আদি কাণ্ডে আসিয়া পড়িয়াছে।

উদ্ধার, সমুদ্রমন্থন, ইন্দ্র ও অহল্যার উপাখ্যান। পথে অহল্যার শাপ-মোচন। অহল্যার পুত্র শতানন্দ বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের উপাখ্যান আমূল বর্ণনা করিতেছেন। তারপর হরধনুর্ভঙ্গ—রামাদির বিবাহ, পরশুরামের দর্পহরণ।

বাঙ্গালী কবি তাড়কা রাক্ষসীবধ হইতে পরশুরামের দর্পহরণ পর্য্যন্ত অতি সংক্ষেপে সারিয়া দিয়াছেন। মূল রামায়ণে আদিকাণ্ডে রাবণের উল্লেখ মাত্র আছে। বাঙ্গালা রামায়ণে রামের জন্মে রাবণের মস্তকের মুকুটস্খলন—অশুভের কারণ-নির্দ্দেশের জন্য শুকসারণের পৃথিবী-পর্য্যটন—এবং বিষ্ণুরূপ শ্রীরাম দর্শন এবং সে কথার গোপন ইত্যাদির কাহিনী আছে।

বাঙ্গালী কবি প্রথমেই লবকুশের রামায়ণ গানের কথা উল্লেখ করেন নাই। দশরথ রাজার আদর্শ রাজত্বের বিস্তৃত বিবরণ দেন নাই। দশরথের অশ্বমেধ যজ্ঞের কথাই বলেন নাই। রাজা কুশনাভের কথা, সমুদ্রমন্থন, মরুদ্গণের জন্ম, অম্বরীষ উপাখ্যান ইত্যাদিও কবি বর্জ্জন করিয়াছেন। কবি অঙ্গরাজ, অহল্যা ও অসমঞ্জকে স্ব স্ব অপরাধ হইতে অব্যাহতি দিয়াছেন।

বাল্মীকি অশ্বমেধ যজ্ঞের বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন। তারপর বিশ্বামিত্র যে সকল উপাখ্যান বলিয়াছেন—তাহাদের মধ্যে সগর-ভগীরথের উপাখ্যান বাঙ্গালী কবি পূর্ব্বেই বলিয়া লইয়াছেন। অন্যান্য উপাখ্যান বর্জ্জন করিয়াছেন। শতানন্দ-কথিত বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্রের দ্বন্দ্বের কথা যাহা বাল্মীকির রামায়ণে অনেকাংশ অধিকার করিয়াছে—বাঙ্গালী কবি তাহা বাদ দিয়াছেন। কেবল হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান গ্রন্থের প্রথমেই বলিয়া রাখিয়াছেন। হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান বাল্মীকির রামায়ণে বিশ্বামিত্রের প্রসঙ্গে নাই।

বাঙ্গালা রামায়ণে নূতন উপাখ্যান অনেক। ১। রত্নাকরের উপাখ্যান। ২। খাণ্ড-দণ্ড, মান্ধাতা ও হারীতের উপাখ্যান। ৩। সৌদাস-দিলীপ-রঘুর কাহিনী। ৪। অজ ইন্দুমতী কাহিনী। ৫। দশরথের তিন বিবাহ। ৬। দশরথের

রাজ্যে শনির দৃষ্টি। ৭। গণেশের জন্ম। ৮। সম্বরাসুর বধ। ৯। কৈকেয়ীর বরলাভ। ১০। গুহকের সঙ্গে মিতালি ইত্যাদি।

বাল্মীকি বিবাহিত পূর্ণবয়স্ক দশরথের রাজত্বকাল হইতে রামায়ণের মূল গল্প আরম্ভ করিয়াছেন। কৃত্তিবাস সূর্যবংশের অন্যান্য রাজাদের কথা বলিয়া ক্রমে দশরথে আসিয়াছেন। ইহাতে পাঠকগণের সুবিধাই হইয়াছে। হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যানটি ইহার মধ্যে চমৎকার। সগর-ভগীরথের উপাখ্যান এই প্রসঙ্গে আগে বলিয়া লওয়াও সঙ্গত হইয়াছে। ভগীরথের জন্মের অদ্ভুত কাহিনী বাল্মীকির রামায়ণে নাই—বাঙ্গালী কবি ইহা বাশিষ্ঠ রামায়ণ ও পদ্মপুরাণ হইতে পাইয়াছেন। দিলীপ ভগীরথকে রাজ্যভার দিয়া স্বর্গে গমন করেন। ভগীরথ বিধবার সন্তান নয়। ঐরাবতের গঙ্গাপ্রবাহরোধের কাহিনীও বাল্মীকির রামায়ণে নাই। বাল্মীকির রামায়ণে গঙ্গাকে জহ্নুমুনি কর্ণবিবর হইতে নিষ্ক্রান্ত করিলেন। বাঙ্গালা রামায়ণে আছে—মুনি জানু চিরিয়া গঙ্গাকে বাহির করিয়া দিলেন। গঙ্গার মহিমার পরাকাষ্ঠা দেখাইবার জন্য বাঙ্গালা রামায়ণে কাণ্ডার মুনির গল্প সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গল্পটি ভগীরথের জন্মের গল্পের চেয়েও আজগবি। এই গল্প বাঙ্গালী কবি স্কন্দপুরাণের কাশীখণ্ড হইতে পাইয়াছেন। গঙ্গাবতরণের কাহিনী কবি অন্যান্য পুরাণ হইতে লইয়াছেন। মূল রামায়ণে গঙ্গার পথ এত দুর্গম নয়। দণ্ডের কাহিনী ও দণ্ডকারণ্য সৃষ্টির কাহিনী বাল্মীকি উত্তরকাণ্ডে অগস্ত্যের মুখ দিয়া বলাইয়াছেন। পরিষদের রামায়ণেও সেইরূপ। দিলীপ রঘুর কাহিনী পরিষদের রামায়ণের উত্তরাকাণ্ডে অতি বিস্তৃত ভাবে বিবৃত হইয়াছে।

কালিদাস রঘুবংশে অজবিলাপ লিখিয়াছেন। বাঙ্গালী কবি অজকে বিলাপ করিবার অবসর দেন নাই; কারণ, যে পারিজাত-মালার স্পর্শে ইন্দুমতীর মৃত্যু হইল—অজ সেই মালা নিজে স্পর্শ করিয়া আত্মহত্যা করিলেন। বাঙ্গালী কবি দশরথের বিবাহের বর্ণনাচ্ছলে বাঙ্গালীর বৈবাহিক

অনুষ্ঠানের একটা চিত্র দিয়াছেন। কবি কৈকেয়ীর স্বয়ংবরেরও একটা বর্ণনা দিয়াছেন। বাল্মীকির মতে কৈকেয়ীর বিবাহ স্বয়ংবরের দ্বারা নিষ্পন্ন হয় নাই —অযোধ্যাকাণ্ডে প্রসঙ্গক্রমে কৈকেয়ীর বিবাহের কথা আছে। এ বিবাহে একটি শর্ত্ত ছিল। কৈকেয়ীর গর্ভজাত সন্তানকে রাজ্য-সমর্পণের প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় অশ্বপতি বৃদ্ধ রাজার সঙ্গে কৈকেয়ীর বিবাহ দিয়াছিলেন। এই ব্যাপার স্মরণ করিয়া দশরথ রামের রাজ্যাভিষেক সম্বন্ধে বড়ই উদ্বিগ্ন ছিলেন এবং ভরতকে সন্দেহ করিতেন। বাঙ্গালা রামায়ণে একথার উল্লেখ নাই।

বাঙ্গালী কবি সিংহল-রাজকন্যার সঙ্গে দশরথের বিবাহ দিয়া সিংহল আর লঙ্কা যে এক নয় তাহাই বলিয়াছেন। এ সিংহল ভারতের মধ্যেই একটা প্রদেশ, মৃগয়া করিতে করিতে সেখানে পৌছানো যায়। দশরথের রাজ্যে শনির দৃষ্টি হইল—দশ বৎসর ধরিয়া অনাবৃষ্টি। দশরথ ইন্দ্র ও শনির সঙ্গে দেখা করিয়া ইহার একটা ব্যবস্থা করিলেন। দশরথের রথ শনির দৃষ্টিতে আট-আটটা ঘোড়া লইয়া আকাশ হইতে পড়িতেছিল। জটায়ু পাখা দিয়া বাঁচান। জটায়ুর সঙ্গে দশরথের এইসূত্রে মৈত্রী হইল। বাঙ্গালী জাতির শনিভীতি অত্যন্ত। এই ভীতি হইতেই এই উপাখ্যান রামায়ণের অন্তর্গত হইয়াছে। শনির দৃষ্টিতে গণেশের মাথা উড়িয়া গিয়াছিল, তাহার কাহিনীও এই প্রসঙ্গে আছে।

তারপর অন্ধক মুনির পুত্রবধের একটি করুণ চিত্র বাঙ্গালী কবি অঙ্কন করিয়াছেন ইহাতে কবির কৃতিত্ব প্রকাশ পাইয়াছে। অযোধ্যাকাণ্ডে দশরথের মৃত্যুর আগে দশরথের মুখে বাল্মীকি এই কাহিনী ব[illegible]য়াছেন। পরিষদ্ হইতে প্রকাশিত কৃত্তিবাসী রামায়ণেও তাহাই আছে। বাঙ্গালী-কবি তৎপরে সম্বরাসুর বধ ও কৈকেয়ীর একটি বর লাভের বর্ণনা করিয়াছেন। দশরথের নখ ব্রণের পূঁজরক্ত মুখ দিয়া শোষণ করিয়া কৈকেয়ী আর একটি বর লাভ করেন। কৃত্তিবাসের ঢাকাই সংস্করণে

এই ব্রণ-শোষণের ব্যাপারটিকে আরও বীভৎস করিয়া দেখানো হইয়াছে। বাল্মীকির রামায়ণে এই বর লাভের উল্লেখ মাত্র আছে।

বাঙ্গালী কবি বাল্মীকির ঋষ্যশৃঙ্গকাহিনীটিকে কিছু কিছু পরিবর্তিত করিয়া লইয়াছেন। প্রথমতঃ ঋষ্যশৃঙ্গের জন্মের একটা অদ্ভুত গল্প বলিয়াছেন—তারপর বারাঙ্গনাদের সাহায্যে একটি বৃদ্ধা কি করিয়া ঋষ্যশৃঙ্গকে প্রলুব্ধ করিল—তাহার একটা কদর্য বর্ণনা দিয়াছেন। বাল্মীকি বলিয়াছেন—নানাবিধ মোদক বা মিঠাই দানে (অথাস্মৈ প্রদদুঃ স্বাদূন্ মোদকান্ ফলসন্নিভান্) ঋষ্যশৃঙ্গকে প্রলুব্ধ করা হইয়াছিল। বাঙ্গালী কবি সে মোদককে কামেশ্বর মোদকে পরিণত করিয়াছেন।

বাঙ্গালী কবি এই সঙ্গে বিভাণ্ডক মুনির একটা করুণ খেদোক্তি যোগ করিয়াছেন এবং তাঁহার ক্রোধশান্তির একটা গল্পও রচনা করিয়াছেন। অদ্ভুতাচার্যের রামায়ণ হইতে বোধ হয় ইহা প্রচলিত রামায়ণে আসিয়া থাকিবে। কৌশল্যার সাধ ও তাঁহার গর্ভাবস্থার খুঁটিনাটি বর্ণনা প্রচলিত রামায়ণে আছে। রামাদি চারি ভ্রাতার অন্নপ্রাশন অনুষ্ঠান একটি নূতন সংযোজন। বাল্মীকি হরধনুর ইতিহাস অতি সংক্ষেপেই সারিয়াছেন—বাঙ্গালী কবি ইহার একটা ফলাও করিয়া বর্ণনা দিয়া রাবণকে ধনুক ভাঙ্গিবার জন্য টানিয়া আনিয়াছেন। রাবণ টানাটানি করিয়া ধনুক তুলিতেই পারিলেন না। মোটকথা, এই উপাখ্যানে কবি কৌতুক রসের সৃষ্টি করিতে চাহিয়াছেন।

বশিষ্ঠের পুত্র বামদেব দশরথকে তিনবার রাম নাম শুনাইয়াছিল। একবার 'রাম নামে' কোটি ব্রহ্মহত্যার পাপ নষ্ট হয়—সেই নাম তিনবার শোনানোর অপরাধে বশিষ্ঠ বামদেবকে অভিশাপ দিলেন—'চণ্ডাল হইয়া জন্মগ্রহণ কর।' রাম-ভক্তির বাড়াবাড়ি বাঙ্গালা রামায়ণের একটা বৈশিষ্ট্য। বামদেব গুহক হইয়া জন্মিয়াছিলেন। এই গুহকের সঙ্গে রামের মিতালির একটা কাহিনী বাঙ্গালা রামায়ণে আছে।

আর্ষ রামায়ণে আছে—বিশ্বামিত্র আসিলেন রামচন্দ্রকে লইবার জন্য—তপস্যার বিঘ্নকারী রাক্ষসদের বধ করিয়া রামচন্দ্র নিরুপদ্রব করিতে পারিবেন এই ভরসায়। বাঙ্গালী কবি দশরথের অতিরিক্ত রামবৎসলতা দেখাইবার জন্য দশরথকে প্রবঞ্চক বানাইয়াছেন—তিনি রামলক্ষ্মণকে পাঠাইতেছি বলিয়া ভরত-শত্রুঘ্নকে পাঠাইলেন। ঋষির কাছে প্রবঞ্চনা ধরা পড়িয়া গেল। ইহাতে ভরতেরও কাপুরুষতা প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা মূল রামায়ণে নাই, কোন পুঁথিতেও নাই।

বাঙ্গালী কবি তাড়কা বধের যে বর্ণনা দিয়াছেন—তাহা শিশুদের জন্য রচিত বলিয়া বোধ হয়। বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের আদর্শে বিশ্বামিত্রকে অযথা ভীরু কাপুরুষ করিয়া তোলা হইয়াছে। প্রচলিত রামায়ণে, ঢাকাই সংস্করণে, পরিষদের রামায়ণে ও তুলসীদাসের রামায়ণে আছে, অহল্যা গৌতমের অভিশাপে পাষাণ হইয়া শায়িত ছিলেন—রামচন্দ্রের পাদস্পর্শে তিনি পুনর্জীবন লাভ করিলেন এবং শাপমুক্ত হইলেন। এই কাহিনী অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথের অহল্যা নামক চমৎকার কবিতার সৃষ্টি। বাল্মীকির রামায়ণে অহল্যার উপাখ্যান দুইবার আছে, একবার বিশ্বামিত্রের মুখে বালকাণ্ডে আর একবার ব্রহ্মার মুখে উত্তরাকাণ্ডে। দুইটির মধ্যে কিছু অমিল আছে সত্য—কিন্তু কোনটাতেই অহল্যার পাষাণ হইবার কথা নাই। তিনি ভস্মরাশিতে শয়ন করিয়া তপস্যা করিতেছিলেন। রামচন্দ্রের দর্শনে তাঁহার শাপাবসান হইল বটে, কিন্তু রামচন্দ্রই তাঁহার পাদবন্দনা করিলেন। আর অভিশাপের ফলে ইন্দ্রের সহস্রলোচনত্বের কথা কোনটাতেই নাই। উত্তরাকাণ্ডের উপাখ্যানে আছে—ঐ পাপে ইন্দ্র ইন্দ্রজিতের নিকট পরাস্ত হইয়াছিলেন। পরিষদ্ হইতে প্রকাশিত উত্তরাকাণ্ডেও একথা বলা হইয়াছে বটে, কিন্তু সহস্রলোচনত্ব লাভের কদর্য কাহিনী ইহাতেও আছে।

অহল্যা উদ্ধারের সঙ্গে বেশ আর একটি গল্প সকল বাঙ্গালা কৃত্তিবাসী রামায়ণেই আছে। বিশ্বামিত্র ও রাম-লক্ষ্মণ নদী পার হইবার জন্য পাটনীকে ডাক দিলেন।

পাটনী ভয়ে পলাইল। পরে ঋষির শাপের ভয়ে সে ফিরিয়া আসিয়া বলিল—"আমি কাঁধে করিয়া পার করিতে পারি—নৌকায় উঠিতে দিতে পারি না। যাঁহার পায়ের স্পর্শে পাষাণ মুক্ত হইল—তাঁহার চরণ স্পর্শে যদি কাঠের তরীখানিও মুক্ত হইয়া যায়—তাহা হইলে আমার জীবিকার উপায় থাকিবে না। আমি খাইব কি ?" বিশ্বামিত্র অভয় দিলেন। রামের পদস্পর্শে পাটনীর কাঠের তরী সোনার তরী হইয়া গেল। এসকল কাহিনী রামভক্তি-প্রচারের জন্য রচিত। সীতার বিবাহ উপলক্ষ করিয়া বাঙ্গালী কবি বাঙ্গালী জমিদার-কন্যার বিবাহ বর্ণনা করিয়াছেন এবং সীতাকে বাঙ্গালী-বধূর সাজসজ্জা পরাইয়াছেন। সীতা কবির লেখনীর ফলার মুখে বাঙ্গালী জন্মলাভ করিয়াছে।

ঢাকার ডাঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালী সম্পাদিত আদিকাণ্ড রামায়ণের সঙ্গে কৃত্তিবাসের প্রচলিত সংস্করণের উপাখ্যানগুলি মোটামুটি মিলে, কিন্তু ভাষা মিলে না। এই ভাষার অমিল শুধু পংক্তিগত নয়, পরে উপাখ্যানগুলি অর্বাচীন যুগের ভাষায় পুনর্লিখিত করা হইয়াছে। প্রচলিত রামায়ণের তুলনায় ভট্টশালী মহাশয়ের সংস্করণে বাল্মীকির অনুসৃতি নিকটতর বলিয়া মনে হয়। ইহার প্রারম্ভ বাল্মীকির রামায়ণের মতই। রত্নাকরের কাহিনী নাই। অশ্বমেধ যজ্ঞের কথা ইহাতে আছে। বিশ্বামিত্র সৌদাস, অম্বরীষ, শুনঃশেফের কাহিনী মূল রামায়ণের মত সুবিস্তৃত না হইলেও ইহাতে আছে। বাল্মীকির রামায়ণে নাই—প্রচলিত রামায়ণে নাই—এমন দুই একটি নিবন্ধও ইহাতে আছে। যেমন—রাবণ ও তাহার ভ্রাতা ভগিনীদের জন্ম কথা। বানরগণের জন্ম প্রচলিত রামায়ণে আদিকাণ্ডেই আছে, ইহাতে নাই। মূল রামায়ণে ও পরিষৎ প্রকাশিত রামায়ণে এসমস্ত উত্তরাকাণ্ডের অন্তর্গত। প্রচলিত রামায়ণে চন্দ্রবংশের রাজাদের বিস্তৃত পরিচয় দেওয়ার পরে দশরথের কথা আছে। এই রামায়ণে এ বিষয়ে বাল্মীকিকেই অনুসরণ করা হইয়াছে। এই সংস্করণে আর্য রামায়ণের মত অযোধ্যা বর্ণনা আছে—কিন্তু তাহার সহিত মূলের কোন

মিল নাই। এ বর্ণনা বাঙ্গালার অন্যান্য কাব্যের নগর-বর্ণনারই প্রতিধ্বনি।

প্রচলিত রামায়ণের তুলনায় ভট্টশালী-সম্পাদিত প্রাচীন রামায়ণে সুমিত্রা-প্রসঙ্গ অনেকটুকু স্থান অধিকার করিয়াছে—তাহার বিবাহ হইতে আরম্ভ করিয়া তাহার গর্ভধারণ পর্য্যন্ত বেশ একটি কাহিনী ইহাতে আছে। প্রচলিত রামায়ণে ঐ প্রসঙ্গ সংক্ষেপেই বিবৃত হইয়াছে। প্রচলিত রামায়ণে বেদবতীর সীতারূপে জন্মগ্রহণের কথা অতি সংক্ষেপে এবং ইহার সঙ্গে উর্ব্বশীর কথা ও জনকের ব্রহ্মচর্য্যহানির কথা আছে। এই রামায়ণে উর্ব্বশী-প্রসঙ্গ নাই, রাবণ-ধর্ষিতা বেদবতী পুড়িয়া মরিলে চিতায় একটি অগ্নিপুতলা থাকিয়া গেল। রাবণ সিন্ধুকে পুরিয়া উহাকে সমুদ্রজলে ফেলিয়া দিল। তাহাই ভাসিতে ভাসিতে কূলে ঠেকিয়া সমুদ্রের চড়ায় নিহিত ছিল। জনকের হলের মুখে ঐ [illegible] উঠিল। মূল রামায়ণে এসব কিছুই নাই। কেবল হলমুখে মৃত্তিকা হইতে সীতার উত্থানের কথা আছে। বেদবতীর উপাখ্যান মূল রামায়ণে উত্তরাকাণ্ডে আছে। *

প্রচলিত রামায়ণে গুহকের সহিত রামের মিতালি-প্রসঙ্গে ভক্তির বড় বাড়াবাড়ি আছে, ইহাতে তাহা নাই। বলিবামনের উপাখ্যানে ও রাম লক্ষ্মণের বামনপুরী-দর্শন প্রচলিত রামায়ণে বর্জ্জিত হইয়াছে। সীতার বনবাসানুষ্ঠান পুঁথিগুলিতে খুব বিস্তৃত ভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। প্রাচীন রামায়ণে সংক্ষিপ্ত।

কৃত্তিবাস অযোধ্যা কাণ্ডের উপাখ্যানের সাহিত্যাংশ বাদ দিয়া উপাখ্যানাংশ মোটামুটি অনুসরণ করিয়াছেন। মন্থরার চরিত্র কৃত্তিবাসে জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। মন্থরার যুক্তিগুলি এমনই চোখা চোখা যে, কৈকেয়ীর চিত্ত

* পরিষৎ প্রকাশিত কৃত্তিবাসী রামায়ণের উত্তরাকাণ্ডেও আছে। কিন্তু প্রচলিত রামায়ণের তুলনায় তাহাতে বেদবতীর সতী-মর্য্যাদার ক্ষুণ্নতা দেখানো হইয়াছে।

তাহাতে বিচলিত না হইয়া পারে না। বাল্মীকি কৈকেয়ীকে দশরথের মুখ দিয়া অনেক কটুকথা শুনাইয়াছেন, ভক্ত কৃত্তিবাস সেগুলিকে দশগুণ তীব্র করিয়া তুলিয়াছেন।

পরিষদের রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে প্রথমেই আছে,—ভরত-শত্রুঘ্নকে কেকয়দেশে প্রেরণের কথা। প্রচলিত রামায়ণে তাহা নাই। দশরথের কু-স্বপ্নের কথা দুই রামায়ণেই আছে—কিন্তু স্বপ্ন এক নয়। আসল রামায়ণে কৈকেয়ীর বরপ্রার্থনা-পর্ব্ব সংক্ষেপেই সমাপ্ত হইয়াছে—প্রচলিত রামায়ণে অনেক যুক্তি-তর্কের অবতারণা আছে। প্রচলিত রামায়ণে রামকে না পাঠাইয়া সুমন্ত্রকে আগে কৈকেয়ীর ক্রোধাগারে পাঠানো হইয়াছে। রাম সীতার নিকটে বিদায় লইতে গেলেন,—

সীতা বলেন তুমি যদি হবে বনবাসী।
ঠাকুর বনে গেলে ঘরে কি করিবে দাসী।
সীতার কথা শুনিলেন কমল-লোচন।
আমার সহিত সীতা তুমি যাবে বন॥—

এই চারি চরণেই পুঁথির রামায়ণে সীতার বনগমন-সমস্যার সমাধান হইয়াছে। প্রচলিত রামায়ণে বাল্মীকির অনুসরণে দীর্ঘ তর্কবিতর্ক আছে। পরিষদের রামায়ণে লক্ষ্মণের আস্ফালনের কথাও নাই। এই রামায়ণে ভরদ্বাজ মুনির অলৌকিক শক্তির কথা ও অন্ধক মুনির পুত্র সিন্ধুর বধ-কাহিনীও নাই। পরিষদের রামায়ণে অনেক বিষয়ের উল্লেখমাত্র আছে—প্রচলিত রামায়ণে তাহা ফলাও করিয়া লেখা হইয়াছে। মনে হয় পরিষদের সংগৃহীত পুঁথি খণ্ডিত। পুঁথির রামায়ণে দশরথের সাংবৎসরিক শ্রাদ্ধ, সীতার বালির পিণ্ডদান ও তুলসী, ফল্গু ও ব্রাহ্মণের প্রতি অভিশাপের একটি কাহিনী আছে—প্রচলিত রামায়ণে তাহা নাই।

ভরদ্বাজের আশ্রমে সৈন্যবাহিনীর অতিথি-সৎকার লইয়া বাল্মীকি অত্যন্ত

বাড়াবাড়ি করিয়াছেন—কৃত্তিবাস সংক্ষেপেই সারিয়াছেন। কিন্তু তারপর কৃত্তিবাসের শক্তির দারিদ্র্য বড়ই স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। [illegible]ণের চিত্রকূটের অপূর্ব্ব বর্ণনার বিন্দুমাত্রও কৃত্তিবাসের পুস্তকে নাই। [illegible]ীকির রামায়ণে চিত্রকূটের রাম-ভরত-মিলনের চিত্র জগতের সাহিত্যে অতু[illegible] বাঙ্গালী কবি ইহার শুধু কঙ্কালটুকু লইয়াছেন। জাবালি ও বশিষ্ঠের যুক্তি-পরম্পরা, ভরতের আকিঞ্চন ও দৈন্য, রাজ্যশাসনে ভরতের প্রতি শ্রীরামের উপদেশ ইত্যাদির কিছুই কৃত্তিবাসে নাই।

প্রচলিত রামায়ণে সুতীক্ষ্ণ মুনির আশ্রমে রামচন্দ্রের আতিথ্যের কথা নাই। অগস্ত্যের প্রসঙ্গে ইল্বল বাতাপির গল্প বাঙ্গালা রামায়ণে আছে—কিন্তু অগস্ত্যের অন্যান্য মহিমার কথা নাই। ঋষিকে লইয়া একটু রঙ্গ করাই ছিল বাঙ্গালী কবির উদ্দেশ্য। শূর্পণখার দুর্বুদ্ধি লইয়াও কবি একটু রঙ্গরহস্য করিয়াছেন। বাঙ্গালা রামায়ণে দণ্ডকারণ্যের ও পঞ্চবটীর অপূর্ব্ব বর্ণনা একেবারেই ফুটে নাই। ইহা ছাড়া, তপোবনের শুচিসুন্দর আবেষ্টনী কোথাও অঙ্কিত করিবার প্রয়াস দেখা যায় না। বাল্মীকির অরণ্য-কাণ্ড কবিত্ব-রসের অফুরন্ত ভাণ্ডার—বাঙ্গালী কবি তাহার কিছুই পান নাই। সীতাহরণের প্রসঙ্গে কবি বলিয়াছেন—রাবণেরে গালি দেয় যত আসে মনে। কিন্তু এই তিরস্কার রামায়ণের একটি চমৎকার কবিতা। কবি এই কবিতাটির একটা অনুবাদ দিলে চমৎকার হইত।

বাঙ্গালা রামায়ণে দনুকবন্ধের কাহিনী নাই। রাম-শবরী সংবাদ রামায়ণের একটি অপূর্ব্ব চিত্র, প্রচলিত রামায়ণে উহা নাই। তুলসী দাসের রামায়ণে আছে। ইহা ছাড়া, পম্পাহ্রদের বর্ণনা, পম্পাতীরে রামের সীতা-বিরহ, বর্ষাগমে রামের চিত্তের অস্থিরতা ইত্যাদি কবিত্বময় অংশ বর্জ্জিত হইয়াছে। বাল্মীকির রামায়ণে মানব-প্রকৃতির সহিত বিশ্বপ্রকৃতির একটা যে গভীর যোগ বাণীরূপ লাভ করিয়াছে—বাঙ্গালা রামায়ণে তাহার

আভাসও নাই। হিন্দী রামায়ণে কিছু আছে। এই রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে কোন নূতন কাহিনী প্রবেশ লাভ করে নাই—বরং অনেক অঙ্গই বঞ্চিত হইয়াছে। বনবৃক্ষের শ্যামলসুন্দর শাখার পুষ্পপল্লবগুলি ছিঁড়িয়া লইলে তাহার যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহার সহিতই বাঙ্গালা রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডের উপমা দেওয়া যাইতে পারে।

বাল্মীকি হনুমানের পরিচয়ের প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—"ইনি যেরূপ কথা কহিলেন,—ঋক্, যজু ও সামবেদে যাঁহার প্রবেশ নাই, তিনি এরূপ বলিতে পারেন না।" বাঙ্গালী কবি হনুমানের বিক্রমের কথাই বলিয়াছেন,—পাণ্ডিত্যের কথা কিছু বলেন নাই।

কিষ্কিন্ধ্যা-কাণ্ডের গোড়ায় বাল্মীকি বর্ষা-বর্ণন করিয়া রামচন্দ্রের হৃদয়ে প্রকৃতির প্রভাব-সঞ্চার ও সেই সঙ্গে অনঙ্গপীড়া-সঞ্চারের একটি চিত্র দিয়াছেন। ইহাতে রামচন্দ্র সাধারণ রক্তমাংসের মানুষ হইয়া পড়িয়াছেন। বাঙ্গালী কবির রামচন্দ্র সর্ব্বদাই স্বয়ং ভগবান। কাজেই তিনি রামের এই চিত্ত-বিকারের কথা যতদূর সম্ভব পরিহার করিয়াছেন।

বর্ষা বিগত হইল—শরৎ আসিল। বর্ষায় সীতান্বেষণ ও যুদ্ধোদ্যম বন্ধ ছিল। এখন সময় উপস্থিত। শরতের বর্ণনা ও তাহার প্রভাবেও রামচন্দ্রের চিত্ত-বিকারের ও কামার্ত্তি-সঞ্চারের কথা বাল্মীকির রামায়ণে আছে। বাঙ্গালী কবি ইহা পরিহার করিয়া সংসারযাত্রায় স্ত্রীর প্রয়োজনীয়তা ও শ্রাদ্ধাদির জন্য পুত্রের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে ক্ষুদ্র বক্তৃতা রামের মুখে বসাইয়াছেন। কিষ্কিন্ধ্যার ঐশ্বর্য্য ও সুগ্রীবের অতিরিক্ত ভোগাসক্তির ইঙ্গিতমাত্র করিয়াই কবি অগ্রসর হইয়াছেন। বাল্মীকির রামায়ণে এই দুই বিষয়ের বিস্তৃত বিবরণ আছে। বাল্মীকির রামায়ণে আসন্নমৃত্যু বালী রামচন্দ্রকে যে ভর্ৎসনা করিয়াছেন তাহা যেমন যুক্তিগর্ভ—তেমনি করুণ। বাঙ্গালী কবি ইহাকে রোষমিশ্র তিরস্কারে পরিণত করিয়াছেন। সীতান্বেষণ ব্যাপার অবলম্বন করিয়া বাল্মীকি

প্রাচীন কালের ভারতবর্ষ ও বহির্ভারতের একটা ভৌগোলিক পরিচয় দিয়াছেন। প্রচলিত রামায়ণে ঐ প্রসঙ্গ একেবারেই অনুসৃত হয় নাই।

বাল্মীকির রামায়ণে ময়দানব-রচিত একটি স্বপ্নপুরীর বর্ণনা আছে—সেই পুরীর রক্ষয়িত্রী স্বয়ংপ্রভা নামক তাপসী। বানরগণ এই তাপসীর আতিথ্য লাভ করিয়া বিন্ধ্যগিরির সন্ধান পাইয়া উপকৃত হইল। বাঙ্গালী কবি এই তাপসীকে এক অপূর্ব্বরূপবতী সম্ভবা-নাম্নী নারীতে পরিণত করিয়া মামুলী ধরণে তাঁহার একদফা রূপ বর্ণনা করিয়াছেন—তাঁহাকে বাঙ্গালী বেশভূষায় সাজাইয়াছেন এবং হেমা নাম্নিকা অপ্সরীর একটা কল্প্য কাহিনী এই সঙ্গে জুড়িয়া দিয়াছেন।

বাল্মীকির রামায়ণে সম্পাতির উপাখ্যান এইরূপ—সম্পাতি জটায়ুর বড় ভাই। জটায়ুকে সূর্য্যের অগ্নিজ্বালা হইতে রক্ষা করিতে গিয়া তাঁহার পক্ষদ্বয় দগ্ধ হয়। তারপর হইতে সম্পাতি বিন্ধ্যপর্ব্বতে অবস্থান করিতেছিল। নিশাকর নামে এক ঋষির সঙ্গে তাহার দেখা হয়। নিশাকর বলিয়াছিলেন—"তুমি এখানে অপেক্ষা কর, একদিন রাবণ সীতাহরণ করিয়া পলাইবে। তাহার সন্ধানে বানরগণ এখানে আসিবে। তাহাদিগকে সীতার সন্ধান দিলে তোমার পক্ষোদ্গম হইবে। আমি তোমাকে এক্ষণি পক্ষ দুটি ফিরাইয়া দিতে পারিতাম—তাহা হইলে তুমি কোথায় থাকিবে ঠিক নাই, বানরগণ তোমার সন্ধান পাইবে না। তুমি এখানেই এই অবস্থাতেই অপেক্ষা কর।" সম্পাতি ঋষির কথামত অপেক্ষা করিতেছিলেন—সৌপর্ণ-বিদ্যা প্রভাবে সম্পাতি দিব্য চক্ষু পাইয়াছিলেন; তাহার ফলে তিনি সীতার সন্ধান দিতে পারিলেন।

প্রচলিত রামায়ণে আছে—হনুমান সপ্তকাণ্ড রামচরিত সম্পাতির কাছে বর্ণনা করিলেন। রামায়ণ শুনিয়া সম্পাতির পক্ষোদ্গম হইল। তখন পক্ষবলে ঊর্দ্ধে উঠিয়া সম্পাতি সীতার বর্ত্তমান অবস্থিতি বলিয়া দিলেন।

হনুমান রামায়ণ-বৃত্তান্ত প্রসঙ্গে রত্নাকরের উপাখ্যানটিও সম্পাতিকে শুনাইলেন।

হনুমানের জন্ম-বৃত্তান্ত বাঙ্গালী কবি পরিবর্তিত করিয়া লইয়াছেন। বাঙ্গালা রামায়ণে ইহা সুন্দরাকাণ্ডে জাম্ববানের মুখে এবং তাহার নিজের মুখে বসানো হইয়াছে। বাল্মীকির রামায়ণে ইহা অগস্ত্যের মুখে কথিত। হনুমান লম্ফ দিয়া সাগর উত্তরণ করিলে লঙ্কার অধিষ্ঠাত্রী রাক্ষসীর সহিত (তুলসীদাসের রামায়ণে লঙ্কিনী রাক্ষসী) তাঁহার একটা ছোটখাটো যুদ্ধ হয় এবং রাক্ষসী পরাভূতা হয়। বাঙ্গালী কবি এই রাক্ষসীকে চামুণ্ডা-রূপা শঙ্করীতে রূপান্তরিত করিয়াছেন। চামুণ্ডা হনুমানকে রামচন্দ্রের দূত বলিয়া জানিতে পারিয়া লঙ্কা ত্যাগ করিয়া কৈলাসে চলিয়া গেলেন।

বাল্মীকি লঙ্কার ঐশ্বর্য-বর্ণনায় লঙ্কাসুন্দরীদের রূপযৌবন ও ভোগলীলার বর্ণনায় বহু পৃষ্ঠা অধিকার করিয়াছেন। বাঙ্গালী কবি এই অংশ একপ্রকার বর্জনই করিয়াছেন। আর্য-রামায়ণে আছে—রাবণ সীতাকে বশীভূত করিবার জন্য নানা ভাবে প্রলুব্ধ করিতেছে—সীতা কটুবাক্যে রাবণকে যথোচিত তিরস্কার করিতেছে। বাঙ্গালীকবি এস্থলে সীতার মুখে যে কথাগুলি বসাইয়াছেন —তাহা বাল্মীকির রামায়ণে সীতাহরণের সময় বিবৃত সীতার কটূক্তিরই (অপ্রস্তুত প্রশংসা অলঙ্কারে রচিত) প্রতিধ্বনি। বাল্মীকির রামায়ণে ধান্যমালিনী রাবণকে ভুলাইয়া সীতার নিকট হইতে লইয়া গেল। প্রচলিত রামায়ণে আছে মন্দোদরী নলকুবরের অভিশাপের কথা স্মরণ করাইয়া সীতার উপর অত্যাচারের ব্যাপারে রাবণকে প্রতিনিবৃত্ত করিতেছে। বাল্মীকির রামায়ণে রাবণ নিজেই বলিয়াছে—'ব্রহ্মার অভিশাপ আছে, কোন নারীর অনিচ্ছায় আমি যদি তাহার উপর অত্যাচার করি, তবে আমার মুণ্ডপাত হইবে।'

বাঙ্গালী কবি ত্রিজটার স্বপ্নকে সংক্ষেপে সারিয়াছেন। লঙ্কাদহন ব্যাপার লইয়া কবি রঙ্গরহস্য করিয়াছেন—তাহা এক হিসাবে উপাদেয়ই হইয়াছে।

হনুমান সীতার বার্তা জ্ঞাপনের সময় প্রত্যয় উৎপাদনের জন্য একটি কাহিনী রামকে বলেন—এই কাহিনীই জয়ন্তকাকের নেত্রভেদ-কাহিনী। পুঁথির রামায়ণে দেখা যায়—এই কাহিনীটি কৃত্তিবাস চিত্রকূটে অবস্থিতির প্রসঙ্গে আগেই বলিয়া লইয়াছেন।

বাল্মীকির রামায়ণে বিভীষণ কয়েকটি দীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া রাবণকে সীতা প্রত্যর্পণের জন্য যুক্তি দেখাইয়াছেন। রাবণ তাহাতে বিভীষণকে কুপিত কণ্ঠে বলিল—"তুমি জ্ঞাতি, তুমি হিংসা-বশতঃ এ কথা বলিতেছ।" ইহাতে বিভীষণ ব্যথিত হইয়া চারিজন অনুচর সহ লঙ্কা ত্যাগ করিয়া রামের নিকট চলিয়া আসেন।

বাঙ্গালী কবি বিভীষণের উপদেশ অতি সংক্ষেপে সারিয়াছেন। রাবণ দুই চারিটি অপ্রিয় সত্য-কথা শুনিয়া ক্রোধভরে বিভীষণকে পদাঘাত করিল। ইহাতে অভিমানে বিভীষণ লঙ্কা ত্যাগ করিয়া জ্যেষ্ঠভ্রাতা কুবেরের কাছে চলিয়া যান এবং কুবেরের উপদেশে রাম-পক্ষে যোগ দেন। বিভীষণ রামের প্রত্যয় উৎপাদনের জন্য বলিলেন—'আমি যদি মিথ্যা বলি, তবে যেন কলির ব্রাহ্মণ হই।' এই সূত্রে বাংলা রামায়ণে কবি খুব একচোট সেকালের বাংলার ব্রাহ্মণদের গালাগালি করিয়া লইয়াছেন।

কৃত্তিবাসের মতে কুম্ভকর্ণের ধারণা ছিল—রামচন্দ্র স্বয়ং নারায়ণ। কুম্ভকর্ণ যে রাবণকে হিতোপদেশ দিয়াছিলেন—সে কথা কিন্তু প্রচলিত রামায়ণে নাই। সেতু বন্ধনের ব্যাপারে কাঠবিড়ালীর কাহিনীটি বাঙ্গালী কবির নিজস্ব।

বাল্মীকির রামায়ণে মাল্যবানের সদুপদেশ দানের কথা আছে বাঙ্গালী কবি সে উপদেশ নিকষার (কৈকসীর) মুখে আরোপ করিয়াছেন। রাবণের সভায় অঙ্গদের দৌত্যের কথা আর্ষ রামায়ণে আছে কিন্তু, তাহাতে আছে অঙ্গদ রামের প্রেরিত বার্তা রাবণকে জানাইয়া রাবণের প্রাসাদ-শিখর চূর্ণ করিয়া ফিরিয়া আসিল। প্রচলিত রামায়ণে যে অঙ্গদ-রায়বার সংযোজিত

হইয়াছে—তাহা একটি চমৎকার তরঙ্গ। এখানে রাবণ ও অঙ্গদের কথা-কাটাকাটির মধ্যে কবি রাবণের উপর যত রাগ ছিল সব ঝাড়িয়াছেন। ইহা কবিচন্দ্রের রামায়ণ হইতে প্রচলিত রামায়ণে প্রবেশ করিয়াছে বলিয়া মনে হয়। অঙ্গদ রাবণকে অকথ্য গালাগালি দিয়া তাহার মাথার মুকুট কাড়িয়া লইয়া এক লাফে রামচন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইলেন। তুলসীদাসের রামায়ণেও অঙ্গদ ও রাবণের কথা-কাটাকাটি একটি সরস রচনা।

কুম্ভকর্ণকে জাগাইবার অদ্ভুত অদ্ভুত প্রয়াস লইয়া বাঙ্গালী কবি একটু রঙ্গরহস্য করিয়াছেন। কুম্ভকর্ণ-বধে চৌষট্টি যোগিনীর আবির্ভাব অদ্ভুত রামায়ণ হইতে গৃহীত।

মূল রামায়ণে কুম্ভকর্ণের পর ত্রিশিরা নরান্তক, দেবান্তক, ঋষভ, মত্ত, অতিকায়, কুম্ভ, নিকুম্ভ, প্রজঙ্ঘ, যূপাক্ষ, মকরাক্ষ, বিরূপাক্ষ, মহোদর, মহাপার্শ্ব ইত্যাদি রাক্ষসগণের সেনাপতিত্ব ও পতনের কথা আছে।

প্রচলিত রামায়ণে যথাক্রমে ত্রিশিরা, দেবান্তক, নরান্তক, মহোদর, মহাপার্শ্ব, অতিকায়, তরণীসেন, বীরবাহু, ধূম্রাক্ষ, ভস্মলোচন, মহিরাবণ, অহিরাবণের যুদ্ধ ও পতনের কথা বিবৃত হইয়াছে।

তুলসীদাসে এতগুলি রাক্ষসের পৃথক পৃথক যুদ্ধের কথা বর্ণিত হয় নাই।

বিভীষণের পুত্র তরণীসেন যুদ্ধে গেলেন। ইচ্ছা—'পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ দেখিব নয়নে।' 'মরিলে রামের হাতে গোলোক-নিবাস।' 'আনন্দে সকল অঙ্গে লিখে রাম নাম।' কিন্তু সে ভীষণ যুদ্ধ করিল। রামের দেহে তরণীসেন বিশ্বরূপ দেখিল। সে যোড়হাতে নারায়ণের স্তব করিতে লাগিল। রাম ভক্তের প্রতি সদয় হইলেন—তাহাকে বধ করিবেন কি করিয়া? তরণী দেখিল—তবে ত গোলোক-বাস হয় না। তখন গা-ঝাড়া দিয়া উঠিয়া রামকে গালাগালি দিতে লাগিল। রামচন্দ্র ভাবিলেন—'তবে ত এ বেটা ভণ্ড। এক্ষণি ইহাকে বধ করিতে হয়।' পিতা বিভীষণ বলিলেন—ব্রহ্মাস্ত্র

ছাড়া অন্য অস্ত্রে ইহার মৃত্যু হইবে না। রাম ব্রহ্মাস্ত্র ছাড়িলেন। তরণীর কাটা মুণ্ড রাম-নাম করিতে লাগিল। বিভীষণ কাঁদিতে লাগিল। তরণী যে বিভীষণের পুত্র বিভীষণ পূর্ব্বে একথা গোপন রাখিয়াছিলেন। পুত্রের বৈকুণ্ঠবাসে বাধা দিবেন কি করিয়া? বলা বাহুল্য এ কথা বাল্মীকির রামায়ণে নাই। রামভক্তির এমনি শক্তি যে পিতা [illegible]য়াসে পুত্রবধের সহায়তা করিলেন।

প্রচলিত রামায়ণে আছে—মকরাক্ষ যুদ্ধে আসিল—ষাঁড়ে-টানা রথে এবং রথের চারিপাশে গোরু বাঁধিয়া। "মকরাক্ষ এসেছিল, বুদ্ধিবল সরু। যুদ্ধ জিনতে এসেছিল রথে বেঁধে গরু।" রামচন্দ্র গোবধ করিবেন কি করিয়া? অতএব সে গো-দুর্গে থাকিয়া জয়ী হইবে। বায়ুবাণে আগে গোরুগুলিকে উড়াইয়া তাহাকে বধ করিতে হইল। শুনিয়াছি, রাজপুতদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে পাঠানরা এই প্রথা অবলম্বন করিয়াছিল। তাহা হইতেই বাংলার কবি ইঙ্গিত পান নাই ত?

আর একটি বৈষ্ণব-রাক্ষস বীরচূড়ামণি বীরবাহু। সে তপস্যা করিয়া পাইয়াছিল একটি অজেয় হস্তী,—বর লাভ করিয়াছিল নারায়ণের হাতে মৃত্যুর পর বৈকুণ্ঠবাস। সেও তরণীসেনের মত রামচন্দ্রে নারায়ণ দর্শন করিয়া রণক্ষেত্রে স্তবস্তুতি করিল এবং বৈষ্ণবাস্ত্রে যে তাহার মৃত্যু হইবে রামচন্দ্রকে একথাও বলিয়া দিল। তাহারও কাটামুণ্ড রাম নাম করিতে লাগিল। এই বীর-বাহুর কাহিনী কৃত্তিবাসের রামায়ণেই পাঠ করিয়া মধুসূদন মেঘনাদবধ কাব্যের গ্রন্থারম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি লিখিয়াছেন—সম্মুখ সমরে পড়ি বীরবাহু গেল যমপুরে—বীরবাহু কিন্তু 'যমপুরে' না গিয়া বৈকুণ্ঠপুরে চলিয়া গেল।

প্রচলিত রামায়ণেই আমরা ভস্মলোচনের সাক্ষাৎ পাই। এই রাক্ষস বহু সহস্র বৎসর তপস্যা করিয়া বর পাইয়াছিল—'সে যাহার পানে চাহিবে সেই পুড়িয়া মরিবে।' বিভীষণের উপদেশে রাম মন্ত্রময় অস্ত্র প্রয়োগে

রণক্ষেত্র দর্পণময় করিলেন। বোকা রাক্ষস দর্পণে নিজের মুখ দেখিয়া নিজেই পুড়িয়া মরিল।

শক্তিশেলে আহত লক্ষ্মণকে বাঁচাইবার জন্য হনুমান ওষধি-পর্ব্বত আনয়ন করেন। এই ব্যাপার লইয়া বাল্মীকির কয়েকটি মাত্র শ্লোক আছে। বাঙ্গালী কবি এই ব্যাপারটি লইয়া একখানি ছোট শিশুরঞ্জন কাব্য লিখিয়াছেন।

রাবণ কালনেমিকে পাঠাইলেন বাধা দিবার জন্য। কালনেমি যদি হনুমানকে সেখানকার কুম্ভীরিণীর কবলে পাঠাইতে পারেন—তাহা হইলে সে লঙ্কার অর্দ্ধেক অংশ পাইবে। কালনেমি অর্দ্ধেক লঙ্কা কিভাবে ভাগ করিয়া লইয়া কিরূপে ভোগ করিবে তাহারই স্বপ্ন দেখিতে লাগিল। ইহা হইতেই—'কালনেমির লঙ্কা ভাগ' এই চলতি গতের সৃষ্টি হইয়াছে। গন্ধমাদন পর্ব্বতে কুম্ভীরিণী বধ, সূর্য্যদেবের বাধা দান—সূর্য্যকে কক্ষতল গত করা—তিনলক্ষ গন্ধর্ব্ব বধ—কালনেমি বধ ইত্যাদি লইয়া রচিত উপাখ্যানটি বাঙ্গালা রামায়ণে দেখা যায়। হনুমান অযোধ্যার উপর দিয়া গন্ধমাদন বহিয়া আনিতেছিল—ভরতের বাঁটুলে (ইহা একরূপ anti-air craft ?) হনুমান ধরাশায়ী হইল। বশিষ্ঠের প্রভাবে হনুমান রক্ষা পাইল—ইত্যাদি অনেক আজগুবি কথা এই প্রসঙ্গে সংযোজিত হইয়াছে। যতই আজগুবি হোক, বাঙ্গালী কবি বলিয়াছেন—'শক্তিশেল রামায়ণ শুনে যেই জন। অপার দুর্গতি তার খণ্ডে ততক্ষণ'॥ কৃত্তিবাস নিজেই বলিয়াছেন—"নাহিক এসব কথা বাল্মীকি রচনে। বিস্তারিত লিখিত অদ্ভুত রামায়ণে।" কালনেমি ও কুম্ভীরিণীর কথা তুলসীদাসের রামায়ণেও আছে। কালনেমির বাধাদানের কথা তুলসীদাস সম্ভবতঃ অধ্যাত্ম রামায়ণ হইতে পাইয়াছেন।

তারপর পাতাল হইতে শাক্ত মহীরাবণের আগমন, তাহার ছলনা, রাম-লক্ষ্মণের অপহরণ, হনুমানের পাতাল-গমন, সেখানে কৌশলে মহী-রাবণ বধ, রাণীর যুদ্ধ—হনুমানের পদাঘাতে অহিরাবণের জন্ম—সদ্যোজাত

[illegible] ভীষণ যুদ্ধ ও মৃত্যু—বাঙ্গালা রামায়ণে প্রক্ষিপ্ত কিংবা সংযোজিত হইয়াছে।

মূল রামায়ণে রাবণ-বধের জন্য বিশেষ কিছু নূতন আয়োজন নাই। অগস্ত্য আসিয়া আদিত্য-হৃদয় স্তব শুনাইয়া গেলেন। তাহাতে সূর্য্য প্রসন্ন হইলেন। ইন্দ্র রথ পাঠাইলেন। রাম ব্রহ্মাস্ত্রের কথা ভুলিয়া গিয়াছিলেন—ইন্দ্ররথের সারথি মাতলি ঐ অস্ত্রের কথা স্মরণ করাইয়া দিলেন। এই অস্ত্র রামচন্দ্র অগস্ত্যের নিকট হইতে পূর্ব্বেই লাভ করিয়াছিলেন। ইহাতেই রাবণের মৃত্যু হইল।

তুলসীদাস বলিয়াছেন—বিজয় লাভের জন্য রাবণ যজ্ঞ করিতেছিল—বিভীষণের উপদেশে বানরগণ যজ্ঞ ধ্বংস করিল। যুদ্ধে রাবণ নানা মায়ার সৃষ্টি করিতে লাগিল, কিছুতেই মরে না। তখন বিভীষণ বলিলেন—রাবণের নাভিতে অমৃত-কুণ্ড আছে, নাভিকুণ্ড ভেদ করিলে মৃত্যু হইবে। রাম নাভিকুণ্ডে বাণ মারিয়া রাবণবধ করিলেন।

বাল্মীকি এত সহজে রাবণকে বধ করিতে দেন নাই। রাবণ যুদ্ধক্ষেত্রে অম্বিকার স্তব করিল। অম্বিকা আসিয়া রথে রাবণকে কোলে করিয়া বসিলেন। রাম নিরুপায়। ব্রহ্মা আসিয়া অম্বিকার পূজা করিবার জন্য রামকে উপদেশ দিলেন। অকালে দেবীর বোধন ও পূজার কথা কৃত্তিবাস বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণ হইতে পাইয়াছেন। ব্রহ্মা দেবীকে বলিয়াছেন—রাবণস্য বধার্থায় রামস্যানুগ্রহায় চ। অকালে তু শিবে বোধস্তব দেব্যাঃ কৃতো ময়া॥ এই সুযোগে কবি দেবীর কাছে নিজের দুঃখের কথাটাও বলিয়া লইয়াছেন "অশনবিহীন তনু জীর্ণ শীর্ণ মোর। কৃত্তিবাস কহে মা দুঃখের নাহি ওর।" বলা বাহুল্য নীলপদ্মের গল্প কৃত্তিবাসের নিজের কল্পনা-প্রসূত। এখন শরৎকাল,—অকাল। অকালে বোধন করিয়া রাম দুর্গোৎসব আরম্ভ করিলেন—১০৮টি নীল পদ্মের একটি অম্বিকা চুরি করিলেন—রাম নিজের নীলপদ্মের মত চক্ষু

উপড়াইয়া উপমেয়ের দ্বারা উপমানের অনুকল্প সাধন করিতে গেলেন—তখন অম্বিকা প্রসন্ন হইলেন। কিন্তু তখনও তিনি রাবণকে ত্যাগ করেন নাই। হনুমান চণ্ডী অশুদ্ধ করিলেন,—তখন অম্বিকা রণক্ষেত্র ত্যাগ করিলেন। কিন্তু তাহাতেও নিষ্পত্তি হইল না। যে অস্ত্রে রাবণ মরিবে সে অস্ত্র ব্রহ্মা রাবণকে দিয়াছিলেন, সে অস্ত্র রাবণের গৃহে ছিল। হনুমান মন্দোদরীকে ভুলাইয়া সে অস্ত্র লইয়া আসিল।

বাঙ্গালী কবি শেষ পর্য্যন্ত রাবণকে রামভক্ত বানাইয়াছেন। যুদ্ধযাত্রা-কালে মন্দোদরী বলিলেন—"শ্রীরাম মনুষ্য নয় বিষ্ণু অবতার।" রাবণ বলিল—"তাহা আমি জানি—মরিব রামের হাতে যদি ভাগ্যে আছে।—তাহার পর বৈকুণ্ঠে যাইব। আমার মত ভাগ্যবান্ কে?" রনস্থলে রাবণ রামচন্দ্রের স্তব করিতে লাগিল। রাম প্রসন্ন হইয়া অস্ত্র সংবরণ করিলেন। তখন দেবগণ দুষ্টা সরস্বতীকে রাবণের কণ্ঠে পাঠাইলেন। রাবণ মৃত্যুশয্যায় পড়িয়া বলিল—"এ সময়ে মোর মাথে দেহ শ্রীচরণ। অনাথের নাথ তুমি পতিত পাবন।" রাম বলিলেন—'রাজনীতি কিছু জানি না—মরিবার আগে কিছু উপদেশ দিয়া যাও।' রাবণ একটি উপদেশ দিয়া চক্ষু মুদিলেন।

রাবণবধের পর যুদ্ধকাণ্ডের শেষাংশে বাঙ্গালীকবি কয়েকটি ছোটখাটো নূতন তথ্যের অবতারণা করিয়াছেন। মন্দোদরী আসিয়া রামকে প্রণাম করিলেন। রাম বাঙ্গালী পিসিমার মত আশীর্ব্বাদ করিয়া ফেলিলেন—"জন্ম এয়ো হও।" শেষকালে তিনি রাবণের চিতা অনির্ব্বাণ রাখিয়া এবং মন্দোদরীকে বিভীষণের রাণী করিয়া নিজের বাক্যের যাথার্থ্য রক্ষা করিলেন।

সীতা আসিতেছিলেন—রামদর্শনে, মন্দোদরী মধ্যপথে সীতাকে অভিশাপ দিল—"বিষ দৃষ্টে তোমারে হেরিবে রঘুনাথ।" সীতা আসিলেন সোনার চতুর্দ্দোলায়। বানরেরা সীতাকে দেখিবার জন্য ভিড় করিতেছিল। বিভীষণ তাহাদিগকে কশার আঘাতে দূর করিয়া দিতেছিল। রাম নিষেধ

করিয়া বলিলেন—"রাজার গৃহিণী হয় প্রজার জননী, মাতারে দেখিবে পুত্র ইহাতে কি হানি।" বাল্মীকি এখানে বলিয়াছেন—"গৃহ, বস্ত্র ও প্রাকার স্ত্রীলোকের আবরণ নয়—এইরূপ . . . স্ত্রীলোকের আবরণ নয়, ইহা রাজাড়ম্বর মাত্র। চরিত্রই স্ত্রীলোকের আবরণ।" রামের কঠোরোক্তির উত্তরে কৃত্তিবাসের সীতা যাহা বলিয়াছেন—তাহা বাঙ্গালীর মেয়েরই মত।

ইন্দ্রের বরে সুধাবৃষ্টির ফলে মৃত বানরগণ জীবিত হইল—মৃত রাক্ষসগণ পুনর্জীবিত হইল না। রাম কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। ইন্দ্র বলিলেন—"রামে মার শব্দ ক'রে মরেছে রাক্ষস। রাম নাম শব্দ ক'রে গেছে স্বর্গবাস। শ্রীরাম বলিয়া প্রাণ বাহিরায় যার। অনায়াসে বৈকুণ্ঠে যায় হইয়া উদ্ধার।" সেজন্য রাক্ষসগণ আর ভৌতিক দেহে জীবন লাভ করিল না। ইহা বাঙ্গালী কবির রামভক্তি-প্রচারের একটি কৌশল।

বানরদের পরিতুষ্টির জন্য বাঙ্গালী কবি একটা বাঙ্গালী ধরণের ভোজ দিয়াছেন। তারপর রাক্ষস ও বানরগণ রামের সঙ্গে অযোধ্যায় গেলেন। "চলিল ছত্রিশ কোটি রাক্ষস বানর। একেক চড়িল গিয়া রথের উপর।" পুষ্পক রথে বর্ত্তমান ভারতবর্ষে যত লোক, তত লোকই চড়িল। লক্ষ্মণ সাগরের অনুরোধে সেতু ভাঙ্গিয়া দিলেন।

পথে ভরদ্বাজের আশ্রমে বাঙ্গালী মতে একটি বিরাট ভোজের আয়োজন হইল। স্বয়ং লক্ষ্মী আসিয়া রন্ধন করিয়া সকলকে খাওয়াইলেন। তারপর গুহকের দেশে রাম আসিলেন। এখানে বাঙ্গালীকবি বাঙ্গালার কোন পাড়ার একটা মহোৎসবের (রায়বেঁশে নাচ ?) বর্ণনা করিয়াছেন।

রামের কৈকেয়ী-সম্ভাষণ বাঙ্গালা রামায়ণের একটি চমৎকার অংশ। সীতা বানরগণকে নানা উপহার দিলেন—হনুমানকে তাঁহার কণ্ঠের হার দিলেন, হনুমান তাহা দাঁতে ছিঁড়িয়া ফেলিল। ইহা হইতে 'বানরের গলে মুক্তাহার' এই চলতি গতের সৃষ্টি। হনুমান বলিলেন, যাহাতে রাম-নাম নাই তাহা

তাহার কাছে তুচ্ছ। লক্ষ্মণ বলিলেন—তোমার দেহেও ত রামনাম নাই—তবে কেন তাহা ধারণ কর? হনুমান বুক চিরিয়া দেখাইলেন—'পঞ্জরে পঞ্জরে শত রাম নাম লেখা।' যাত্রার অভিনয়ে এই [illegible] বাঙ্গালীর রামভক্ত মনকে কি আনন্দই না দেয়!

এই সঙ্গে হনুমানের ভোজনের একটি গল্প আছে। কিছুতেই হনুমানের পেট ভরে না। শেষে সীতা নমঃ শিবায় বলিয়া হনুমানের মাথায় অন্ন দিলেন—তাহাতেই তাঁহার তৃপ্তি হইল অর্থাৎ হনুমান শিবাবতার।

বাঙ্গালী কবি লক্ষ্মণের চৌদ্দবৎসর ধরিয়া অনশন ও অনিদ্রার একটি কাহিনী বলিয়াছেন। তারপর লক্ষ্মণ-ভোজন। এখানে একদফা খুব বাঙ্গালী ভোজের বর্ণনা আছে।

উত্তরাকাণ্ডের অধিকাংশ রাবণের কাহিনী। সীতাহরণের সময় হইতে রাবণের সঙ্গে পাঠকের পরিচয় ঘটিয়াছে। এত কাল রাবণ কি কি করিয়াছে অগস্ত্য রামচন্দ্রের সঙ্গে সমস্ত বলিলেন। বাঙ্গালী কবি মোটামুটি বাল্মীকিকেই এই ব্যাপারে অনুসরণ করিয়াছেন। কোন কোন ব্যাপারে বাঙ্গালী কবির নিজস্বতা আছে। যেমন—রম্ভার কাহিনী। ইহা অতি সংক্ষেপেই বাল্মীকি সারিয়াছেন। এই ব্যাপারটা লইয়া বাঙ্গালী কবি বড় বাড়াবাড়ি করিয়াছেন এবং কাহিনীটিকে কদর্য করিয়া ফেলিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে নারীজাতির সম্বন্ধে যে সকল উক্তি সংযোজিত হইয়াছে—তাহাতে নারীত্বের অবমাননাই হইয়াছে।

হনুমানের উপাখ্যান সম্বন্ধে আর্য রামায়ণে আছে—দেবতাদের বরে হনুমান অজেয় হইয়া ঋষিদের উপর অত্যাচার করিতে লাগিলেন। ঋষিরা অভিশাপ দিলেন—তোমার এই অমিত শক্তির কথা তুমি বহুকাল পর্যন্ত বিস্মৃত হইয়া থাকিবে। তোমার চিত্ত সর্বদা ভৃত্য-ভাবে (Slave mentality) আবিষ্ট হইয়া থাকিবে।

বাঙ্গালী কবি বলিয়াছেন—হনুমান গুরুর আশ্রমে পঠদ্দশায় "গুরু পড়াইতে নারে তারে ঘৃণা করে" এই অপরাধে শাপগ্রস্ত হইয়াছিলেন। মূল রামায়ণে হনুমানের অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও অলৌকিক শক্তি সম্বন্ধে অনেকগুলি শ্লোক আছে। বাঙ্গালী কবি হনুমানের পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে মিতবাক। তাহা ছাড়া, অসাধারণ শক্তি সম্বন্ধে হনুমানের আত্মবিস্মৃতি ও ভৃত্য-ভাবের মধ্যে যে মনস্তত্ত্বগত সম্বন্ধ আছে আত্মবিস্মৃত জাতির কবি তাহা ধরিতে পারেন নাই।

সীতা-বর্জ্জনের ঘটনায় বাঙ্গালী কবি রাবণের চিত্রাঙ্কনের একটা ধুয়া তুলিয়াছেন। ইহার কোন প্রয়োজন ছিল না। সীতা-বর্জ্জনের পর রামের সান্ত্বনার জন্য হিরণ্ময়ী সীতা-মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইল—এইরূপ কথা বাঙ্গালী কবি বলিয়াছেন। মূল রামায়ণে আছে, অশ্বমেধ যজ্ঞের জন্যই এই মূর্ত্তি পরিকল্পিত।

মূল রামায়ণে অশ্বমেধ যজ্ঞের সংকল্পের আগে যাহারা অশ্বমেধ করিয়া সুফল লাভ করিয়াছেন—তাহাদের কাহিনী রামচন্দ্র বিবৃত করিয়াছেন। বাঙ্গালা রামায়ণে সে সব কাহিনীর কথা নাই। বাঙ্গালা রামায়ণে যজ্ঞাশ্ব বাল্মীকির আশ্রমে গেল,—লবকুশ অশ্ব ধরিল,—কোশলরাজ-বাহিনীর সহিত যুদ্ধ হইল,—লবকুশ দুই ভাইএ সমস্ত ধ্বংস করিল। ভরত, শত্রুঘ্ন, লক্ষ্মণ ও তাঁহাদের পুত্রগণের পতন হইল—রামচন্দ্রও মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। শেষে বাল্মীকি সকলকে পুনর্জীবিত করিলেন। এসমস্ত আজগুবি ব্যাপার বাল্মীকির রামায়ণে নাই। কাহিনী শেষ করিয়া কৃত্তিবাস বলিয়াছেন—

এসব গাইল গীত জৈমিনি ভারতে। সম্প্রতি যে কিছু গাই বাল্মীকির মতে।

লবকুশের যুদ্ধ ভবভূতির উত্তররামচরিতের একটি বিশিষ্ট অংশ। ভবভূতি সম্ভবতঃ পদ্ম পুরাণ হইতে উহা পাইয়াছিলেন।

এইবার পরিষৎ প্রকাশিত কৃত্তিবাসের উত্তরাকাণ্ডের সহিত প্রচলিত রামায়ণের পার্থক্য সম্বন্ধে কিছু বলা যাইবে। উত্তরাকাণ্ডের প্রারম্ভ দুই

রামায়ণেই এক কাহিনী লইয়া। পরিষদের সংস্করণে মুনিগণের একটা প্রকাণ্ড তালিকা আছে—প্রচলিত রামায়ণে তাহা নাই,—ইহার প্রারম্ভ কবিত্বময়। ইন্দ্রজিৎ বধের যোগ্যতা প্রসঙ্গে পরিষদের সংস্করণে লক্ষ্মণের সংক্ষিপ্ত কৈফেয়তেই রামচন্দ্র পরিতুষ্ট। প্রচলিত রামায়ণে এই প্রসঙ্গ রামচন্দ্রের জেরা ও লক্ষ্মণের বিস্তৃত কৈফেয়তে দীর্ঘ। কাহিনীটি অতিরিক্ত অলৌকিক এবং শিশুরঞ্জন হইয়া উঠিয়াছে।

পরিষদের সংস্করণে হরগৌরীর বিবাহের একটি বিস্তৃত বিবরণ আছে। তুলসীদাসের রামায়ণে ইহা বালকাণ্ডে আছে। প্রাচীন মঙ্গলকাব্যের ইহা একটি বৈশিষ্ট্য। প্রত্যেক মঙ্গলকাব্যে শিবের উপাখ্যান অপরিহার্য্য ছিল। ধর্ম্মমঙ্গলগুলিতে শিব ধর্ম্মঠাকুরের দৌহিত্র—ইনি ক্ষেত্রপাল, কৃষির দেবতা। অন্যান্য মঙ্গলকাব্যগুলিতে শিবের পৌরাণিক, বৌদ্ধ ও লৌকিক রূপের একটা মিশ্রণ দেখা যায়। লৌকিক রূপে নিঃসম্বল ভিখারী শিবের বিবাহ ও অশান্তিময় সংসার-যাত্রার কল্পনা করা হইয়াছে। কৃত্তিবাসেও শিবের লৌকিক রূপকে প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে—ইহার সঙ্গে পৌরাণিক নারদ ও বৌদ্ধ ভীম (ভৃত্য) আছেন। প্রাচীন বাংলা কাব্যগুলিতে শিবের বিবাহ-প্রসঙ্গ লইয়া মস্করহস্য করা হইয়াছে—বাঙ্গালী সংসারের একটা বৈবাহিক চিত্রেরও আভাস দেওয়া হইয়াছে। কৃত্তিবাস সেই প্রথা অনুসরণ করিয়াছেন, এক হিসাবে প্রবর্ত্তনই করিয়াছেন—বলা যায়। রামায়ণের মূল গল্পের সঙ্গে ইহার যোগ নাই—এই কাহিনী কেবল সে-কালের আদর্শের কাব্যকে সম্পূর্ণাঙ্গ করিবার জন্য। প্রচলিত কৃত্তিবাসী রামায়ণে মূল উপাখ্যানের পক্ষে অনাবশ্যক বলিয়া ইহা বর্জ্জিত হইয়াছে।

পরিষদের সংস্করণে সুমেরুর শৃঙ্গ হরণ, লঙ্কা-নির্ম্মাণ, পর্ব্বতের পক্ষচ্ছেদন ইত্যাদি প্রসঙ্গ আছে—প্রচলিত রামায়ণে এইগুলির বদলে আছে,—গজকচ্ছপের যুদ্ধ, গরুড়পবনের যুদ্ধ ইত্যাদি। কুবের ও রাবণ ইত্যাদির জন্ম—রাবণের

লঙ্কাপুরী অধিকার, কুবের-বিজয় ইত্যাদি প্রসঙ্গ দুই রামায়ণেই প্রায় এক, ভাষা বিভিন্ন। আসল কৃত্তিবাসী রামায়ণে কার্ত্তবীর্য্য অর্জ্জুনের দিগ্‌বিজয়, জমদগ্নিমুনির আশ্রমে আতিথ্য-গ্রহণ, রাজার কপিলা প্রার্থনা, তাঁহার সহিত যুদ্ধ, জমদগ্নিবধ, পরশুরামের সহিত অর্জ্জুনের যুদ্ধ, অর্জ্জুনবধ, পরশুরামের ক্ষত্রিয়-বংশধ্বংসের জন্য অভিযান, শরণাগত দশরথের অব্যাহতি ইত্যাদি কাহিনী বিস্তৃত ভাবে দেখা যায়—প্রচলিত রামায়ণে এই সমস্ত বর্জ্জিত হইয়াছে।

রেণুকার সহমরণ-প্রসঙ্গে কৃত্তিবাস সহমরণের উচ্ছ্বসিত মহিমাকীর্ত্তন করিয়াছেন। যমের সহিত যুদ্ধ-প্রসঙ্গে আসল কৃত্তিবাসী রামায়ণে কবি দানধর্ম্মের মহিমাকীর্ত্তন করিয়াছেন—বৌদ্ধনীতির প্রভাব বলিয়া মনে হয়। এই রামায়ণে নিবাত-কবচের সহিত রাবণের যুদ্ধ ও মৈত্রী, নাগরাজের সহিত যুদ্ধ ও নাগরাজকন্যা-বিবাহ, বরুণপুরী জয় ইত্যাদির কাহিনী আছে। এগুলি প্রচলিত রামায়ণে বর্জ্জিত হইয়াছে।

আসল রামায়ণে কৃত্তিবাস বলিরাজের পুরীতে রাবণকে লইয়া গিয়া মনের সাধে তাহার লাঞ্ছনার একশেষ করিয়াছেন। বলিরাজের সহিত যুদ্ধে রাবণ পরাজিত হইয়া খাঁচায় বন্দী হইয়া তাহার আস্তাবলে বৎসর অনেক বাস করিল। খাঁচার ভিতরে রাবণ ক্ষুধায় কাতর। "অন্ন হাথে করিয়া বলিছে দাসীগণ। দেহ অন্ন হাথে নৃত্য করহ রাবণ। খাঁচার ভিতরে নাচে রাক্ষসের নাথ। ক্ষুধাতে ব্যাকুল হঞা পাতে কুড়ি হাত।" শুধু তাহাই নয়—"বলির দাসীর ঝাঁটা খাইল দশানন।" "কুপিল বলির দাসী ঝাঁটা নিল হাতে। আথালি পাথালি মারে রাবণের মাথে॥ বাড়ি হাথে করি খোঁচা মারে কোন জনা। খাঁচাতে ভরিয়া হাথ কেহো মারে ঠোনা॥ মারণে কাতর হঞা রাজা দশানন। বলিরাজা গোচরিয়া জুড়িল ক্রন্দন॥"

ভাগ্যে মাইকেল কৃত্তিবাসের আসল পুঁথি দেখিতে পান নাই—তাই কৃত্তিবাস মাইকেলের লেখনী হইতে সনেট উপহার পাইয়াছিলেন। রাবণকে

কৃত্তিবাস এতই হীনচেতা করিয়াছেন যে খাঁচা হইতে অব্যাহতি পাইয়া—

রথে চড়ি রাবণ বাজায় জয়ঢোল। বলিকে জিনিল বলি করে গণ্ডগোল।"

মান্ধাতার সহিত রাবণের যুদ্ধ, কপিলদেবের কাছে রাবণের পরাজয়, রাবণের লক্ষলক্ষ নারী হরণ, নারীগণের উদ্ধারের জন্য কালকেয়ের মহারণ, রাবণের ভগিনীপতিবধ, সূর্পণখার অভিযোগ ও তাহার দণ্ডকারণ্যে স্বাধীন ভাবে বিচরণের আদেশ।" হনুমানের জন্মকথা, হনুমানের বাল্য ও যৌবনের কথা, বালী-সুগ্রীবের জন্ম ও তাহাদের দ্বন্দ্ব, দিলীপের অশ্বমেধ, রঘুর ইন্দ্রজয়, আত্মদান, গুরুদক্ষিণাদান—এইগুলি প্রচলিত রামায়ণে বর্জ্জিত হইয়াছে। কোন কোনটি অবশ্য অন্যান্য কাণ্ডে আছে। আসল রামায়ণে রাবণের স্বর্গ-বিজয়ের কাহিনী অত্যন্ত দীর্ঘ—কৃত্তিবাস চণ্ডীকেও যুদ্ধে নামাইয়াছেন।

আসল কৃত্তিবাসী রামায়ণে মূল রামায়ণের অনুসরণে ইন্দ্রের লঙ্কাপুরে বন্দীদশায় অবস্থান ব্রহ্মার চেষ্টায় তাঁহার উদ্ধার এবং ইন্দ্রের বন্ধনের কারণ বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। প্রচলিত রামায়ণে এ সমস্ত বর্জ্জিত হইয়াছে। বানর-রাক্ষসদের বিদায়-দৃশ্য কৃত্তিবাস বড়ই করুণ করিয়া আঁকিয়াছেন—ইহাতে রামচন্দ্রের চরিত্রের 'কুসুমাদপি মৃদুত্ব' ফুটিয়া উঠিয়াছে।

আসল কৃত্তিবাসী রামায়ণে মৃগরাজার কথা, যযাতির জরহরণ, অগস্ত্য বশিষ্ঠের জন্ম, নিমির কাহিনী, ব্রাহ্মণ ও কুক্কুরের কাহিনী ইত্যাদি আছে—এসব প্রচলিত রামায়ণে বর্জ্জিত হইয়াছে। বাল্মীকির রামায়ণে শম্বুক ঋষির তপস্যা, ব্রাহ্মণপুত্রের অকাল মৃত্যু, শম্বুক বধ, শম্বুকের উদ্ধার, মৃত ব্রাহ্মণপুত্রের পুনর্জ্জীবন ইত্যাদি কাহিনী আছে—পরিষদের রামায়ণেও বিস্তৃত ভাবেই আছে। প্রচলিত রামায়ণে বর্জ্জিত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে কৃত্তিবাস বর্দ্ধমান জেলার আগরি জাতির একটা ইতিহাস দিয়াছেন। শূদ্র শম্বুকের দুই পত্নী

ছিল—একটি শূদ্রী, একটি ব্রাহ্মণী। তাহাদের বাইশ জন পুত্রকে হনুমান বর্দ্ধমান জেলায় উপনিবিষ্ট করিলেন। তাঁহাদের সন্তানগণই আগরি। এই অদ্ভুত কাহিনীর সঙ্গে রামায়ণের কোন সম্পর্ক নাই। কৃত্তিবাস ইহা রামায়ণে জোর করিয়া প্রবিষ্ট করিয়াছেন। প্রচলিত রামায়ণে এ কাহিনী বর্জ্জিত হইয়াছে। তারপর কৃত্তিবাসের রামায়ণে আছে—ব্রহ্মদত্তের উপাখ্যান, শ্বেতরাজার উপাখ্যান, দণ্ডের উপাখ্যান ও দণ্ডকারণ্য সৃষ্টির কাহিনী, বৃত্রাসুরের কাহিনী, ইন্দ্রদীপের কাহিনী বা ইলার উপাখ্যান। শ্বেতের উপাখ্যান ছাড়া অন্যগুলি প্রচলিত রামায়ণে বর্জ্জিত।

পরিষদের রামায়ণে লবকুশের যুদ্ধ ও অযোধ্যা-ভ্রমণ অতি বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত। প্রচলিত রামায়ণে সংক্ষিপ্ত। কৃত্তিবাস এই প্রসঙ্গের কিছু অংশ দীর্ঘ ত্রিপদীতে রচনা করিয়াছেন। কৃত্তিবাস এই প্রসঙ্গে বানিয়া ও মালিনীর বিবাদের অবতারণা করিয়া অযোধ্যাকে প্রায় বর্দ্ধমানে করিয়া তুলিয়াছেন। কৃত্তিবাসের রামায়ণের শেষাংশ সম্পূর্ণ বাল্মীকির অনুসরণ। প্রচলিত রামায়ণে অতি সংক্ষিপ্ত। কৃত্তিবাস শেষে নিজের রামায়ণের মহিমাগান করিয়া গ্রন্থ শেষ করিয়াছেন।

কৃত্তিবাসের গীত শুনি বড়ই মধুর। শুনিআ গীতিকা পুণ্য পাপ হয় দূর ॥
তালশব্দে বাজে নূপুর ঝন ঝন। গীতশব্দে গাইল শুন রামায়ণ।
ব্রাহ্মণে শুনিলে পায় গুরুর পূজা। ক্ষেত্রি শুনিলে হয় পৃথিবীর রাজা ॥
বৈশ্য শুনিলে নানা ধনে বাঢ়য় ঘর। শূদ্র শুনিলে হয় ভকতি বিস্তর ॥
সংসারে ভরিয়ে বুলে কৃত্তিবাস পাঁচালী। যাহার প্রসাদে শুনি নানা অর্থকেলি ॥
যাহার প্রসাদে শুনি এই রামায়ণ। হেন পণ্ডিতে আশিস করে দেব নারায়ণ।
রামের গমনে রামায়ণ করি সকলি। সাতকাণ্ডে পোথাগান রচিল পাঁচালী।

আসল রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে যে সকল কথা সংক্ষেপে আছে—প্রচলিত রামায়ণে তাহা বিস্তৃত করিয়া বিশদ করিয়া বলা হইয়াছে। উত্তরাকাণ্ডে

যে সকল কাহিনী বিস্তৃত ভাবে লিখিত হইয়াছে—প্রচলিত রামায়ণে তাহা সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে।

আসল রামায়ণে পয়ার পংক্তিগুলিতে মাত্রার বেশি কম আছে—প্রচলিত রামায়ণে সেগুলিকে চৌদ্দ মাত্রায় পরিণত করা হইয়াছে। আসল রামায়ণে খাঁটি বাংলা শব্দের প্রাচুর্য্য দৃষ্ট হয়—প্রচলিত রামায়ণে সেগুলির বদলে সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। প্রচলিত রামায়ণে বহুস্থলে রসান দেওয়া হইয়াছে এবং রঙ্গরসের সৃষ্টি করা হইয়াছে। কবিত্বের দিক হইতে অনেকস্থল যে উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে তাহা স্বীকার করিতেই হয়। আবার অনেক স্থলে অতিরিক্ত কুরুচি-বিড়ম্বিত হওয়ায় কৃত্তিবাসের মর্য্যাদা নষ্ট হইয়াছে। প্রাচীনকাব্যে আমরা দেখিতে পাই—এক পৃষ্ঠা দুই পৃষ্ঠা ধরিয়া নামের তালিকা। কৃত্তিবাস সেকালের প্রথাই অনুসরণ করিয়াছেন। প্রচলিত সংস্করণে নামের তালিকাগুলি বর্জ্জিত হইয়াছে।

আসল রামায়ণে সংজ্ঞাবাচক নামগুলির বিকৃত বানান দৃষ্ট হয়। যেমন —কার্ত্তিকবীর্য্য (কার্ত্তবীর্য্য), হরিহয় (হৈহয়), পৌলম (পুলমা), ঋষ্যামুখ (ঋষ্যমূক), মেঘনাদ (মঘবান্), জরাসিন্ধু (জরাসন্ধ)। কৃত্তিবাসের আসল রামায়ণের ভাষা অনেকস্থলে দুর্ব্বোধ্য। যেমন—লেঙ্গে ডাবুশ মারে কাণ্ড চিয়াড়ি। পাত্রা মাদল ভেরু, দোসরি কাহান। হাত কুড়াইলেক রাজা নিকলিল পানি। বিহন্দে বিহন্দে বার সাণ্ডাইল ভিতরে। গাহল গৌশল পড়িল চিনচণ্ডা জাতি। কৃত্তিবাসের ব্যবহৃত কতকগুলি শব্দ নগরে অপরিচিত হইয়া গিয়াছে—আমাদের পল্লীঅঞ্চলে আজিও চলে। যেমন—রা কাড়া, হাকার, গোহারি, বিহান, ঝিল (চিতা), কাঁকতলী, খাম্বা, ডাঙ্গ, গাঁড়, অথান্তরে, জুয়ায়, ডাগর, পাতিল, পাথলানো। *

---

* বাঙ্গালী কৃত্তিবাস দেব, দানব, রাক্ষস, বানর যাহাদের কথাই বলুন না কেন—ভোজনের কথাটা কোথাও ভুলেন নাই। মধু দৈত্যের গৃহে রাবণ কুম্ভিনসীর পাক-করা

কৃত্তিবাসের নিজস্ব ভাষা কিরূপ ছিল, ঢাকাই সংস্করণ হইতে উদ্ধৃত নিম্নলিখিত অংশ পাঠ করিলে কতকটা আভাস পাওয়া যাইবে।

(১) রাত্রিদিন বাঞা গিঞা পাইল তপোবন। আশ্রম নিকটে বাসা কৈল ততক্ষণ॥ বুড়ী বেশ্যা বোলে এখন নহে গীদ নাচন। বিভাণ্ডক শাপিঞা পাছে লএত জীবন। কালি বিহানে যাব মুনির তপোবন। সেই কালে দেখিব গিঞা মুনির নন্দন। নিশবদে রহিলা সব নাহিক প্রকাশ। বিভাণ্ডকে শাপিঞা পাছে করে সর্ব্বনাশ। বসিঞাছেন ঋষ্যশৃঙ্গ বেদ উচারিতে। বেশ্যা সব দেখিয়া মুনি উঠিলা আস্তেবেস্তে। আগু বাঢাঞা জোড় হাতে করিছেন বিনয়। কোথা হৈতে আয় তোমরা কোনরূপ হয়। বুঢ়ি বেশ্যা বুলিতে লাগিলা হাস্য অভিলাষে। আমি সব মুনি ভ্রমি নানা দেশে।

প্রচলিত কৃত্তিবাসী রামায়ণ বলিতে জয়গোপাল তর্কালঙ্কারের দ্বারা

ভাত-ডাল না খাইয়া বল পাইতেছে না। পাতালে বলির গৃহে খাঁচার মধ্যে আবদ্ধ হইয়া রাবণ দাসীদের দেওয়া এঁটো ভাত খাইয়া জীবন রক্ষা করিতেছে। ইন্দ্রের মহিষী শচীর গর্ভাবস্থায় পরমান্ন চাই। 'পরমান্নে সম্ভাষণা জানে দেবগণ। সেই পরমান্ন শচী করিল ভক্ষণ'।

ঋষি গৌতম অহল্যার স্বামী হিসাবে ব্রহ্মার জামাতা। তিনি ব্রহ্মলোকে গিয়াছেন—ব্রহ্মা তখন—"ব্রহ্মাণীরে বলে কাট করহ রন্ধন। জামাতারে নানা দ্রব্য করাও ভক্ষণ।" হিমালয় গৃহে নারদের সঙ্গে শিব আহারে বসিয়াছেন—নারদ বলিতেছেন—'পিষ্টক পরমান্ন আনিয়া তাহাতে দেহ ভাত। দধি দুগ্ধ ঘৃত দিতে না করিও হেলা। ঘনবর্ত্ত দুগ্ধ দেহ মর্তমান কলা।" বানরদেরও ফলমূলে চলিতেছে না। "অঞ্জনা রন্ধন কৈল প[illegible]শ ব্যঞ্জন। চারি বীর মহাসুখে করিল ভোজন।" অগস্ত্য, ভরদ্বাজ, জমদগ্নি ইত্যাদি মুনির অ[illegible]নর আতিথ্যে ভোজনেরই বাড়াবাড়ি। রামসীতা অযোধ্যায় অশোক-কাননে নর্মবিলাসের জীবন-যাপন করিতেছেন—"লক্ষ্মীরূপা সীতা তথা করেন রন্ধন। পায়স পিষ্টক অন্ন পঞ্চাশ ব্যঞ্জন।" লবকুশ অযোধ্যায় রামায়ণ গান করিতে আসিয়াছেন—কৃত্তিবাস তাহাদিগকেও রন্ধন হইতে অব্যাহতি দেন নাই। "স্নান করিয়া আইলা ভাই দুইজন। মায়ে সোডরিয়া দোঁহে চড়াইল রন্ধন। পঞ্চাশ ব্যঞ্জন ভাত সুবর্ণের থালে। ভোজন করিয়া দোঁহে হইল সুশীতলে।"

সুসংস্কৃত ও সংক্ষেপে সম্পাদিত এবং পরে বটতলার মোহনচাঁদ শীল কর্ত্তৃক নিয়োজিত পণ্ডিতগণের দ্বারা পরিমার্জ্জিত ও পরিবর্দ্ধিত পুস্তক বুঝায়।

উভয় রামায়ণের ভাষার সাদৃশ্য ও অসাদৃশ্যের কিছু কিছু দৃষ্টান্ত দিই—

পরিষদের রামায়ণ

পূর্ব্বজন্মে ছিল কুঁজী ইন্দ্রের অপ্সরা। রামের বনবাস হেতু নাম মন্থরা॥
কেকয়ীর চেড়ী সে ভরতের ধাত্রীমাতা। রামসীতার দুঃখ হেতু সৃজিল বিধাতা॥
বিভাকালে দশরথ দান পাইল চেড়ী। রাম রাজা হব বলি করে ধড়ফড়ি॥
আকৃতি প্রকৃতি কুঞ্চিত দেখি তারে। সব নষ্ট হঅ কুঁজী থাকে যার ঘরে।
যেমতে মরিব রাবণ ধাতা তাহা জানে। বিধাতা সৃজিল তারে এই সে কারণে॥

প্রচলিত রামায়ণ

পূর্ব্বজন্মে ছিল দুন্দুভি নামে অপ্সরা। জন্মিল সে কুঁজী হয়ে নামেতে মন্থরা।
কৈকেয়ীর চেড়ী ভরতের ধাত্রীমাতা। রামের দুঃখের লাগি সৃজিল বিধাতা॥
দশরথ পেয়েছিল বিবাহে সে চেড়ী। রাম রাজা হ'ন দেখি করে ধড়ফড়ি॥
আকৃতি প্রকৃতিতে কুৎসিতা দেখি তারে। সর্ব্বনাশ করে কুঁজী থাকে যার ঘরে॥
মরিবে রাবণ যাতে বিধাতা সে জানে। বিধাতা সৃজিল তারে সেই সে কারণে॥

পরিষৎ—

কি ব্যথা হইল প্রিয়ে তোমার শরীরে। বৈদ্য আনিয়া দড় করিব তোমারে॥
কোন কার্য্য লাগি তুমি কর অভিমান। জে বর মাগিবে তুমি তাই দিব দান।
এত শুনি কেকয়ী রাজার পান্য আশ। পূর্ব্বকথা রাজার ঠাঞি করিল প্রকাশ।
ব্যাধিপীড়া হঅ নাঞি পায়্যাছি অপমান। আগে সত্য কর রাজা পিছে মাগি দান।
কেকয়ী প্রমাদ পাড়ে রাজা নাঞি জানে। সত্য করিল রাজা স্ত্রীয়ের বচনে।
মায়াপাশ জালে জেন বনে মৃগী ঠেকে। প্রমাদ পড়িল রাজা পাছু নাঞি দেখে॥
রাজা কঅ কেকয়ী তুমি কি বলিবি বল। দুই সত্য করি আমি ইথে নাঞি চল॥
জে বর মাগিবে তুমি তাই দিব দান। আছুক অন্যের দায় দিতে পারি প্রাণ॥

প্রচলিত—

ব্যাধিপীড়া হয় যদি তোমার শরীরে। বৈদ্য আনি সুস্থ করি বলহ আমারে॥
কোন কার্য্যে কৈকেয়ী কর অভিমান। আজ্ঞা কর তাহা তোমা করি আজি দান॥
এত যদি কৈকেয়ী রাজার পায় আশ। পূর্ব্ব কথা তার আগে করিল প্রকাশ॥
রোগ পীড়া নাই মোর পাই অপমান। আগে সত্য কর তবে পিছে মাগি দান।
কৈকেয়ী প্রমাদ পাড়ে রাজা নাহি জানে। সত্য করে দশরথ প্রিয়ার বচনে।
মহাপাশ লাগি যেন বনে মৃগ ঠেকে। প্রমাদ পাড়িবে রাজা পাছু নাহি দেখে॥
ভূপতি বলেন প্রিয়ে নিজ কথা বল। সত্য করি যত্তপি তোমারে করি ছল।
যেই দ্রব্য চাহ তুমি তাহা দিব দান। আছুক অন্যের কার্য্য দিতে পারি প্রাণ॥

পরিষৎ—

আর জত রাজকুমার তাহা নাহি গণি। দুর্জ্জয় ইন্দ্রজিৎ ত্রিভুবনে জানি॥
ইন্দ্রজিতের ডরে কেহ নহে স্থির। ত্রিভুবন জিনিঞা কুম্ভকর্ণের শরীর।
মাথা কাটিলে না মরে বৈরী না ধরে টান।
হেন বীর থাকিতে কৈলে ইন্দ্রজিতের বাখান॥
কোন তপ করিলেক কাহার পাইলেক বর।
সভা থাকিতে বাখান কেন রাবণকোঙর॥

প্রচলিত—

মারিল এসব বীর তাহা নাহি গণি। ইন্দ্রজিতে মারিল যে তাহার বাখানি॥
রাবণ-ভ্রাতার ভয়ে কেহ নহে স্থির। ত্রিভুবন জিনি কুম্ভকর্ণের শরীর।
কাটিলে না মরে সে না ধরে কেহ টান। কুম্ভকর্ণ এড়ি ইন্দ্রজিতের বাখান।
দশমুণ্ড কাটিয়া পাইয়াছিল বর। তারে ছাড়ি বাখান কি তাহার কোঙর॥

পরিষৎ—

কুম্ভকর্ণ তপ করিল অগ্নি চারি পাশে। গ্রীষ্মকালে মাথার উপর সূর্য্য আকাশে॥
বর্ষাকালে কুম্ভকর্ণ থাকে একাসনে। বরিষণের পানিতে বিরতি রাত্রি দিনে॥

শীতকালে থাকে রাত্রে পানির ভিতর। হেন তপ করিল দশ সহস্র বৎসর॥
দশসহস্র বৎসর তপ কৈল রাক্ষস বিভীষণ।
গন্ধর্ব্ব গীত গায় দেব করে পুষ্পবরিষণ॥

প্রচলিত—

গ্রীষ্মকালে অগ্নিকুণ্ড জ্বালি চারিপাশে। উপরেতে খরতর ভাস্কর প্রকাশে॥
বরিষাতে চারিমাস থাকে অনশনে। শিলা বরিষণ ধারা সহে রাত্রি দিনে॥
শীতকালে স্নিগ্ধ জলে থাকে নিরন্তর। এইরূপে তপ করে নিযুত বৎসর॥
অযুত বৎসর তপ করে বিভীষণ। স্বর্গেতে দুন্দুভি বাজে পুষ্পবরিষণ॥

পরিষৎ—

ইন্দ্র-ময়ূর হৈলা কুবের কেকলাস। যম কাক হৈলা বরুণ হৈলা হাঁস।
মরুতরাজা যজ্ঞ করে বেঢ়িঞা লোকে।
সংগ্রাম দেহ সংগ্রাম দেহ রাবণরাজা ডাকে।
মরুত বলে আমি তোমা নাহি জানি। পরিচয় দেও যেন আমি চিহ্নি—

* * * *

পূর্ব্বে ময়ূর ছিল নীল আকার। ইন্দ্রের বরে সহস্র লোচন হইল তাহার।

প্রচলিত—

ইন্দ্র হ'ন ময়ূর কুবের কাঁকলাস। যম কাকরূপ হ'ন বরুণ সে হাঁস।
যজ্ঞ করে মরুত্ত ভূপতি মহাসুখে। রণং দেহি বলি রাবণ মরুত্তেরে ডাকে।
মরুত্ত বলেন আমি তোমারে না চিনি। পরিচয় দেহ আগে তবে আমি জিনি।

* * * *

পূর্ব্বেতে ময়ূর ছিল সামান্য আকার। ইন্দ্রবরে সহস্র লোচন হৈল তার।

এই সকল প্রচলিত পাঠ জয়গোপালী পাঠও নয়, ইহাকে মোহনচাঁদী পাঠ বলা যাইতে পারে। জয়গোপালের পাঠ মোহনচাঁদ পণ্ডিতদের সাহায্যে কালোপযোগী করাইয়াছেন। জয়গোপালী পাঠে ছিল—পাকল চক্ষে রামের

পানে চাহিলেন বালী। দন্ত কড়মড়ায় বীর রামকে পাড়ে গালি। ইহার মোহনচাঁদী পাঠ হইয়াছে—রক্তনেত্রে শ্রীরামের পানে চাহে বালী। দন্ত কড়মড় করে, দেয় গালাগালি।

তুলসীদাসের রামায়ণের সঙ্গে কৃত্তিবাসী রামায়ণের পার্থক্য সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলি। প্রধান [illegible]সের মতে রাবণ ছায়া-সীতা হরণ করিয়াছিল—আসল সীতা অগ্নির মধ্যে রহিয়া গেলেন। অগ্নিপরীক্ষার সময়ে ছায়া-সীতা অগ্নি প্রবেশ করিলেন, তখন প্রকৃত সীতা অগ্নি হইতে বহির্গত হইলেন। এইভাবে তিনি সীতার মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন। ভক্ত কবির পক্ষে সাক্ষাৎ নারায়ণী সীতার অবমাননার বর্ণনা করা অসম্ভব। জয়ন্ত কাকের উপাখ্যানে তুলসীদাস লিখিয়াছেন—কাক চঞ্চু দ্বারা সীতার চরণ বিদারণ করিল। বাল্মীকি স্তনের কথা লিখিয়াছেন। ভক্ত ঈষৎ পরিবর্ত্তন করিয়া লইয়াছেন। দুই গ্রন্থের উপাখ্যানাংশে মোটামুটি মিল আছে। বালকাণ্ডের প্রথমাংশে ও উত্তরাকাণ্ডে খুব বেশি অমিল। তুলসীদাসে বালকাণ্ডের প্রথমাংশে হরপার্ব্বতী-লীলা অনেকটুকু স্থান জুড়িয়া আছে। প্রতাপভানু রাজা ও স্বায়ম্ভুব-শতরূপার কাহিনী আছে। প্রতাপভানু ব্রহ্মশাপে রাবণ হইয়া জন্মগ্রহণ করিল। স্বায়ম্ভুব মনু তপস্যার দ্বারা দশরথ হইয়া বিষ্ণুকে পুত্ররূপে লাভ করিলেন।

উত্তরাকাণ্ড সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। রামের রাজ্যাভিষেক, রাম-রাজ্যের মহিমা, ভূসণ্ডী কাকের বিবরণ ও নানা-প্রকার তত্ত্ব-কথায় তুলসীদাসের রামায়ণ সমাপ্ত হইয়াছে। অশ্বমেধযজ্ঞ, লবকুশের যুদ্ধ, শূদ্রকবধ, লবণবধ, লক্ষ্মণ বর্জ্জন, অগস্ত্যের বিবৃত রাবণাদির কাহিনী ইত্যাদি কিছুই নাই। এ সকলের বদলে বহু নৈতিক উপদেশ ও তত্ত্ব-কথা আছে। মাঝে মাঝে শ্রীরামের স্তব আছে। নারদ, সনক, বশিষ্ঠ ইত্যাদি ঋষিগণ শ্রীরামের স্তব করিতেছে। সীতা-বর্জ্জনের কথাই নাই। ছায়া-সীতা গেল লঙ্কাপুরে কায়া

সীতা কেন বঞ্চিত হইবে? সীতা-বর্জ্জনও সীতার অবমাননা। ভক্ত কবি সে কথা লিখিতে পারেন না।

তুলসীদাস বালী বা তারার মুখেও রামচন্দ্রের উদ্দেশে একটি কটু কথাও বসান নাই। তিনি আপন উপাস্য দেবতাকে শত্রুর মারফতেও ভক্তিবিরোধী কথা বলিতে চাহেন না। তুলসীদাসের রামায়ণের কোথাও অশ্লীলতা বা কুরুচি নাই। ইহার সর্ব্বত্রই কেবল রামের গুণগান—কেবল মিত্রের মুখে নয়, শত্রুরও মুখে। ইহা ধর্ম্মগ্রন্থের মত। আবার এক হিসাবে ইহা কাব্যাংশেও চমৎকার। এমন ছন্দোবৈচিত্র্য ও ভাষার পরিপাট্য কৃত্তিবাসে নাই। তবে কৃত্তিবাসে যেরূপ মানব-হৃদয়ের মাধুরী-বৈচিত্র্য আছে, তুলসীদাসে তাহা নাই। কৃত্তিবাস রামচন্দ্রকে অনেক স্থলে মানবরূপেই দেখিয়াছেন—তুলসীদাস সর্ব্বত্রই রামচন্দ্রকে পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ রূপেই চিত্রিত করিয়াছেন।

কৃত্তিবাস অনেক স্থলে সংস্কৃত কাব্য-নাট্যের শ্লোকের অনুবাদ করিয়া ভাষাকে শ্রীমণ্ডিত করিয়াছেন। কৃত্তিবাসের ভাষাকে অনলঙ্কৃত ভাষা বলা যাইতে পারে। তবে সুলভ শ্রেণীর উপমা উৎপ্রেক্ষা মাঝে মাঝে যে নাই তাহা নয়। মেঘ, বিদ্যুৎ, চন্দ্র, গঙ্গাধারা এইগুলিই তাহার উপমার অবলম্বন। স্থলে স্থলে একটু আধটু বৈচিত্র্য আছে। যেমন—সীতা মার দেহখানি দেখিলাম ক্ষীণ। অনলের বিন্দু যথা ক্ষীণ দিন দিন।

বাঙ্গালা রামায়ণের কতকগুলি বিশিষ্ট লক্ষণ আছে। ইহাতে বার বার অদৃষ্টের দোহাই দেওয়া হইয়াছে। যে দুর্ঘটনা ঘটিবে, পূর্ব্বে তাহার প্রাগাভাস-সূচক একটা করিয়া স্বপ্ন সংযোজিত হইয়াছে। যে যাত্রায় কুফল হইবে—সে যাত্রার প্রারম্ভে কতকগুলি দুর্লক্ষণের কথা বলা হইয়াছে। সকল দুর্ঘটনা কাহারও না কাহারও অভিশাপের ফলেই ঘটিতেছে—এইরূপ দেখানো হইতেছে। মূল রামায়ণে এসমস্ত একেবারে নাই তাহা নহে। কৃত্তিবাস এইগুলির সংখ্যা বাড়াইয়াছেন। যেমন তুলসী, ফল্গু ইত্যাদির প্রতি সীতার অভিশাপ, তারার

অভিশাপ ও মন্দোদরীর অভিশাপ মূল রামায়ণে নাই। জ্যোতিষশাস্ত্রের প্রভাব বাঙ্গালা রামায়ণে কিছু বেশি। বাঙ্গালা দেশের অনেক কুসংস্কারের কথাও বাঙ্গালা রামায়ণে ঢুকিয়াছে। যেমন—বাসিবিবাহের দিনে দশরথের পত্নীসম্ভাষণের ফলে সুমিত্রার দুর্ভাগ্য, অবিবাহিতা অবস্থায় কোন বালিকার রজস্বলা হওয়ার জন্য অঙ্গরাজ্যে দ্বাদশ বর্ষ অনাবৃষ্টি ইত্যাদি।

বাঙ্গালা রামায়ণে প্রাকৃতিক আবেষ্টনী বর্জ্জিত হইয়াছে। এই আবেষ্টনীর পট-পরিবর্ত্তনে দেশকালের যে নির্দিষ্ট পরিচয় মূল রামায়ণে দেওয়া আছে—বাঙ্গালা রামায়ণে তাহা পাওয়া যায় না। তাহাতে মনে হয়, সমস্ত ঘটনাই যেন বাঙ্গালা দেশেই ঘটিয়াছে। প্রাকৃতিক পরিবেষ্টনী ও পটভূমিকা যে কবিত্ব সৃষ্টির সহায়তা করে—চরিত্রও চিত্রগুলিকে পরিস্ফুট করিতে সহায়তা করে—বাঙ্গালী কবি তাহা লক্ষ্য করেন নাই। প্রকৃতির সহিত মানব-জীবনের, মানব-চরিত্রের ও মানব-হৃদয়ের যে সুগভীর যোগ মূল রামায়ণে দেখা যায়, বাঙ্গালা রামায়ণে তাহা নাই। ঋতুতে ঋতুতে মানুষের বেদনারও রঙ বদলায়, একথা বাঙ্গালী কবিরা যে বুঝিতেন না তাহা নয়। বুঝিতেন বলিয়াই তাঁহারা বারমাস্যা রচনার রীতি প্রবর্ত্তিত করেন। রামায়ণের বাঙ্গালী কবি সে দিকে দৃষ্টি দিবার অবসর পান নাই। মূল রামায়ণে শীত, বর্ষা ও শরৎ এই তিন ঋতুতে বিরহ-বেদনার কি রূপ-রূপান্তর ঘটে, তাহা নানা বর্ণ-সম্পাতে অতি সরস ভাবেই চিত্রিত হইয়াছে। বাল্মীকির রামায়ণে অরণ্য কাণ্ডের শেষাংশ ও কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ডের অধিকাংশ কাব্যাংশে এই জন্যই চমৎকার।

বাল্মীকির রামচন্দ্র আদর্শমানুষ, পুরুষোত্তম, তিনি যে স্বয়ং ভগবান একথা তাঁহার মনেই থাকিত না। বাল্মীকি নারদকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—

কোঽস্মিন প্রথিতো লোকে সদ্‌গুণৈর্গুণিসত্তমঃ।
ধর্ম্মজ্ঞশ্চ কৃতজ্ঞশ্চ সত্যবাক্যো দৃঢ়ব্রতঃ॥

উদারাচার-সম্পন্নঃ সর্বভূত-হিতে রতঃ।
বীর্য্যবাংশ্চ বদান্যশ্চ কস্যাপি প্রিয়দর্শনঃ॥
জিতক্রোধো মহান্ কশ্চ ধৃতিমান্ কোঽনসূয়কঃ।
সর্ব্বাস্ত রোষাং কস্মাচ্চ দেবতা অপি বিভ্যতি॥
ক উদারঃ সমর্থশ্চ ত্রৈলোক্যস্যাপি রক্ষণে।
কঃ প্রজানুগ্রহরতঃ কো নিধির্গুণসম্পদাম্॥

ইহা আদর্শ মহাপুরুষেরই স্বরূপ বর্ণনা—ভগবানের নয়।

তাহার উত্তরে নারদ রামের নাম করিয়াছিলেন। রাম নিজেও নিজের ভগবত্তা সম্বন্ধে সচেতন নহেন। অগস্ত্য নানা উপাখ্যান বিবৃত করিয়া রামচন্দ্রকে উত্তরাকাণ্ডে বুঝাইয়া দিলেন—তিনি স্বয়ং ভগবান।

কৃত্তিবাসের রামচন্দ্র গোড়া হইতেই ভক্তবৎসল ভগবান। তাঁহাকে একথা মুহুর্মুহুঃ স্মরণ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এমন কি বৈরীও রণক্ষেত্রে সেকথা তাঁহাকে স্তবস্তুতির দ্বারা স্মরণ করাইয়া দিতেছে।

কৃত্তিবাস রামচন্দ্রের চরিত্রের দৃঢ়তা ও রুক্ষতাকে অনেকটা কোমলায়িত করিয়া আনিয়াছেন। বাল্মীকির সীতা তেজস্বিনী ক্ষত্রিয়বালা, কৃত্তিবাসের সীতা চিরভয়াতুরা চিরদুঃখিনী বঙ্গবধূ। রাবণের সম্মুখে বাল্মীকির সীতা দর্পিতা সর্পীর মত গর্জিয়া উঠিলেন। কৃত্তিবাসের সীতা—'কাঁপেন যেন কলার বাগুড়ি।'

কৃত্তিবাস বাল্মীকির রামায়ণের অনুবাদ করেন নাই, বিষয়বস্তুর অক্ষরে অক্ষরে অনুসরণ করেন নাই—উপাখ্যানগুলির মোটামুটি অনুসরণ করিয়াছেন মাত্র, অনেক আখ্যানকে আগে পিছে বসাইয়া লইয়াছেন, কোন আখ্যানকে অতি সংক্ষেপে সারিয়াছেন—কোনটিকে অতি বিস্তরে বিবৃত করিয়াছেন—বাল্মীকির অনেক আখ্যান অংশ বর্জন করিয়াছেন এবং নানা পুরাণ হইতে নূতন নূতন গল্প সংযোজন করিয়াছেন। মাঝে মাঝে অন্যান্য পুরাণের কথা বলিয়া লিখিয়াছেন—

"পুরাণ অনেক মত কে পারে কহিতে। বিস্তারিয়া কহি শুন বাল্মীকির মতে॥"

ফলে, এ গ্রন্থকে নূতন সৃষ্টি বলা যাইতে পারে। তপোবনবাসী বাল্মীকির রামায়ণের বাঙ্গালার চালাঘরে পুনর্জন্ম হইয়াছে। মনে হয়—বাঙ্গালার মাটি চিরিয়া সীতাদেবীর মত এই রামায়ণী কথার জন্ম হইয়াছে। বাল্মীকির তাপসী বেদবতী যেন হলের মুখে মাটি হইতে কৃত্তিবাসের সীতারূপে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছে।

বাঙ্গালার আবহাওয়া, ফলফুল, ঘরদ্বার, বেশভূষা, ভক্ষ্যভোজ্য, আচার অনুষ্ঠান, উৎসব-আমোদ, রীতি-নীতি, নারী-প্রকৃতি সমস্তই ওতপ্রোত ভাবে এই রামায়ণের মধ্যে অনুস্যূত। ফলে ইহা বাঙ্গালারই নিজস্ব সম্পদ।

কৃত্তিবাস বাল্মীকির রামায়ণের দার্শনিক অংশ, তত্ত্বমূলক বাদানুবাদের অংশ, বিচার-বিশ্লেষণের অংশ ও সর্ব্ববিধ আলঙ্কারিকতা বাদ দিয়াছেন। কেবল কাঠামোটিই লইয়াছেন। এই কাঠামো অবলম্বন করিয়া তিনি বাঙ্গালার মাটি দিয়া প্রতিমা গড়িয়াছেন। কৃত্তিবাসের রামায়ণী কথা চিন্ময়ী নয়, শিলাময়ী নয়, ধাতুময়ী নয়, দারুময়ীও নয়, মৃন্ময়ী।

এই রামায়ণের অনেকাংশ শিশুচিত্তরঞ্জনের জন্য লিখিত। কৃত্তিবাসের সময়ে বাঙ্গালী জাতির চিত্তটা অনেকটা শিশুচিত্তের মত সরল, কল্পনা-প্রবণ ও কৌতূহলী ছিল। সে চিত্তের বিশ্বাস করিবার শক্তিও ছিল যেমন অগাধ, যে-কোন সত্যাসত্য প্রাকৃত অপ্রাকৃত কাহিনী হইতে আনন্দ পাইবার শক্তিও ছিল তেমনি অপরিসীম।

তাহাদের কাছে পৃথিবীটা খুব বড় ছিল না। স্বর্গ মর্ত্ত রসাতল সব ছিল যেন একটি দেশেরই অন্তর্গত—ত্রিলোকের মধ্যে যাতায়াতের কাল্পনিক পথটাও বিশেষ দুর্গম ছিল না। দেব নর যক্ষ রক্ষঃ অপ্সর কিন্নর পশুপক্ষী দৈত্য দানব সমস্তই তাহাদের কল্পনয়নে একই গোষ্ঠীর জীব ছিল। এক মহাজাতির মধ্যে যেমন ভিন্ন ভিন্ন জাতি থাকে—ইহাও যেন তেমনি। সুখদুঃখ,

আশা-আকাঙ্ক্ষা, রীতি-নীতি সকলেরই অভিন্ন এবং আত্মপ্রকাশের ভাষা হইতে কেহই বঞ্চিত নয়। দেশ ও কালের দূরত্ব তাহাদের কল্পনাপ্রবণ চিত্তে যেন লোপ পাইয়াছিল। কখনও তাহারা এ দূরত্ব লৌকিক মাপকাঠির সাহায্যে মাপে নাই। তাহাদের কল্পনার মতই যক্ষ, রক্ষ, নর, পশুপাখী—সকলেই ছিল কামচারী ও কামরূপ। কোন আকৃতি কোন আয়তনই তাহাদের কাছে অসম্ভব ছিল না। 'বহু' বুঝাইতে তাহারা যে কোন সংখ্যা ব্যবহার করিতে পারিত। বহুদিন তপস্যা বলিতে তাহারা বুঝিত দশ হাজার বৎসর তপস্যা, বহুদিন রাজত্ব বলিতে বুঝিত ষাট হাজার বৎসর রাজত্ব, বহুক্রোশ বলিতে তাহারা বুঝিত লক্ষ যোজন, বহুলোক বলিতে বুঝিত বিশ কোটি লোক। সূর্য্য চন্দ্র ছিল ঘরের অতিথির মত। অক্ষুণ্ণ যৌবন, অলৌকিক রূপ-বর্ণ, কুবেরের সম্পদ—এসব এত দুর্লভ ছিল না। অসম্ভব হইতে আনন্দলাভে তাহাদের কোন বাধাই ছিল না।

এইরূপ পাঠক পাইয়াছিলেন বলিয়াই কৃত্তিবাস এই ধরণের রামায়ণ লিখিতে পারিয়াছিলেন এবং তাহার রামায়ণ এত লোকবল্লভ হইয়াছিল। এখনও যে আমরা আনন্দ পাই, তাহা শুধু উপাখ্যান-ভাগের জন্য নয়—এ রামায়ণ হাতে করিয়া আমরা আমাদের বিস্মৃতপ্রায় শিশুচিত্তকে আগেই উদ্বোধন করিয়া লই বলিয়া এবং সেই অগাধ বিশ্বাসের স্বপ্নযুগে ফিরিয়া যাইতে পারি বলিয়া।

কৃত্তিবাস রামায়ণের চরিত্রগুলিকে আমাদের কাছে জীবন্ত করিয়া দিয়াছেন। তাহারা দেশকালের দূরত্ব বিলোপ করিয়া আমাদের ঘরের মানুষ হইয়া উঠিয়াছে। কবি চরিত্রগুলির পৌরাণিকতা হরণ করিয়া তাহাদিগকে ঐতিহাসিকতা—ঐতিহাসিকতা কেন প্রত্যক্ষ বাস্তবতা—দান করিয়াছেন। ইহা সম্ভব হইয়াছে—আমাদের নিজেদের চিরন্তন সুখ-দুঃখ চিন্তা-অনুভূতি, বৃত্তি-প্রবৃত্তি কবি তাহাদের মধ্যে সঞ্চারিত করিয়াছেন বলিয়া

এবং আমাদের মুখের বাণীই তাহাদের মুখে বসাইয়াছেন বলিয়া। জীবন্ত মানুষের মুখের বাণীই চরিত্রগুলিকে জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছে।

কেবল তাহাই নয়, তাঁহার দরদী কবিহৃদয়খানি ধর্ম্মপথচারী ব্যথার্ত চরিত্রগুলির সহিত অনুস্যূত হইয়া আছে। ব্যথিতের মুখ দিয়া তাঁহার নিজেরই বেদনা ও চোখ দিয়া নিজেরই অশ্রু ঝরিয়াছে। রাম বালিবধ করিলেন গুপ্তবাণে, ভক্ত কৃত্তিবাস শুধু বালীর জন্য নয়—রামের জন্যও ব্যথা পাইলেন—"কৃত্তিবাস পণ্ডিতের রহিল বিষাদ। ধার্ম্মিক রামের কেন ঘটিল প্রমাদ।" কবির দরদী হৃদয়ের ব্যাকুলতা রামায়ণকে রসসাহিত্য করিয়া তুলিয়াছে।

রাম-ভক্তি প্রচার কৃত্তিবাসের অন্যতম উদ্দেশ্য। এই ভক্তিরস তিনি নিজের জবানীতে ও ভক্তের সাহায্যেও যেমন প্রচার করিয়াছেন, মহাবৈরীর মুখ দিয়াও তেমনি প্রচার করিয়াছেন। রামচন্দ্র যে স্বয়ং ভগবান এ কথা আমাদিগকে এক মুহূর্ত্তও কবি ভুলিতে দেন নাই। তাহার ফলে, রামচন্দ্র-প্রসঙ্গের কোন কথাই আমাদের কাছে অসঙ্গত হইতে পারে নাই। কৃত্তিবাসের রামচন্দ্র ভগবান্, কিন্তু তপস্যাগম্য, ব্রহ্মজ্ঞ-বোধ্য ভগবান্ নহেন। তিনি ভক্তবৎসল মানবধর্ম্মা ভগবান। তাই কবি তাঁহার জীবনে অলৌকিকতার সহিত অতি সাধারণ লৌকিক জীবনের একটা সমন্বয় ঘটাইতে পারিয়াছিলেন। *

---

* রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, রামায়ণের আদি কবি গার্হস্থ্য প্রধান হিন্দুসমাজের যত কিছু ধর্ম্ম রামকে তাহারই অবতার করিয়া দেখাইয়াছিলেন। পুত্ররূপে, ভ্রাতৃরূপে, পতিরূপে, বন্ধুরূপে, ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের রক্ষকরূপে অবশেষে রাজরূপে বাল্মীকির রাম লোকে তাহা প্রমাণ করিয়াছেন। * * আদি কবি যখন রামায়ণ লিখিয়াছিলেন, তখন যদিও রামের চরিত্রে অতি-প্রাকৃত মিশিয়াছিল, তবু তিনি মানুষেরই আদর্শরূপে চিত্রিত হইয়াছিলেন। কিন্তু অতিপ্রাকৃতকে এক জায়গায় স্থান দিলে তাহাকে আর ঠেকাইয়া রাখা যায় না, সে ক্রমেই বাড়িয়াই চলে। এমনি করিয়া রাম ক্রমে দেবতার পদবী অধিকার করিলেন। তখন রামায়ণের মূল সুরটার মধ্যে একটা পরিবর্ত্তন প্রবেশ করিল। কৃত্তিবাসের রামায়ণে তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে।

রাবণ বধ করিবার জন্যই ভগবান অবতীর্ণ, পাছে এ কথা রামের মনে না থাকে, সেজন্য মাঝে মাঝে দেবতাদের ষড়্‌যন্ত্রের উল্লেখ করিতে হইয়াছে। রামের জীবনে দুর্ঘটনা না ঘটিলে রাবণ-বধ হইবে না—দেবতারা দুর্ঘটনা ঘটাইবার জন্য ও তাঁহার শত্রু-সংখ্যা-বৃদ্ধির জন্য ব্যস্ত। ফলে, রামের সকল শত্রুই একটি বিরাট মঙ্গলময়ী পরিকল্পনার অঙ্গস্বরূপ হইয়া পড়িয়াছে।

রামের জন্য ও সীতার জন্য আমরা যত অশ্রুপাতই করি, রামের মহাশত্রুর উপরও আমাদের রাগ করিবার উপায় নাই। কৈকেয়ী বলিতেছেন—"বনে গেলে দেব তার কার্য-সিদ্ধি লাগি। আমারে করিলে কেন নিমিত্তের ভাগী।"

ইহা ছাড়া, বাঙ্গালীর মজ্জাগত অদৃষ্টবাদ আছে। সবই যখন নিয়তির লীলা, স্বয়ং ভগবানও যখন এই নিয়তির হাত হইতে নিস্তার পাইতেছেন না। রাগ করিবে কাহার উপর? অশ্রুপাত ছাড়া আর উপায় কি?

চিরদুঃখী জাতি স্বয়ং ভগবানেরও দারুণ দুঃখ ক্লেশ, অপরাজেয় মহাবীরেরও পতন, স্বয়ং লক্ষ্মীদেবীর ভিখারিণীবেশ, রাজকন্যা, রাজমহিষী, রাজবধূরও দারুণ যাতনা-পীড়ন ইত্যাদির কথা শুনিয়া সান্ত্বনাই পাইয়াছে। এমন কি মহা-মহাতপস্বীরও পদস্খলনের কাহিনী শুনিয়া নির্বেদ হইতে আত্মরক্ষা করিয়াছে—নিজেরা আশ্বস্ত হইয়াছে।

রামকে দেবতা বলিলেই তিনি যে সকল কঠিন কাজ করিয়াছিলেন তাহার দুঃসাধ্যতা চলিয়া যায়। সুতরাং রামের চরিত্রকে মহীয়ান করিবার জন্য সেগুলির বর্ণনা আর যথেষ্ট হয় না। তখন যে ভাবের দিক দিয়া দেখিলে দেবচরিত্র মানুষের কাছে প্রিয় বস্তু হয়, কাব্যে সেই ভাবটাই প্রবল হইল। এই ভাবটি ভক্তবৎসলতা। কৃত্তিবাসের রাম ভক্তবৎসল রাম। তিনি গুহক চণ্ডালকে মিত্র বলিয়া আলিঙ্গন করেন। বনের পশু বানরগণকে তিনি প্রেম দিয়া বশ করেন। ভক্ত হনুমানের জীবনকে ভক্তিতে আর্দ্র করিয়া তাহার জন্ম সার্থক করিয়াছেন। বিভীষণ তাঁহার ভক্ত। রাবণও শত্রুভাবে তাঁহার হাতে বিনাশ পাইয়া উদ্ধার পাইয়া গেল। এ রামায়ণে ভক্তিরই লীলা।

প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে আমরা লক্ষ্য করি—কলহ, গালাগালি, ভোজন-লুব্ধতা, স্বর্ণলোভ ও নারীপীড়ন—এই কয়টি বিশেষ প্রবল। জাতির রুচি-প্রবৃত্তির চাহিদাতেই এইগুলি প্রাবল্য লাভ করিয়াছে বলিলে কি খুব অন্যায় হইবে? কৃত্তিবাসের কাব্যে এইগুলির সম্বন্ধে ব্যত্যয় হয় নাই। যেখানে কলহ ও গালাগালির প্রয়োজন হইয়াছে, কৃত্তিবাস সেখানে খুবই কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। এসকল ক্ষেত্রে তাঁহার রচনা খুবই জোরালো ও জীবন্ত হইয়াছে। ভোজনের চিত্রগুলিও ভোজনলুব্ধ জাতির প্রীতিকরই হইয়াছে। সমগ্র কাব্যে যেরূপ সোনার ছড়াছড়ি—সেরূপ অন্য কাব্যে দেখা যায় না। দরিদ্রজাতি সাহিত্যেই স্বর্ণতৃষ্ণা মিটাইতে চায়। আর নারী-পীড়নের ত কথাই নাই।

আর একটি অঙ্গ অশ্লীলতা। রামায়ণে অশ্লীলতা স্বাভাবিক ভাবে আসিবার কথা নয়। মূল উপাখ্যানাংশে কোথাও অশ্লীলতার অবসর নাই। তুলসীদাসের রামায়ণে একেবারেই অশ্লীলতা নাই। ইহাও বাঙ্গালী পাঠক সাধারণের মনোরঞ্জনের জন্যই প্রবেশ লাভ করিয়াছে বলিয়া মনে হয়। মূল রামায়ণে যে যে অবান্তর উপাখ্যানে অশ্লীলতা নাই বাঙ্গালীকবি সে সে অংশেও অশ্লীলতার সৃষ্টি করিয়াছেন। মূল রামায়ণে যেখানে অশ্লীল অংশ ঐতিহাসিক ঔদাসীন্যের সহিত বিবৃত হইয়াছে, বাঙ্গালী কবি তাহাকে রসালো ও ঘোরালো করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। তাহা ছাড়া, মূল রামায়ণে সংস্কৃত ভাষায় যাহা কুরুচিকর ছিল না তাহা আমাদের গ্রাম্য সহজ সরল ভাষায় কুরুচিকর হইয়া পড়িয়াছে। অলঙ্কৃত ভাষা ব্যবহার না করিয়া সরল ভাষায় লিখিতে গেলে এ বিপদ আছেই।

কবি বাঙ্গালী-চরিত্র বিশেষরূপ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, বাঙ্গালী কি চায় তাহা জানিতেন, তাই তিনি বাঙ্গালীর পক্ষে মুখরোচক অনেক নব নব নিবন্ধ ইহাতে যোগ দিয়াছেন—নানা পুরাণ হইতেও তদুপযোগী উপাদান আহরণ করিয়াছেন এবং আটচালা-ভরা বাঙ্গালী শ্রোতাদের যাহা রোচনীয়

হইবে না তাহা বাদ দিয়াছেন। বাঙ্গালীর মধ্যে শাক্ত ও বৈষ্ণব দুইশ্রেণীর লোক আছে। এমনভাবে গ্রন্থখানি উপন্যস্ত হইয়াছে—যাহাতে কোন সম্প্রদায়ের লোকের অপ্রীতিকর হইবার কথা নয়। রামায়ণ প্রত্যেক বাঙ্গালীরই পাঠ্য হইতে পারিয়াছে—চৈতন্য-ভাগবত তাহা হয় নাই—শিবায়ন তাহা হয় নাই।১

বাঙ্গালায় যদি কোন মহাকাব্য থাকে—তবে তাহা এই কৃত্তিবাসের তথাকথিত রামায়ণ। আমি মহাকাব্য বলিতে গ্রীক বা সংস্কৃত আলঙ্কারিকের সংজ্ঞা অনুসরণ করিতেছি না। ইহাতে একটি মহাদেশের, মহাজাতির, মহাপুরুষের, মহীয়সী মহিলার ও মহাবীরের জীবন-কাহিনী বাণীরূপ লাভ করিয়াছে বলিয়া ইহাকে মহাকাব্য বলিতেছি। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

"মূল আখ্যানকে অবলম্বন করিয়া বাঙ্গালীর হাতে রামায়ণ স্বতন্ত্র মহাকাব্য হইয়া উঠিয়াছে। এই বাংলা মহাকাব্যে কবি বাল্মীকির সময়ের সামাজিক আদর্শ রক্ষিত হয় নাই। ইহার মধ্যে প্রাচীন বাঙ্গালী সমাজই আপনাকে ব্যক্ত করিয়াছে।"

রামায়ণে যত যুদ্ধবিগ্রহই থাকুক, যত ঘটনা-জটিলতাই থাকুক, যত জ্ঞান-ভক্তির কথাই থাকুক, মানুষের সুকুমার বৃত্তিগুলিই ইহাতে প্রাবল্য লাভ করিয়াছে। প্রেম, স্নেহ, মৈত্রী, ভক্তি, দাস্য, শ্রদ্ধা ইত্যাদি হৃদয়বৃত্তিগুলি সমগ্র কাব্যখানিকে পুষ্পিত ও পল্লবিত করিয়া রাখিয়াছে। সমস্ত ঘটনা অসত্য হইতে পারে, এগুলি অসত্য নয়, নিজস্ব চিরন্তনতা ও সার্ব্বজনীনতা এইগুলিকে পরম সত্য করিয়া রাখিয়াছে। কবি বলিয়াছেন, রাবণের চিতা আজিও জ্বলিতেছে। এ চিতার সমিধ কি? দশরথের হাহাকার, সীতার আর্ত্তনাদ, রামের প্রেমোন্মাদ, লক্ষ্মণের নেত্রবহ্নি, ভরতের তপশ্চর্য্যা, সুগ্রীব-বিভীষণের আকিঞ্চন, হনুমানের অন্তর্গূঢ় বেদনা সমস্ত মিলাইয়া এই চিতার সৃষ্টি করিয়াছে।

কৃত্তিবাসের রামায়ণ এ দেশের লোককে শুধু আনন্দ দেয় নাই, ইহা লোকশিক্ষার একটি চমৎকার প্রতিষ্ঠানের কাজ করিয়াছে। বাঙ্গালী জনসাধারণ ইহা হইতে গার্হস্থ্য জীবনের শ্রেষ্ঠ আদর্শগুলি লাভ করিয়াছে এবং সত্যনিষ্ঠতার দীক্ষা লাভ করিয়াছে। কৃত্তিবাস রামায়ণের চরিত্রগুলিকে জীবন্ত সত্যরূপে উপস্থাপিত করিয়াছিলেন বলিয়া ইহা সম্ভব হইয়াছে।

এ রামায়ণ আমাদের দেশের ভাষারও পুষ্টিসাধন করিয়াছে—ভাবপ্রকাশের বহু ব্যঞ্জনাময় সঙ্কেত আমরা এই রামায়ণ হইতে পাইয়াছি—তাই কৃত্তিবাসের রামায়ণ হইতে বহু লক্ষ্যার্থক বাক্যগুচ্ছের সৃষ্টি। কালনেমির লঙ্কাভাগ, রাবণের চিতা, কাঠবিড়ালীর সাগরবন্ধন, ঘরের শত্রু বিভীষণ, বানরের গলে মুক্তার মালা, কুম্ভকর্ণের নিদ্রা, রামে মারিলেও মরিবে, রাবণে মারিলেও মারিবে, দেবর লক্ষ্মণ, ধনুর্ভঙ্গ পণ, মহীরাবণের বেটা অহিরাবণ, রামরাজত্ব, লঙ্কাকাণ্ড, ব্রহ্মাস্ত্র, ধর লক্ষ্মণ ফল ধর, যে যায় লঙ্কায় সেই হয় রাক্ষস, রাবণের স্বর্গের সিঁড়ি বাঁধা, একা রামে রক্ষা নাই সুগ্রীব দোসর, গন্ধমাদন ইত্যাদি বহু লক্ষ্যার্থক পদগুচ্ছ আমাদের ভাষাকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। কৃত্তিবাসের রামায়ণ হইতেই আমাদের দেশে বহু কাব্য, নাটক, কবিতা, গান ইত্যাদির সৃষ্টি হইয়াছে। ইহা যাত্রা, কথকতা, পাঁচালী, ঝুমুর, কবিরগান, তরজা ইত্যাদির মধ্য দিয়া শতধা হইয়া দেশময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

স্বয়ং মাইকেল বাল্মীকি অপেক্ষা কৃত্তিবাসের কাছে অধিকতর ঋণী।

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

"ভাগীরথী ও ব্রহ্মপুত্রের শাখা-প্রশাখা যেমন আমাদের বঙ্গভূমিকে জলে ও শস্যে পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে, ঘরে ঘরে চিরদিন ধরিয়া যেমন আমাদের ক্ষুধার অন্ন ও তৃষ্ণার জল যোগাইয়া আসিয়াছে। কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীরামের মহাভারত তেমনি করিয়া চিরদিন আমাদের মনের

অন্নপানের অক্ষয় ভাণ্ডার হইয়া রহিয়াছে। এই দুইটি গ্রন্থ না থাকিলে আমাদের মানস-প্রকৃতিতে কিরূপ শুষ্কতা ও চিরদুর্ভিক্ষ বিরাজ করিত। যাহা আজ আমাদের কল্পনা করাও কঠিন।"

রবীন্দ্রনাথ অন্যত্র যাহা বলিয়াছেন, তাহার ভাবার্থ এই:—এ দেশে কৃত্তিবাসের সমাদর এবং রামায়ণ-কথার আরো বেশি প্রচার হওয়া উচিত ছিল। এ দেশে বহু কৃত্তিবাসের জন্ম হইলে এবং রামায়ণী কথা আমাদের দেশের সাহিত্যকে আরো বেশি প্রভাবান্বিত করিলে ভাল হইত। সাহিত্যে রামসীতার আদর্শ যদি রাধাকৃষ্ণ ও হরগৌরীর আদর্শকে ছাড়াইয়া উঠিত, তাহা হইলে দেশের সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণই হইত।—

"আমাদের দেশে রাধাকৃষ্ণের কথায় সৌন্দর্য্যবৃত্তি ও হরগৌরীর কথায় হৃদয়-বৃত্তির চর্চ্চা হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে ধর্মপ্রবৃত্তির অবতারণা হয় নাই। তাহাতে বীরত্ব, মহত্ত্ব, অবিচলিত ভক্তি ও কঠোর ত্যাগ-স্বীকারের আদর্শ নাই। রামসীতার দাম্পত্যপ্রেম আমাদের দেশ-প্রচলিত হরগৌরীর দাম্পত্যপ্রেম অপেক্ষা বহু গুণে শ্রেষ্ঠ, উন্নত ও বিশুদ্ধ, তাহা যেমন কঠোর গম্ভীর, তেমনি স্নিগ্ধকোমল। রামায়ণ-কথায় একদিকে কর্ত্তব্যের দুরূহ কাঠিন্য, অপর দিকে ভাবের অপরিসীম মাধুর্য্য একত্র সম্মিলিত। তাহাতে দাম্পত্য, সৌভ্রাত্র, পিতৃভক্তি, প্রভুভক্তি, প্রজাবাৎসল্য প্রভৃতি মনুষ্যের যত প্রকার উচ্চ অঙ্গের হৃদয়-বন্ধন আছে, তাহার শ্রেষ্ঠ আদর্শ পরিস্ফুট হইয়াছে। তাহাতে সর্ব্বপ্রকারের হৃদয়বৃত্তিকে মহৎ ধর্ম্ম-নিয়মের দ্বারা পদে পদে সংযত করিবার কঠোর শাসন প্রচলিত। সর্ব্বতো-ভাবে মানুষকে মানুষ করিবার উপযোগী শিক্ষা আর কোন দেশে আর কোন সাহিত্যের নাই। বাংলা দেশের মাটিতে সেই রামায়ণ-কথা হরগৌরী ও রাধাকৃষ্ণের কথার উপরে যে মাথা তুলিয়া উঠিতে পারে নাই, তাহা আমাদের দেশের দুর্ভাগ্য। রামকে যাহারা যুদ্ধক্ষেত্রে ও

কর্ম্মক্ষেত্রে নরদেবতার আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে তাহাদের পৌরুষ, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও ধর্ম্মপরতার আদর্শ আমাদের অপেক্ষা উচ্চতর।"

কৃত্তিবাসের পয়ারের কি রূপ ছিল দেখাইতে হইলে পুঁথির পাঠ হইতেই দেখাইতে হয়। ঢাকাই সংস্করণ হইতে কয়েক পংক্তি তুলি—

৮+৬—এ-তে-ক ব-লি-য়া রা-জা। গে-ল অ-ন্তঃ-পু-রী।
হে-ন-কা-লে ধাই-য়া আই-ল। সু-মি-ত্রা-সু-ন্দ-রী॥
উ-ভা-ল-ড়ে আই-ল দে-বীর। ব-হে ঘ-ন শ্বা-স।
কি-বা দ্র-ব্য খাই-তে রা-জা। ক-রে-ন আ-শ্বাস
স্বা-মীর অ-প্রি-য় না-রীর স্ত্রী-। ব-নে নাই-ক কা-জ।
সু-মি-ত্রা-র বা-ক্যে দুই-না-। বী-এ পাই-ল লা-জ।

লক্ষ্য করিতে হইবে—অধিকাংশ স্থলে এক একটি পদাংশ (Syllable)কে মাত্রা ধর হইয়াছে। আই, উই ইত্যাদিকে ঐ, ঔয়ের মত এক একটি দীর্ঘস্বর (Dipthong) বর্ণ ধরা হইয়াছে। কোন কোন স্থলে আই-কে দুই মাত্রাও ধরা হইয়াছে। যেমন নিম্নলিখিত পংক্তির 'ভাই'।

যা-ইট্-হা জার্ ভা-ই ভ-য়। হ-এ্যা-ছে যে ধা-নে।

মীর্, বীর্, ইত্যাদিকে একমাত্রা ধরা হইয়াছে। এই প্রথা প্রাচীন পয়ারে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অনুসৃত হইয়াছিল। পয়ারের এই পদ্ধতি হইতেই পদাংশমাত্রিক পয়ার বা ছড়ার ছন্দের সৃষ্টি হইয়াছে। আরও প্রকৃষ্ট উদাহরণ সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত উত্তরাকাণ্ড হইতে লওয়া যাইতে পারে।

দুই বা-লক্ গীত্ গা-য়ে-ন। অ-মৃ-তে-র ক-ণা।
স-প্ত-স্ব-রে গী-ত গা-য়ে। বা-জে ম-ধু-বী-ণা।
দ-শ-র-থের ম-রণ গা-য়ে। রা-মের্ ব-ন-বা-স
গী-ত শু-নি লো-ক স-ব। ছা-ড়-য়ে নি-শ্বা-স॥

এখানে দুই, লক, গীত, খের, রণ, যের—এইগুলিকে পদাংশ (Syllable) ধরিয়া একমাত্রায় ধরা হইয়াছে—অবশ্য সব ক্ষেত্রে এ নিয়ম রক্ষা হয় নাই। যেখানে সে নিয়ম রক্ষা হয় নাই—সেখানে হসন্ত বর্ণকে স্বরান্ত করিয়া পড়া হইত—যেমন—অমৃতেরো কথা, গীতো শুনি লোকো সবো ছাড়য়ে নিশ্বাস—এইরূপ আবৃত্তি করা হইত।

এইবার কৃত্তিবাস যাহাকে লাচাড়ি বলিয়াছেন—সে ছন্দের একটু পরিচয় দিই—

বাছা। আর না আহিহ্ তপো। বনে।
জানিআ শুনিআ মুনি। গানে দিলেন মেলানি। ঘরে বসি থাক দুই। জনে।
পূর্ব্বে বিষ্ণু আরাধিআ। পৃথিবীতে জনমিআ। বাড়িলাঙ জনকের। ঘরে।
পিতা বড় নিদারুণ। বিষম করিল পণ। হরধনু ভাঙ্গিবার। তরে।

ইহা সম্পূর্ণাঙ্গ দীর্ঘ ত্রিপদী। আর একপ্রকার লাচাড়ি পুঁথির পাঠে দৃষ্ট হয়—তাহা ৮ মাত্রার পর্ব্ব ও ৭ মাত্রার পর্ব্বের মিশ্রণ।

এহেন পুরীকে আর। কবে বা আসিব আর। শূন্য হইল পুরী। খান
নৃপতি দশরথ। মদনে উন্মত্ত। কেকয়ে দিলেন বর। দান।

ইহা দুই ছন্দের মিশ্রণ। ইহাকে দীর্ঘ ত্রিপদীতে আনিতে লিখিতে হয়—

এ হেন পুরীকে আর। কবে বা আসিব আর। শূন্য হৈল এই পুরী। খান।
নরপতি দশরথ। মদনে উন্মত্ত চিত। কেকয়ে দিলেন বর। দান।

ইহাকে ৭ মাত্রার চর্চ্চরী ছন্দেতে পরিণত করিলে লিখিতে হয়।

এ হেন পুরী আর। আসিব কবে আর। শূন্য হ'ল পুরী। খান
নৃপতি দশরথ। মদনে উন্মত্ত। কেকয়ে দিল বর। দান।

প্রচলিত রামায়ণে লঘু ত্রিপদী, দীর্ঘত্রিপদী, পয়ার ইত্যাদি নির্দ্দোষ। জয়গোপাল পণ্ডিত ইহার মধ্যে মাল ঝাঁপ ছন্দও ঢুকাইয়াছেন। গুণপাত্র। বায়ুপুত্র। সিন্ধু তরিবারে। করি লীলা। বাড়াইলা। আপন কায়ারে।

কৃত্তিবাসের রামায়ণ বাঙ্গালী জাতির জীবন-গঠনে কি সহায়তা করিয়াছে তাহা কবিতায় বলিয়া নিবন্ধের উপসংহার করি—

বাংলার বাল্মীকি কবি দেবীর আদেশ লভি' শুভক্ষণে কবে নাহি জানি।
সীতার নয়ন-জলে বসিয়া অশোকতলে লিখেছিলে রামায়ণ খানি।
তালপত্রে সেই লেখা সেত অশ্রুজল-রেখা, অনল অক্ষরে আজ জ্বলে,
বাঙ্গালার ঘরে ঘরে তার তাপে সুধা ক্ষরে, পাষাণ-হৃদয়ও তায় গলে।
জানকীর আঁখিনীর গৃহে গৃহে গৃহিণীর ক্ষণে ক্ষণে ভিজায় বসন,
তাঁদের পায়ের কাছে নত শিরে আজ্ঞা যাচে শত শত দেবর লক্ষ্মণ।
কাঙালের তুচ্ছ পুঁজি তাই নিয়ে যোঝাযুঝি ভায়ে ভায়ে, তা'ত তুচ্ছ নয়,
হে কবি, তোমার গান গলায় তাদের প্রাণ, আঁখিজল দ্বন্দ্ব করে জয়।
শাশুড়ী তোমার গানে বধূরেও বক্ষে টানে ভুলে যায় অবলা-পীড়ন,
স্মরিয়া সীতার কথা ভুলে যায় সব ব্যথা গৃহে গৃহে অভাগিনীগণ।
কি মহিমা রচনার উদয়ন কথা আর কহেনাক গ্রাম-বৃদ্ধদল,
তাহাদের চারি পাশে যুবা শিশু কেন আসে? তব বাণী তাদের সম্বল।
পশারী পশারা শিরে থমকি দাঁড়ায় ফিরে শুনে যদি রামায়ণ-পাঠ,
গুহকের ভাগ্য স্মরে দুইচোখে ধারা ঝরে ভুলে যায় বেচা-কেনা-হাট।
বঞ্চক "মুরারি, শীল' ছাড়ে না যে একতিল ফাঁকি দিতে তারও হাত কাঁপে,
পাপ করি দিন কাটে সাঁঝে রামায়ণ-পাঠে রাতে শুয়ে মরে অনুতাপে।
শিখাইলে কী যে সত্য গ্রামে গ্রামে 'ভাঁড়ু দত্ত' মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে ভুলে যায়,
কৃপণ তোমার গানে ভিক্ষুকে ডাকিয়া আনে যক্ষদেরও হৃদয় গলায়।
দিনে হাটে হট্টগোল কাড়াকাড়ি ডামাডোল সন্ধ্যায় সকলি চুপচাপ।
লঙ্কাকাণ্ড শেষ করি উত্তরাকাণ্ডটি পড়ি দোকানী দোকানে দেয় ঝাঁপ।
বৈকালে বটের ছায় সুর করি নিতি গায় দা-ঠাকুর কাহিনী সীতার,
কৃষকেরা দলে দলে ভাসিয়া নয়ন-জলে একই কথা শুনে বারবার।

তব বাণী মধুচ্ছন্দা নন্দিত করেছে সন্ধ্যা, স্নিগ্ধ শান্ত,—গ্রীষ্মের দিবস,
জরাজীর্ণ গ্রন্থখানি কি সুধা তাতে না জানি শুষ্ক দৈন্যে করেছে সরস।
মোদকের খইচুড়, তব গীতি সুমধুর আরো যেন মিঠা ক'রে তুলে।
তব গ্রন্থখানি ছাড়ি উঠে যায় বারবারই দাম নিতে মুদী যায় ভুলে।
জমিদার ঘরে ঘরে প্রজা-নির্যাতন করে তব পুঁথি পড়ে মাত্রা তার,
প্রজারঞ্জনের সুর লাগে তার সুমধুর গ'লে যায় তায় কর-ভার।
অসংযত রসনায় যে ভ্রম করিল হায় অযোধ্যার নির্ব্বোধ প্রজারা,
আজি বঙ্গ ঘরে ঘরে তারি প্রায়শ্চিত্ত করে, চক্ষে ঝরে সরযূর ধারা।
আর কারে নাহি জানি মানি শুধু তব বাণী, শুনিয়াছি বাল্মীকির নাম,
তব চিত্তভূমে কবি নূতন জনম লভি অবতীর্ণ বঙ্গে পুন রাম।
এ রাম মোদেরি মত যুঝেছে, কেঁদেছে কত অদৃষ্টেরে দিয়াছে ধিক্কার,
এ রাম মোদেরি মত করিয়াছে ভক্তিনত নীলপদ্মে পূজা অধিকার।
এ রামে আপন জানি বক্ষে লইয়াছি টানি, দুঃখে তাঁর হয়েছি অধীর,
লক্ষ্মণের সাথে সাথে অবিরল অশ্রুপাতে পম্পাহ্রদে বাড়ায়েছি নীর।
তুমি রস-গঙ্গা হ'তে আনিলে নূতন স্রোতে আগে আগে দেখাইয়া পথ,
নব রস-ভাগীরথী; উদ্বেল তাহার গতি তুমি তার নব ভগীরথ।
সে প্রবাহ অনাবিল ভাসাইল খাল বিল, একাকার গোষ্পদ-পল্বল,
সে ধারার দুই কূলে লতা তৃণে শস্য ফুলে ফলিতেছে সোনার ফসল।
বধূরা গাগরী ভরে নিয়ে যায় ঘরে ঘরে, তৃষা তৃপ্ত করে সেই বারি,
করি তায় নিত্য স্নান জুড়ায় তাপিত প্রাণ 'জয় রাম' গায় নরনারী।
সেই রস-ধারা বাহি' জয় সীতারাম গাহি' ভেসে যায় কত মধুকর।
লঙ্কায় বাণিজ্য তরে যুগে যুগে যাত্রা করে ধনপতি চাঁদ সদাগর,
শত শাখা প্রশাখায় সে ধারা বহিয়া যায় বিপ্লাবিত অশ্রুর তুফানে,
'এহো বাহ্য' নহে শেষ, চ'লে যায় নিরুদ্দেশ শেষ ধারা অনন্তের পানে।

বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন

বিশেষজ্ঞদের মতে বড়ু চণ্ডীদাসের আবির্ভাব কাল পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে। ইনি বাসলী (বাগীশ্বরী—বাইসরী—বাইসলী—বাসলী) দেবীর পূজারী ছিলেন। বীরভূম জেলায় নান্নুর নামক গ্রামে বাসলী দেবীর মন্দির ও মূর্ত্তি এখনও বিরাজিত। এই গ্রাম চণ্ডীদাসের বাসস্থান ছিল—ইহাই প্রচলিত মত এবং আমাদেরও মত। ইদানীং সন্ধান পাওয়া গিয়াছে বাঁকুড়া জেলার ছাতনা গ্রামেও বাসলীর মূর্ত্তি ও মন্দির আছে —ছাতনার নিকটে নান্নুর হাট বা মাঠ বলিয়া একটি স্থানও আছে। চণ্ডীদাস এইখানেই আবির্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়া কাহারও কাহারও বিশ্বাস। বিশেষতঃ বিষ্ণুপুরের নিকটবর্ত্তী কাঁকিল্যা গ্রামে বড়ু চণ্ডীদাসের রচিত আদ্যন্ত-খণ্ডিত এক পুঁথি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা বঙ্গসাহিত্য-সমুদ্রে প্রায় আমেরিকা আবিষ্কারের মত। ইহার কলম্বস—শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ। বাঁকুড়ায় এই পুঁথির আবিষ্কারে বাঁকুড়ার দাবি বাড়িয়া গিয়াছে। এই পুঁথি বিদ্বদ্বল্লভ কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়া বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ হইতে শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তন নামে প্রকাশিত হইয়াছে। সেই গ্রন্থের কথাই এই প্রবন্ধে আলোচ্য।

বীরভূম ও বাঁকুড়া জেলার ভাষায় বেশি তফাৎ নাই। গ্রন্থের ক্রিয়াপদ-গুলিতে চন্দ্রবিন্দুর আধিক্য বীরভূমের দাবীই সমর্থন করে।

---

* শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনের পূর্ব্বে বঙ্গ-সাহিত্যে আমরা পাই বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য্যগণের চর্য্যাপদ,—কৃত্তিবাসের রামায়ণ, মালাধর বসু গুণরাজ খাঁর শ্রীকৃষ্ণ বিজয়, গোবিন্দ বিজয় বা গোবিন্দ মঙ্গল, (শ্রীমদ্ ভাগবতের দশম ও একাদশ স্কন্ধের ভাবানুবাদ, রচনা কাল ১৪৭৩—১৪৮০ খৃঃ অঃ) কানা হরি দত্ত, বিজয় গুপ্ত ও বিপ্রদাস পিপিলাইএর মনসামঙ্গল। কৃত্তিবাসের রামায়ণ ছাড়া—এই গুলির সাহিত্যিক মূল্য অতি সামান্য।

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের ভাষা প্রাচীন—চণ্ডীদাসের পদাবলীর ভাষার সহিত তাহার মিল নাই। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের মধ্যে এমন সকল শব্দ আছে যেগুলি এখনও বঙ্গদেশ এমন কি উড়িষ্যা আসামের কোন-না-কোন স্থলে পরিচিত—কোন একটি বিশিষ্ট স্থলের ভাষার সহিত উহার সম্পূর্ণ মিল নাই। তবে অধিকাংশ শব্দ রাঢ়দেশে সুপরিচিত। সম্ভবতঃ চণ্ডীদাসের সময়ে রাঢ়দেশে ঐরূপ ভাষাই প্রচলিত ছিল। চণ্ডীদাসের পদাবলীর ভাষা যেমন কীর্ত্তনীয়াদের মুখে মুখে ক্রমে পরিবর্ত্তিত হইয়া বর্ত্তমান যুগের উপযোগী হইয়াছে—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের ভাষা তাহা হয় নাই। তাহার কারণ, ঐ গ্রন্থ এদেশে প্রচলিত ছিল না—কোথাও গাওয়া হইত না। সম্ভবতঃ পুস্তকখানি অশ্লীল, রসাভাসে দুষ্ট ও শ্রীচৈতন্য-প্রবর্ত্তিত রাধাকৃষ্ণের লীলা-মাধুর্য্যের বিরুদ্ধ বলিয়া শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পর উহা আর চলে নাই। অথবা চণ্ডীদাস পরবর্ত্তী জীবনে লীলা-মাধুর্য্যের উচ্চতর রসের আস্বাদ পাইয়া নিজেই উহার প্রচার করেন নাই। সেজন্য ঐ গ্রন্থের ভাষার কোন পরিবর্ত্তন নাই।

চণ্ডীদাসের সময় ধামালী নামে একপ্রকার অশ্লীল গান বঙ্গদেশে প্রচলিত ছিল—কেহ কেহ অনুমান করেন শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন সেই ধামালীরই সাহিত্যরূপ। বৌদ্ধ সহজিয়াদের প্রভাবে সেকালে নৈতিক আদর্শ ও রসের রুচি অত্যন্ত হীন হইয়াছিল—চণ্ডীদাস যুগধর্ম্মের প্রভাব এড়াইতে পারেন নাই—ইহাও কাহারও কাহারও মত। চণ্ডীদাসের পূর্ব্ববর্ত্তী বৈষ্ণব কবি জয়দেবের রুচিও বর্ত্তমান যুগের আদর্শ অনুসারে মার্জিত ও শোভন ছিল না।

শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনের পালা কয়েকটি খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম জন্মখণ্ড। ইহাতে বলা হইয়াছে শ্রীকৃষ্ণ কংসাদি অত্যাচারী দানবগণের দলন করিবার জন্য ও ভূভার হরণের জন্য অবতীর্ণ। দেবগণের অনুরোধে লক্ষ্মী গোকুলে সাগর ও পদ্মার কন্যা লইয়া জন্মিলেন। বৈষ্ণবরা যে বলেন— শ্রীকৃষ্ণ আপনারই হ্লাদিনী রস উপভোগের জন্য নরমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন কৃষ্ণকীর্ত্তনে সে কথা নাই।

দ্বিতীয় খণ্ডের নাম তাম্বূলখণ্ড। এই খণ্ডে শ্রীকৃষ্ণ রাধার অসামান্য রূপলাবণ্যের কথা

পুস্তকের রুচি যতই জঘন্য হউক—ইহাতে কবিত্বের অভাব নাই। সামসময়িক বিদ্যাপতির রুচিও প্রায় এমনি, তবু বিদ্যাপতির কবিত্বের তুলনা নাই। কৃষ্ণকীর্ত্তনের অধিকাংশ বিদ্যাপতির পদাবলীর সহিত তুলনায় কবিত্বে অপকৃষ্ট হইলেও, রাধাবিরহ অংশ উৎকৃষ্টতর বলিয়া আমরা মনে করি। রাধাবিরহে রাধার অন্তর হইতে যে আকুল বেদনা উচ্ছ্বসিত হইয়াছে তাহা দ্বিজ চণ্ডীদাসের পদাবলীর পূর্ব্বাভাস। বাকী অংশের সহিত পদাবলীর সামঞ্জস্য সাধন করা যায় না। যে চণ্ডীদাস পদাবলী রচনা করিয়াছেন তিনিই দানখণ্ড, নৌকাখণ্ড লিখিয়াছেন—ভাবিতেও কষ্ট হয়; কিন্তু রাধাবিরহ অংশের সহিত পদাবলীর কোন অসামঞ্জস্য নাই। এমনকি একথা মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয় যে কবি 'রাধাবিরহ' রচনা করিতে গিয়া যে রসের আস্বাদ পাইলেন, সেই রসকেই তিনি

ভুলিয়া রাধার সহিত মিলিত হইতে চাহিতেছেন। রাধার মায়ের পিসী বড়াই বুড়ীর মারফতে শ্রীকৃষ্ণ তাম্বূল পাঠাইয়া নিজের কামাভিপ্রায় জানাইতেছেন। যে ভাবে বৈষ্ণব পদাবলীতে পূর্ব্বরাগের সঞ্চার দেখানোর প্রথা এখানে সে ভাবে দেখানো হইতেছে না। রাধার পূর্ব্বরাগ ইহাতে একেবারেই নাই। সুবল, শ্রীদাম বা কোন সখী এখানে দৌত্য করিতেছে না। একটি জরতী আসিয়া এখানে দৌত্য করিতেছে। কিশোর কিশোরীর প্রণয়-লীলার মধ্যে একটি শ্বেতচামর কেশা, কোটরগত-নয়না বিকটদন্তা জরতীর সমাগম একেবারে রসাভাসের সৃষ্টি করিতেছে। ইহাতে কাব্য গ্রাম্যতা দোষে দুষ্ট হইয়াছে।

তৃতীয় খণ্ডের নাম দানখণ্ড। রাধা দুধদই বিক্রয় করিতে মথুরায় চলিয়াছেন বড়ায়ি তাঁহার অভিভাবিকা। শ্রীকৃষ্ণ দানী সাজিয়া পথে রাধাকে আক্রমণ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে রাধারূপের গুণগান করিলেন, সাধ্যসাধন করিলেন কিছুতেই রাধা স্বীকৃতা নন। রাধা বলেন—'আমি তোমার মাতুলানী।' শ্রীকৃষ্ণ বলেন—'তুমি কিসের মাতুলানী? তুমি শালী। আমি যশোদা-নন্দের বেটা নই, আমি বসুদেব দৈবকীর বেটা।' রাধা কত ভয় দেখাইলেন—ধর্ম্মের দোহাই দিলেন। শ্রীকৃষ্ণ পুরাণ হইতে নানা ব্যভিচারের নজির তুলিতে লাগিলেন। শেষে বল প্রয়োগ। রাধা বিপন্ন হইয়া আক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

নৌকাখণ্ডে শ্রীকৃষ্ণ কাণ্ডারী সাজিয়া মথুরা যাত্রিণী গোপীগণকে পার করিয়া দিলেন।

শেষ বয়সে পদাবলীতে আরও উচ্চগ্রামে তুলিলেন এবং পদাবলী রচনা করিয়া তিনি কৃষ্ণকীর্ত্তনকে আর প্রাধান্য দেন নাই। কৃষ্ণকীর্ত্তনের কোন কোন পদকে তিনি নিজেই প্রচার করিয়াছিলেন অথবা অন্যের দ্বারা তাহা প্রচারিত হইয়াছিল। সেই পদগুলিই কৃষ্ণকীর্ত্তনের চণ্ডীদাসের সহিত পদাবলীর চণ্ডীদাসের মিলন-সূত্র। তাহাদের মধ্যে একটি বিখ্যাত পদ

দেখিলোঁ প্রথম নিশী সপন সুন তোঁ বসী
সব কথা কহি অঁগো তোক্ষারে হে।
বসিআঁ কদমতলে সে কৃষ্ণ করিলোঁ কোলে
চুম্বিল বদন আক্ষারে হে। ইত্যাদি

রাধিকাকে একেলা পার হইতে হইল। শ্রীকৃষ্ণ নৌকা ডুবাইয়া রাধার প্রতি যমুনা জলে অত্যাচার করিলেন। রাধার কাকুতি মিনতিতে পাষাণও গলে, শ্রীকৃষ্ণের হৃদয় গলিল না।

ভারখণ্ডে ভারবাহী হইয়া মথুরার পথে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার পসারা বহিতেছেন। এবং ছত্রখণ্ডে রাধার মস্তকে শ্রীকৃষ্ণ ছত্র ধরিতেছেন। এই দুই খণ্ডে শ্রীকৃষ্ণের এই যে দাক্ষিণ্য তাহাও রাধার মিলন-সুখ লাভের আশায়। "রাধা সঙ্গে জাএ বাটে বাটে। রতি আশেঁ না ছাড়এ পাশে।"

বৃন্দাবনখণ্ডে শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণ সঙ্গে বনবিলাস ও রাসলীলা করিতেছেন। এই খণ্ডে কবি ভাগবত ও গীতগোবিন্দ হইতে কতক কতক অংশ গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণের সঙ্গে রাসলীলা করিবার জন্য বৃন্দাবন নামে রমণীয় উদ্যান রচনা করিলেন। বড়াই রাধাকে এখানে ভুল দিয়া লইয়া আসিল। শ্রীকৃষ্ণ এখানে গোপীদের সঙ্গে রাসলীলা করিলেন। তারপর রাধার সহিত মিলিত হইতে আসিলে রাধা শ্রীকৃষ্ণকে প্রত্যাখ্যান করিয়া মানিনী হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ জয়দেবের বিখ্যাত মানভঞ্জনের পদটিকে বাঙ্গালায় তর্জ্জমা করিয়া রাধাকে শুনাইলেন। তাহাতেও রাধা অবিচলিত। তখন গোবিন্দ গোঁয়ার গোবিন্দের মত রাধাকে ফুলফল ছেঁড়ার অছিলায় তিরস্কার করিতে লাগিলেন,—এমন কি বলিলেন—

যবেঁ তিরী বধে নাহিঁ থাকে ডর। তবে আজি মারিআঁ পাঠাওঁ যমঘর।

যমুনাখণ্ডের মধ্যে কালিয় দমন। কালিয় নাগকে দমন করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ কালীদহে

কেবল তাহাই নয় কৃষ্ণকীর্ত্তনের অনেক পংক্তির ভাব ও ভাষা পদাবলীর মধ্যে আমরা পাইয়া থাকি। এই গুলিকেও দুই চণ্ডীদাসের যোগসূত্র বলা যাইতে পারে। পদাবলীর ভাষাকে যদি কৃষ্ণকীর্ত্তনের ভাষায় রূপান্তরিত করা যায়—তাহা হইলে রাধা-বিরহের পদের সহিত খুব বেশি তফাৎ হয় বলিয়া মনে হয় না।

রাধাবিরহ ছাড়া কৃষ্ণকীর্ত্তনের অন্যান্য খণ্ডেও কবিত্ব আছে। বৃন্দাবন খণ্ডে মানের দৃশ্য ও মানভঞ্জন কবিত্বময়। অবশ্য ইহাতে জয়দেবের প্রভাব-সম্পাত হইয়াছে—বংশীখণ্ডের পদগুলিতেও কবিত্বের অভাব নাই। অন্যান্য খণ্ডগুলিতে কবিত্ব ওতপ্রোত ভাবে অনুস্যূত হইয়া আছে—এমন বহু

ঝাঁপ দিলেন। এই খণ্ডে এই দুঃসাহসিক ব্যাপারে রাধা ভয় পাইয়া শ্রীকৃষ্ণের মৃত্যু নিশ্চয় জানিয়া শোক করিতে লাগিলেন। ইহাই রাধার পক্ষ হইতে প্রথম অনুরাগ প্রকাশ। এই খণ্ডে শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণের সঙ্গে যমুনায় জলবিহার করিলেন এবং তাহাদের বস্ত্র হরণ করিলেন; রাধার হার হরণ করিয়া ফেরৎ দিলেন না।

হার খণ্ডে শ্রীরাধা যশোদার কাছে হার হরণের জন্য অভিযোগ করিতেছেন—বাণ খণ্ডে শ্রীকৃষ্ণ বড়াইএর উপদেশে রাধাকে মদন বাণে মুর্চ্ছান্বিত করিতেছেন। ইহার পর হইতে রাধা কৃষ্ণের জন্য আকুল হইলেন। বংশীখণ্ডে বাঁশের ধ্বনি শুনিয়া রাধার আকুলতা। বড়াই কিন্তু আর রাধাকে আমল দেয় না। নিশীথে রাধার বার্থ অভিসার। যে বাঁশী এমন করিয়া হৃদয় দহন করে তাহা চুরি না করিলে আর চলে না। রাধা কৃষ্ণের বাঁশী হরণ করিলেন।

শেষ খণ্ড রাধা-বিরহ। শ্রীকৃষ্ণের অদর্শনে রাধার দারুণ অস্থিরতা। রাধিকা এখন কৃষ্ণগত-প্রাণা। শ্রীকৃষ্ণ এখন বলেন—'রাধে, তুমি আমার প্রেরিত ফুল তাম্বুল প্রত্যাখ্যান করেছিলে—আমাকে অনেক কষ্ট দিয়েছ আমাকে দিয়ে ভার বইয়েছ। আমি তোমাকে আর চাই না। তুমি মাতুলানী, পরদারা, তোমার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই?' রাধা ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের সাময়িক করুণা হইল। শ্রীকৃষ্ণের উরুতে মাথা রাখিয়া রাধা ঘুমাইয়া পড়িলেন। শ্রীকৃষ্ণ সেই অবসরে আস্তে আস্তে মথুরা পলায়ন করিলেন। তারপর রাধা জাগিয়া উঠিয়া হাহাকার করিতে লাগিলেন। এই হাহাকারেই গ্রন্থের শেষ।

পদাংশের উৎকলন করা যাইতে পারে যাহা রীতিমত সরস। গ্রাম্য রুক্ষতা ও অমার্জিত ভাষার অন্তরালে একটা রসের ফল্গুধারা বহিতেছে। বহু পংক্তি এমন আছে—যেগুলি পল্লবপুঞ্জে পুষ্পের মতই রমণীয়।

কৃষ্ণকীর্তনের রাস, কালিয়দমন ও গোপীদের বস্ত্রহরণের কাহিনী ভাগবত হইতে গৃহীত। দানখণ্ড, নৌকাখণ্ড ইত্যাদি কোন না কোন পুরাণে আছে—এবং সম্ভবতঃ কৃষ্ণ-ধামালিগানে দেশে প্রচলিত ছিল। বৃন্দাবন খণ্ডের কতক অংশ জয়দেব হইতে গৃহীত। রাধাকৃষ্ণের রস-কলহের মধ্যে বহু পৌরাণিক কথা আসিয়া পড়িয়াছে।

এই গ্রন্থের মূলকথা—দ্বাদশবর্ষবয়স্কা "তীনভুবনজনমোহিনী শিরীষ-কুসুমকোঁঅলী অদভূত কনকপুতলী" রাধাচন্দ্রাবলীর রূপের কথা বড়ায়ির মুখে শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাহার সহিত মিলিত হইতে চাহিলেন। তিনি বড়ায়ির মারফতে তাম্বূল পাঠাইয়া আপনার অভিপ্রায় জানাইলেন। বড়ায়ি কৃষ্ণের হাতে রাধাকে সমর্পণ করিতে সম্মত হইল। রাধার মনে এখনও কন্দর্পভাব জাগে নাই—তাহা ছাড়া সে আইহনের পত্নী, তাহার সতী-ধর্মের একটা সংস্কার জন্মিয়াছে—রাধা এ প্রস্তাব স্বভাবতই প্রত্যাখ্যান করিল। মথুরার হাটে দধিদুগ্ধবিক্রয়ের জন্য গোপবধূরা পশারা সাজাইয়া যাতায়াত করে, রাধাকেও যাইতে হইল—বড়ায়ি রাধার অভিভাবিকা হইয়া চলিল। শ্রীকৃষ্ণ যে পথে অপেক্ষা করিতেছেন, বড়ায়ি সেই পথ দিয়া রাধাকে লইয়া গিয়া শ্রীকৃষ্ণের হাতে সমর্পণ করিল। শ্রীকৃষ্ণ দানী, কাণ্ডারী ইত্যাদি সাজিয়া রাধাকে পীড়ন করিয়া তাহার প্রেম আদায়ের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। রাধা কিছুতেই বশ মানিবে না—সে গ্রাম্য বালিকার মত গালাগালি দিতে লাগিল, ধর্মের দোহাই দিল—সম্বন্ধ-বিরোধ বুঝাইল—রাজা কংসের কাছে নালিশ করিবে বলিয়া শাসাইল, শেষে বহু কাকুতিমিনতি করিল। শ্রীকৃষ্ণ তাহার প্রত্যেক কথার জবাব দিতে লাগিলেন, প্রহারের ভয় দেখাইলেন,

তিনি নিজে যে স্বয়ং [illegible] -কংসবধের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছেন—তিনি যে ভূভার-হরণের জন্য বারবার নানারূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন—তিনি যে রাখাল মাত্র নন—তিনি যে নন্দযশোদার সন্তান নন—বসুদেব-দেবকীর সন্তান ইত্যাদি অনেক কথাই বলিলেন। রাধা কিছুতেই সম্মত হইলেন না। তারপর শ্রীকৃষ্ণ বলপ্রয়োগ করিলেন। বড়ায়ি এই নিষ্ঠুর ব্যাপার দেখিয়া আমোদ উপভোগ করিতে লাগিল—রাধা হাহাকার করিতে লাগিল। এইভাবে নানা ছলে শ্রীকৃষ্ণ রাধার সহিত জোর করিয়া সঙ্গত হইতে লাগিলেন। ক্রমে রাধার অন্তরে কন্দর্পভাব উন্মেষিত হইল। বড়ায়ির কাজ শেষ হইল আর বলপ্রয়োগের প্রয়োজন হইল না—রাধাই শ্রীকৃষ্ণের জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িল। যখন রাধা শ্রীকৃষ্ণে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিয়াছে তখন একদিন সুপ্তসুপ্ত রাধাকে কুঞ্জবনে ফেলিয়া শ্রীকৃষ্ণ মথুরা যাত্রা করিলেন। রাধা হাহাকার করিতে লাগিল। এই Tragedyই কাব্যের উপজীব্য।

সাহিত্যের দিক হইতে বিচার করিলে বলিতে হয়, এইরূপ ভাবে কামের চরিতার্থতায় রসসৃষ্টি হয় না। রতি ভাবকেই রসে উত্তীর্ণ করা চলে, এই ভাবের মধ্যে এক জনের এইরূপ আন্তরিক বিরাগ ও বিমুখতা থাকিলে আদিরসের কাব্যও হয় না। বলপ্রয়োগ, ভয়প্রদর্শন, গ্রাম্য ভাষা প্রয়োগ, বর্বরোচিত আচরণের সমাবেশে আলঙ্কারিক বিচারে এই কাব্যে রসাভাস ঘটিয়াছে।

বৈষ্ণব ভাবাদর্শের দিক হইতেও রসাভাস ঘটিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের মুখ দিয়া তাঁহার ঐশ্বর্য্যের বা দেবত্বের কথা বারবার বলানো হইয়াছে।

বাচ্যার্থের দিক হইতে ইহার রসসৌষ্ঠবের সমর্থন করা যায় না। তবে ইহার লৌকিক ও আধ্যাত্মিক Interpretation দেওয়া যাইতে পারে। লৌকিক ভাবের ব্যাখ্যা এই—

গোড়াতেই কবি বলিয়াছেন—লক্ষ্মী রাধারূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন নরবিগ্রহধারী বিষ্ণুর প্রেম-রস আস্বাদনের জন্য। একথা রাধা ভুলিয়া

গিয়াছেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ ভুলেন নাই। অতএব শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে পরদারা-ভিমর্ষণ নয়—নিজ জায়ার নিকটেই অনুরাগ আদায়।

তারপর বঙ্গদেশের গৃহে গৃহে যাহা হয়, তাহা ছাড়া ইহা আর কিছুই নয়। এদেশে বালিকার সহিত চিরদিন যুবকের বিবাহ হইয়া থাকে। বালিকার হৃদয়ে কন্দর্প-ভাব জাগাইয়া তুলিবার ভার স্বামীই গ্রহণ করে—বালিকা-বধূর তনুমনো মন্থনেই তাহাকে প্রেমসুধার উদ্ধার করিতে হয়—কঠোর পীড়নে তাহার জীবন-অরণিতে লালসার বহ্নিকে জাগাইতে হয়। কিছুদিন ধরিয়া বালিকার জীবনে দারুণ পরীক্ষা চলিতে থাকে—বালিকার বর্ষীয়সী আত্মীয়ারা বড়ায়ির মতই সহায়তা করে, আর অন্তরালে দাঁড়াইয়া হাসে। কোন পক্ষ হইতেই দয়া-মমতার কথাই নাই। তারপর কি হয় তাহা আর বলিবার প্রয়োজন নাই। তবে এই পর্য্যন্ত বলা যায়—অনেক ক্ষেত্রেই রাধার জীবনের মত পরিণামে Tragedy* ঘটে। বঙ্গের ঘরে ঘরে যাহা হয়—কবি তাহাই রাধাশ্যামের মারফতে অত্যন্ত স্থূলভাবেই এই গ্রন্থে দেখাইয়াছেন।

আর আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা এই—ভগবান যাহাকে অহৈতুকী কৃপা করেন, তাহাকে নানা দুঃখ দিয়া, নানা পরীক্ষার মধ্যে ফেলিয়া, নানা ভাবে পীড়ন করিয়া অগ্নি-শুদ্ধ করিয়া আপনার করিয়া ল'ন। বড়ায়ি যেন ধর্ম্ম-গুরুর স্থূলাভিব্যক্তি। ভক্তের মনে অনুরাগের সঞ্চার হইলে ভগবান কৃপাহস্ত অপসারণ করেন—তখন ভক্ত হাহাকার করে। তখন তাহার প্রকৃত তপস্যার আরম্ভ হয়—সেই তপস্যার বলেই ভক্ত ভগবানকে চিরদিনের মত লাভ করে।

বঙ্গদেশের মঙ্গল-কাব্যের মূল তথ্যের আলোকেও ইহার একটা Interpretation দেওয়া যায়। মঙ্গলকাব্যে দেখা যায় নানারূপে পীড়ন ও পরীক্ষা করিয়া পূজা-বিমুখ নরনারীর কাছ হইতে পূজা আদায় করিতেছেন। কৃষ্ণকীর্ত্তনের শ্রীকৃষ্ণের একি সেই ভাবে পূজা আদায়? ইন্দ্রিয়-সম্ভোগের রূপকে কি ঐ-ভাবই ব্যক্ত হইয়াছে?

পৃথক পৃথক খণ্ডের মধ্যেও একটা আধ্যাত্মিক ইঙ্গিত আবিষ্কার করা যায়। দানখণ্ডে ভগবান ভক্তজীবনের আধ্যাত্মিক শুল্ক দাবি করিতেছেন—গীতার সেই ভগবানে সর্ব্বস্ব নিবেদন ও ব্রহ্মে কর্ম্মফল সমর্পণের কথা।

নৌকাখণ্ডে শ্রীকৃষ্ণ ভবনদীর কাণ্ডারী। ভক্তের ভার তো ভগবানই বহেন—ভক্ত ভগবানে ইহসংসারের সকল ভার সমর্পণ করিয়াই নিশ্চিন্ত—গীতার যোগক্ষেমং বহাম্যহং,—ভারখণ্ডে এইসব কথার ইঙ্গিত। ছত্রখণ্ডে—ভগবান তাঁহার কৃপাচ্ছায়ায় ভক্তকে রক্ষা করেন, এই কথারই ব্যঞ্জনা। এক হিসাবে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল। এইখানেই মঙ্গলকাব্যের সূত্রপাত হইল বলিতে হয়।

মঙ্গলকাব্যের না হউক পদাবলী সাহিত্যের সূত্রপাত যে এখান হইতে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কৃষ্ণকীর্ত্তন পূর্ব্ব হইতে পদাবলী-সাহিত্যের একটা আবেষ্টনীর সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছিল—রাধাবিরহের প্রবীভাব, আকূতি ও আকুলতাই পদাবলী সাহিত্যের উচ্চতর পরিণতি লাভ করিয়াছে। যে বংশীর ধ্বনিতে বঙ্গদেশ পাগল হইয়াছে—তাহার প্রথম স্বর যে পদে সে পদটি এই—

কে না বাঁশি বাএ বড়ায়ি কালিনী নই কূলে।
কে না বাঁশি বাএ বড়ায়ি এ গোঠ গোকুলে॥
আকুল শরীর মোর বেআকুল মন।
বাঁশির শবদেঁ মো আউলাইলোঁ রান্ধন॥
পাখি নহোঁ তার ঠাই উড়ী পড়ি জাওঁ।
মেদিনী বিদার দেউ পসিআঁ লুকাওঁ॥
বন পোড়ে আগ বড়ায়ি জগজনে জানী।
মন পোড়ে যেহ্ন কুম্ভারের পণী॥
আন্তর সুখাএ মোর কাহ্ন অভিলাসে।
বাসলী সিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে॥

কৃষ্ণকীর্ত্তনে কবি ঋতুরঙ্গ-পটভূমিকার সহিত তাঁহার কাব্যের চিত্রগুলির বেশ সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলিয়াছেন। কৃষ্ণ রাধার জন্য প্রথম ব্যাকুল হইলেন বসন্তে। গ্রীষ্মে রাধাকে ভুলাইতে কৃষ্ণ সাজিলেন দানী। গ্রীষ্মকালই তপ্তপথের পশারিণীকে তরুতলে আমন্ত্রণ করিবার সময়। বর্ষা আসিল, যমুনা কূলে কূলে ভরা। নৌকা ছাড়া পার হওয়া যায় না। কৃষ্ণ ঘাটদানী সাজিলেন। বর্ষার উত্তাল তরঙ্গপরে কাণ্ডারী শ্রীকৃষ্ণ—আর সরলা ভয়চকিতা আহীরবালা আরোহিণী। বর্ষা গেল, শরৎ আসিল। যমুনা তরিতে আর তরীর প্রয়োজন নাই। শরতের উত্তপ্ত রৌদ্র শিরীষকুসুমকোঁঅলীকে কাতর করিয়া তুলিল—কৃষ্ণ রাধার মাথায় ধরিলেন ছাতা। ভারী সাজিয়া বাঁকে করিয়া রাধার পশারা বহিলেন। বসন্তে বৃন্দাবনের বন ফুলে ফুলে ভরিয়া গেল—সেই বনে কৃষ্ণের বংশীরবের আমন্ত্রণে রাধা বৃন্দাবনের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। আবার গ্রীষ্ম,—জলকেলির সময়। জল ছাড়িয়া উঠিতে মন যায় না—বসনের কথা মনেই থাকে না। রাধার বসন চুরি গেল,—শ্রীকৃষ্ণ সাজিলেন চোর। আবার বসন্ত ফিরিয়া আসিল—রাধা আর দ্বাদশী নয়, চতুর্দ্দশী। মদনমোহন মদন ও বসন্তের সহায়তায় রাধাকে পঞ্চবাণে জর্জ্জর করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের কাজ সমাপ্ত হইল—রাধার হৃদয়ে অনঙ্গের লীলা চলিতে লাগিল। বসন্ত ফুরাইল—তপন অকরুণ হইল—শ্রীকৃষ্ণও অকরুণ হইলেন, মথুরায় পলাইলেন। চারিদিকে আগুন জ্বলিয়া উঠিল—রাধার অন্তরেও বিরহের আগুন জ্বলিল।

'নবনীদলকোঁঅলী' সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী রাধা সর্ব্বাঙ্গে গহনা পরিয়া গজমোতির সাতেসরী হার গলায় দুলাইয়া নেতের আঁচল দিয়া ঢাকা সোনার ভাঁড়ে দুধ, রূপার ভাঁড়ে দইএর পশারা মাথায় করিয়া মথুরার হাটে 'বড়আয়ীর' সঙ্গে বেচিতে যাইতেন। অদ্ভুত বটে! আইহন ছিল মস্তবড় ধনী, তাহার কিশোরী বধূ গ্রাম হইতে নগরের হাটে দইদুধ বেচিয়া

কড়ি আনিলে তবে তাহার অন্ন জুটিত। এ কেমন কথা? বলা বাহুল্য এটা মাটির বৃন্দাবন নয়—ঘোষপাড়ার গোয়ালাদের জনপদ নয়। এটা ভাব-বৃন্দাবন; এখানে সবই সম্ভব। যে বৃন্দাবনে রাজার ছেলে হইয়া সোনার নূপুর পায় সোনার পাঁচনি হাতে কানু দুপুর রৌদ্রে মাঠে মাঠে গোরু চরায়—সে বৃন্দাবনে 'বড়ার বহুআরী বড়ার ঝি' হইয়া রাধা দই-দুধ বেচিতে হাটে যাইবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি?

ইহাত ভাব বৃন্দাবনের কথা গেল। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের আচরণ এবং কৃষ্ণ রাধার উক্তি-প্রত্যুক্তি বিদ্যাপতির বা গোবিন্দদাসের বৃন্দাবন হইতে আমাদিগকে একেবারে গোয়ালাপাড়ায় লইয়া যায়। রাধাসুন্দরী বড়ায়ীর গালে চড় মারিয়া আমাদের প্রথমেই ভাবের স্বপ্ন ঘুচাইয়া দিলেন।

তারপর শ্রীকৃষ্ণের গোঁয়ারতুমি, কথায় কথায় মারের ভয় দেখানো, শ্যালী সম্বোধন ও রাধা-পীড়ন আমাদের মনকে আর ভাব-বৃন্দাবনে ফিরিয়া যাইতে দেয় না। বৃন্দাবনখণ্ডে আসিয়া আবার আমরা স্বপ্নলোকে ফিরিয়া আসি। গ্রন্থের রসাভাস মনে একটা অস্বস্তির সৃষ্টি করে। শ্রীচৈতন্যোত্তর বৈষ্ণব-সাহিত্যে রসের আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখা সম্বন্ধে যথেষ্ট সতর্কতা দৃষ্ট হয়। সেই রসাদর্শে আমাদের মন পুষ্ট হইয়া আসিয়াছে, তাই বোধ হয় অস্বস্তি অনুভব করি। চণ্ডীদাসের যুগের পাঠকদের মনে নিশ্চয়ই কোন বিক্ষোভ জন্মিত না। Realism ও Idealism এর এই অদ্ভুত সংমিশ্রণকে তাহারা উপভোগ করিতে পারিত। কৃষ্ণকীর্ত্তনের রস উপভোগ করিতে হইলে আমাদিগকেও সংস্কার-মুক্ত মনে চৈতন্য-পূর্ব্ব যুগের রসাবেষ্টনীতে কল্পনায় ফিরিয়া যাইতে হইবে। *

* আমরা উপভোগ করিতে পারি না পারি শ্রীচৈতন্যের সামসময়িক রসিকগণ যে উপভোগ করিত তাহার প্রমাণ আছে। স্বয়ং রূপ সনাতনই ইহার আদর করিতেন। শ্রীচৈতন্যের কথা ছাড়িয়া দিই, তিনি সমস্তই আপন মনের মাধুরী দিয়া মনের মত করিয়া লইতেন। আর হয়ত তিনি রাধা-বিরহের পদগুলিই উপভোগ করিতেন। ভাগবতে নৌকাখণ্ড দানখণ্ড নাই— ইহা চণ্ডীদাস

কৃষ্ণকীর্ত্তনে অলঙ্কারের আতিশয্য নাই। গ্রন্থের যে যে অংশ প্রচলিত সংস্কৃত রচনাভঙ্গী-ধারার অনুসৃতি, সেই সেই অংশেই অলঙ্কৃতি আছে। এই অলঙ্করণে কবির মৌলিকতা কিছু নাই। সেকালে অলঙ্কৃত ভাষা ভিন্ন রূপবর্ণনা করার প্রথা ছিল না, কাজেই রূপবর্ণনায় রাধার অঙ্গের অলঙ্কারের ন্যায় সুলভ অলঙ্কারের বাড়াবাড়ি দেখা যায়। ব্যতিরেক, উৎপ্রেক্ষা ও রূপক উপমারই আতিশয্য দৃষ্ট হয়। ইহাদের অনেকগুলি বিদ্যাপতির মধ্যেও পাওয়া যায়। কতকগুলির দৃষ্টান্ত দিই— *

১। কেশ পাশে শোভে তার সুরঙ্গ সিঁদূর। সজল জলদে যেহ্ন উইল নব সূর।
কনক কমল রুচি বিমল বদনে। দেখি লাজে গেল চান্দ দু লাখ যোজনে।
আলস লোচন দেখি কাজলে উজল। জলে বসি তপ করে নীল উতপল।
কুচযুগ দেখি তার অতি মনোহরে। অভিমান পাআঁ পাকা দাড়িম বিদরে।
২। লাবণ্য জল তোর সিহাল কুন্তল। বদন কমল শোভে আলক ভামল।
নেত্র উতপল তোর নাসা নাল দণ্ড। গণ্ডযুগ শোভে তোর মধুক অখণ্ড।

যেখান হইতেই পান না কেন—তিনিই বঙ্গসাহিত্যে ইহার প্রবর্ত্তক। পরে এই দানখণ্ড ও নৌকাখণ্ড ভবানন্দের হরিবংশে ও কৃষ্ণমঙ্গলের সব গ্রন্থেই স্থান পাইয়াছে এবং এই বিষয় লইয়া বহু পদেরও সৃষ্টি হইয়াছে। চৈতন্যোত্তর কবিদের হাতে দানখণ্ড ও নৌকাখণ্ডের রুচি ঢের বেশি মাৰ্জ্জিত হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যের পরম ভক্তগণই সে সকল পদ রচনা করিয়াছেন।

* রাজহংস, খঞ্জন, গজরাজ, পূর্ণচন্দ্র, নীলোৎপল, স্থলকমল, বাঁধুলী, দাড়িম্ব, নীলজলদ, শিরীষ, কদলী ইত্যাদির সহিত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপমা বহুপূর্ব্ব হইতেই প্রচলিত আছে। অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সংস্কৃত সাহিত্য হইতে প্রাপ্ত উপমানের একটা তালিকা পূর্ব্ব হইতেই এদেশে প্রচলিত ছিল। এই কাব্যে দেখা যায় সেই তালিকাই শ্রীকৃষ্ণ রাধার রূপবর্ণনায় বার বার ফিরাইয়া ঘুরাইয়া চালাইতেছেন। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের কামনার আতিশয্যই প্রকট হইয়াছে। ইহার উত্তরে কমলদল কোমলী রাধাও বার বারই বলিয়াছে—'আপন মাএর মাঁসে হরিণী বিকলী'। এই পংক্তির ভাব চর্য্যাপদ হইতে প্রাপ্ত।

হাস কুমুদ তোর দশন কেশর। ফুটিল বাঁধুলী ফুল বেকত অধর।
বাহু তোর মৃণাল কর রাতা উতপল। অপুরুব কুচ চক্রবাক যুগল।
ঈষৎ ফুটিত পদ্ম তোর নাভি থানে। কনক রচিত তোর ত্রিবলী সোপানে।
গরুঅ নিতম্ব পাট শিলা বিগুমানে। আরপিল হেম পাট তোহর জঘনে।
সুন্দরী রাধা ল সরোঅর মযী। দুঃসহ বিরহ জরে জরিলা কাহ্নাই।
তোক্ষা ছাড়ি নাহিঁ জ্বর হরণ উপাএ। বাসলী শিরে বন্দি চণ্ডীদাস গাএ।

[বাহু দ্বৌ চ মৃণালমাস্যকমলং লাবণ্যলীলা জলং।
শ্রোণী তীর্থশিলা চ নেত্র সফরং ধম্মিল্লং শৈবালকম্॥
কান্তায়াঃ স্তনচক্রবাকযুগলং কন্দর্পবাণানলৈ।
দগ্ধানামবগাহনায় বিধিনা রম্যং সরোনির্ম্মিতম্॥

শৃঙ্গারতিলকের এই শ্লোক হইতে উহা রচিত।] *

চণ্ডীদাস জয়দেবের গীতগোবিন্দ হইতে কিছু কিছু অলঙ্করণ আহরণ করিয়াছেন। জয়দেবের—স্তনবিনিহিতমপি হার মুদারম্। সা মন্যতে কৃশতনুরিব ভারম্—বড়ু চণ্ডীদাসের কৃষ্ণকীর্ত্তনে—স্তনের উপর হারে। আল মানএ যেহ্ন ভারে। জয়দেবের ভ্রূপল্লবং ধনুরপাঙ্গতরঙ্গাণি বাণাঃ—পংক্তিকে মনে পড়ায় চণ্ডীদাসের ভ্রু হি কামধনু নয়ন বাণে। জয়দেবের 'নয়ন নলিনমিব বিদলিতনালং' আর চণ্ডীদাসের 'নালহীন কৈল নীলনলিনে'—একই কথা।

বিরহে চন্দ্র, চন্দন, কিসলয় শয়ন, মলয় পবন ইত্যাদি অগ্নিসম জ্বালাময়—ইহা কেবল জয়দেব নয়, সংস্কৃত কবিদেরও কাব্যে কবিসময়সিদ্ধির মত।

---

* রূপ গোস্বামীর রচনাতেও এইরূপ প্রথমোক্তি অলঙ্কারের শ্লোক দৃষ্ট হয়।

ধম্মিল্লং শৈবাল মঞ্জরী বিরচিতা সঙ্গং রথাঙ্গদ্বয়ম্।
ফুল্ল পঙ্কজপঙ্কজ বিসদোর্যুগ্মং চ মুখেন তম্॥
উর্ম্মীলতাতিচঞ্চলক শফরীদ্বয়ং ভ্রমে ভ্রাজতে।
সেয়ং শুদ্ধতরাঽনুরাগ পয়সা পূর্ণা পুরোদীর্ঘিকা॥

বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস দুই কবিই এই কবিপ্রসিদ্ধি অন্ধভাবেই অনুকরণ করিয়াছেন। চণ্ডীদাস জয়দেবের অনেক পংক্তি ও পদের অনুবাদও করিয়াছেন। এই অনুবাদে চণ্ডীদাস জয়দেবের অলঙ্কৃত সমাসঘন বাক্যগুলির অতি সরল রূপ দান করিয়াছেন। যেমন—

জয়দেব—রতি সুখসারে গত মভিসারে মদন মনোহর বেশম্।
ন কুরু নিতম্বিনি গমন বিলম্বনমনুসর তং হৃদয়েশম্॥

চণ্ডীদাস—তোর রতি আশে আশে গেলা অভিসারে।
সকল শরীর বেশ করি মনোহরে॥
না কর বিলম্ব রাধা করহ গমনে।
তোমার সঙ্কেত বেণু বাজএ যতনে॥

জয়দেব—মুখরমধীরং ত্যজ মঞ্জীরং রিপুমিব কেলিষু লোলম্।
চল সখি কুঞ্জং সতিমির পুঞ্জং শীলয় নীল নিচোলম্॥
উরসি মুরারেরুপহিতহারে ঘন ইব তরল বলাকে।
তড়িদিব পীতে রতি বিপরীতে রাজসি সুকৃতবিপাকে।

চণ্ডীদাস—তেজহ সুন্দরী রাধা মুখর মঞ্জীর। সত্বরে চলহ কুঞ্জ এ ঘোর তিমির।
কৃষ্ণের হৃদয়ে রাধা রতি বিপরীতে। শোভে মেঘমালে যেহ্ন তড়িতে॥

জয়দেব—বদসি যদি কিঞ্চিদপি······তিমিরমতি ঘোরম্।

চণ্ডীদাস—যদি কিছু বোল বোলসি তবে দশনরুচি তোহ্মারে।
হরে ভুরুবার ভয় আপকার সুন্দরি রাধা আন্ধারে॥

জয়দেব—নিন্দতি চন্দন মিন্দু কিরণ মনুবিন্দতি খেদমধীরম্।
ব্যালনিলয় মিলনেন গরলমিব কলয়তি মলয় সমীরম্॥

চণ্ডীদাস—নিন্দএ চান্দ চন্দন রাধা সবখনে। গরল সমান মানে মলয় পবনে।

জয়দেব—বহতি মলয় সমীরে মদনমুপনিধায়।
স্ফুটতি কুসুম নিকরে বিরহি-হৃদয়-দলনায়॥

চণ্ডীদাস—এবে মলয় পবন ধীরে বহে মনমথক জাগাএ।

স্থগন্ধি কুসুমগণ বিকসএ ফুটি বিরহি হৃদয়ে ॥

বিদ্যাপতির অনেক পংক্তির সহিত চণ্ডীদাসের পংক্তির মিল আছে।

বিদ্যাপতি—নিন্দয় চন্দন পরিহর ভূষণ চাঁদ মানএ যেন আগি।

চণ্ডীদাস—নিন্দএ চান্দ চন্দন রাধা সব খনে। গরল সমান মানে মলয় পবনে।

বিদ্যাপতি—সিরীষকুসুম তনি। অতি সুকুমার ধনি।

চণ্ডীদাস—শিরীষ কুসুম কোঁঅলী অদভুত কনক পুতলি।

বিদ্যাপতি—পীনপয়োধর অপরুবসুন্দর উপর মোতিম হার।

জনি কনকাচল উপর বিমলজল দুই বহ সুরসরিধার।

চণ্ডীদাস—কনককুম্ভ আকারে দুই তোর পয়োধরে

তাহাতে উপর গজ মুকুতার হারে

যেহ্ন শোভ করে সুমেরু গঙ্গার ধারে।

বিদ্যাপতি—সাহর মঞ্জর ভ্রমর গুঞ্জর কোকিল পঞ্চম গাব।

দখিন পবন বিরহ বেদন নিঠুর কন্ত ন আব।

চণ্ডীদাস—মুকুলিল আম্ব শাহারে। মধুলোভে ভ্রমর গুঞ্জরে।

ডালে বসি কুয়িলী কাঢ়ে রাএ। যেহ্ন লাগে কুলিশের ঘাএ ॥

বিদ্যাপতি—শঙ্খ কর চূর বসন কর দূর তোড়হ গজমতি হার রে।

পিয়া যদি তেজল কি কাজ শিঙারে যমুনা সলিলে সব [illegible] রে ॥

সীঁথার সিন্দুর পোছি কর দূর পিয়া যব নৈরাশরে।

চণ্ডীদাস—এ ধন যৌবন বড়াযি সকলি অসার।

ছিণ্ডিআঁ পেলাইবোঁ গজ মুকুতার হার।

মুছিআঁ পেলাইবোঁ সিসের সিন্দুর।

বাহুর বলয়া মো করিব শঙ্খচূর।

বিদ্যাপতি—পাখী জাতি যদি হউ পিয়া পাশে উড়ি যাউ সব দুখ কহোঁ তছু পাশে।

চণ্ডীদাস—পাখীজাতি নহোঁ বড়ায়ি উড়ী যাঁও তথা
মোর প্রাণনাথ কাহ্নাঞি বসে যথাঁ।
বিদ্যাপতি—বড়েও ভুখল নহি দুহু করে খাএ।
চণ্ডীদাস—ভুখিল হয়িলেঁ কাহ্নাঞি দুই হাথে না খাইএ।

কৃষ্ণকীর্ত্তনের বহু পংক্তিতে বাঙ্গালার গ্রাম্য জীবনের প্রচলিত বক্রোক্তি, প্রবাদ-প্রবচন, ও সরস বচনের পরিচয় পাওয়া যায়। এইগুলির মধ্যে কাব্যরসের ছিটেফোঁটা বেশ মিলিবে। ১। কার কাঁচা আলিতে না দেওঁ মোএঁ পাএ। ২। দেখিল পাকিল বেল গাছের উপরে। আরতিল কাক তাক ভখিতেঁ না পারে। ৩। বিরহে পুড়িআ কাহ্ন হাকল বিকল। জরুআ দেখিআঁ যেহ্ন কচক আদল। ৪। দিঠিত পড়িলে বাঘত হএ লাজ। ৫। পোএর মুখে পরবত টলে। ৬। যৌবন পড়িলে তোর তন্থ হইবে লাউ। যাবত যৌবনে রাধে নাহিঁ লাগে ঘুণ। ৭। মাকড়ের হাতে যেহ্ন ঝুনা নারিকল। ৮। তোর রূপ দেখি সব জন মোহে মঞরে সুখানো কাঠে। ৯। মল্লিকা কলিকা পাশে ভ্রমর না পাএ রসে। ১০। ভুখিল হয়িলেঁ কাহ্নাঞি দুই হাথে না খাইএ। ১১। মাকড়ের যোগ্য কভোঁ নহে গজমুতী। ১২। প্রবল আনল কাহ্নাঞি না নিবাএ ঘৃতে। ১৩। এ তোর আড়নয়নে পাঞ্জর বিন্ধিল ঘুনে। ১৪। এবেঁ মোর মনের পোড়নী যেন উয়ে কুম্ভারের পনী। ১৫। সোনা ভাঙ্গিলেঁ আছে উপাএ জুড়িএ আগুন তাপে। পুরুষ নেহা ভাঙ্গিলেঁ জুড়িএ কাহার বাপে। ১৬। যে ডাল করো মো ভরে। সে ডাল ভাঙ্গিআ পড়ে। নাহি হেন ডাল যাতে করো বিসরামে।

কৃষ্ণকীর্ত্তনের দানখণ্ড অযথা দীর্ঘ। একই কথার পু[illegible] ফলে ইহা দীর্ঘ হইয়া উঠিয়াছে। রাধা ও কৃষ্ণের উক্তি-প্রত্যুক্তি ও রস-কলহ পুনরাবৃত্তি-দোষ সত্বেও শ্রোতৃবৃন্দের নিশ্চয়ই প্রীতিকর হইত। সাহিত্যরসের দিকে কবির দৃষ্টি ছিল না—শ্রোতাদের মনোরঞ্জনই ছিল উদ্দেশ্য। সেকালের শ্রোতাদের যেমন রসবোধ,—রচনাও তদুপযোগী হইয়াছে। এই প্রকারের

রস-কলহের বাণীরূপ পরে শুকসারীর মুখ দিয়া প্রদর্শিত হইত। কৃষ্ণকীর্ত্তনের রাধাবিরহ Lyrical—দানখণ্ড dramatic. এই দানখণ্ডের রস কলহের একটু নমুনা দিই,

কৃষ্ণ—আহ্মে সে কানাঞি গোয়াল নাগর তোহ্মার বার বরিষে।
নহলী যৌবন অতি সুশোভন সুরভি দেহ হরিষে।
রাধা—প্রথম যৌবন মুদিত ভাণ্ডার তাত না সাম্বাএ চুরী।
আহ্মার যৌবন কাল ভুজঙ্গম ছুইলেঁ খাইলেঁ মরী।
কৃষ্ণ—আহ্মে সে কানাঞি তোহ্মে চন্দ্রাবলী মরণে তোহ্মা না ছাড়ী
তোহ্মার যৌবন কাল ভুজঙ্গম আহ্মে যে ভাল গারুড়ী (ওঝা)।
রাধা—তপত দুধ নালে না পীএ জুড়াইলে সোআদ তাএ।
নহলী যৌবন কাঁচা শিরিফল তাহাক কেহো নাহি খাএ।
কৃষ্ণ—যাত খিদা বসে নাগরি রাধা কিবা তার কাঁচ পাকাএ।
যেমন পাএ তেমন খাএ যা নাহি খিদা পালাএ।
রাধা—দীঠি দীঠি চাহি বোলোঁ মো কাহ্নাঞি আহ্মাক এড়িতেঁ জুআএ।
সমুখ দীঠে পড়িলে বনত ভুখিল বাঘে না খাএ।
রাধা বলিতেছে—কাল হাণ্ডির ভাত না খাওঁ কালো মেঘের ছায়া নাহি জাওঁ
কালিনী রাতি মোঁ প্রদীপ জালিআঁ পোহাওঁ।
কাল গাইর ক্ষীর না খাওঁ কাল কাজল নয়নে না লওঁ
কাল বাহ্নাঞি তোক বড় ডরাওঁ। *

শ্রীকৃষ্ণ উত্তরে কালোর মহিমা প্রচারের জন্ম লম্বা একটি তালিকা দিলেন। "কাল আখরে তীন ভুবন বিচার। কালো মেঘের জলে জীএ সংসার। *** এহা বুঝি না কর রাধা তোঁ মন মন্দ।" ইহাতে কাল গাই, ভ্রমর, কাজল, ভ্রূ,

---

* পদাবলী সাহিত্যে কৃষ্ণ কালো বলিয়া কালো রঙের প্রতি অভিমানিনী শ্রীমতীর বিমুখতার কথা বারবারই আছে।

চিকুর, চন্দ্রে মৃগলাঞ্ছন, ইন্দীবর ইত্যাদির গুণগানে একটু কবিত্বের আমেজও আছে। এইরূপ তালিকা দিয়া কোন বিষয়ের বর্ণনা বা কোন কিছুর গুণগানের প্রথা বঙ্গ সাহিত্যে বহুদিন পর্য্যন্ত চলিয়াছিল।

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীমতীর বিরক্তাবের ভাষা বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসে প্রায় একরূপ। অথচ দুইএ যথেষ্ট প্রভেদ। এই প্রভেদ কাহিনীর পারম্পর্য্য ও আবেষ্টনীর উপর নির্ভর করিতেছে। বিদ্যাপতির অনুযোগ মানিনীর রসালাপ মাত্র। *

গোপপল্লীর দুগ্ধবিক্রেতাদের পসারা এই কাব্যখানির নায়িকা চন্দ্রাবলী রাধা—খাঁটি গোয়ালার মেয়ে। অঙ্গে সে নবনীদল কোমলী, কিন্তু মনে মনে সে তেজস্বিনী কম নয়। কাহ্নাইএর ফুল তাম্বূল রাধা বড়াইএর মুখের উপর ফেলিয়া দিয়া তাহার গালে এক চড় বসাইয়া দিল। বলিল—

পাকলী দূতী মোর বাপেত নাহিঁ লাজ। তে কারণে মোক করালি হেন কাজ।
আর যবে বোল মোরে হেন পরিহাস। আবাস করিবো তবেঁ তোহ্মার বিনাশ।

বড়াইএর প্রস্তাব শুনিয়া রাধার অঙ্গ কম্পিত হইতে লাগিল—

যত নানা ফুল পান করপূর সব পেলাইল পাএ।

বড়াই বলিল—যে দেব স্মরণে পাপ বিমোচনে দেখিল হও মুকুতি।
সে দেব সনে নেহা বাঢ়াইলেঁ হয়ে বিষ্ণুপুরে স্থিতি।

রাধার তেজস্বী উত্তর—

দিক যাউ নারীর জীবন দহে পশু তার পতি।
পরপুরুষের নেহাএঁ যাহার বিষ্ণুপুরে হএ স্থিতি।

---

* গাব চরাবএ গোকুল বাস। গোপক সঙ্গম কর পরিহাস।
সজনি বোলহ কানু সঞো মেলি। গোপবধূ সঞো যহিকা কেলি।
গ্রামকে বসলে বোলিয় গমার। নগরহু নাগর বোলিয় সংসার।
বন বধান শালি দুহ গাএ। তহি কি বিলসবি নাগরী পাএ।

কাহ্নাই, নিজে স্বয়ং ভগবান, দৈবকীজঠরে কংসবধের জন্য অবতীর্ণ, কত বার অবতীর্ণ হইয়া কত অলৌকিক কাণ্ড করিয়াছেন, যশোদা তাঁহার জননী নয়, ইত্যাদি নানা কথা বলিয়া রাধাকে বশীভূত করিতে চেষ্টা করিলেন। বৃন্দাবনেও তিনি কত অলৌকিক কাণ্ড করিয়াছেন—সেকথাও স্মরণ করাইয়া দিলেন—রাধা তাহাতে একেবারেই ভয় পাইল না। কাহ্নাই রাধাকে মারিয়া ফেলার ভয়ও দেখাইলেন—তাহাতেও রাধা বিচলিত হইল না। রাধা সতীধর্ম্মকে নারীর শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলিয়া জানিত—সে ধর্ম্ম রক্ষার জন্য রাধা প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে এবং সম্বন্ধে সে মাতুলানী, তাহার প্রতি লালসা অত্যন্ত অধর্ম্মসূচক ও অশোভন—রাধা বারবার এই কথা কাহ্নাইকে শুনাইয়াছে। বারো বছরের বালিকা একাকিনী অসহায়া অবস্থাতেও কামোন্মত্ত কৃষ্ণের সঙ্গে কোমর বাঁধিয়া ঝগড়া করিয়াছে। তারপর রাধার যে পরিণতি—তাহা সরলা গোপবালিকার পক্ষে কিছুই অস্বাভাবিক নয়।

কৃষ্ণকীর্ত্তনের গোবিন্দ বৃন্দাবনের রসলীলা উপভোগ করিতে জন্মগ্রহণ করেন নাই—কংসবধের জন্য অবতীর্ণ। এ গোবিন্দ রীতিমত গোয়ার গোবিন্দ। গোপপল্লীতে প্রতিপালিত হইয়া অমার্জ্জিত চরিত্রের সবলকায় কিশোর। এই গোপপল্লী সেই যমুনাতীরের বিদগ্ধ ভাবাপন্ন আভীরপল্লী নয়—এ যেন বাঙ্গালার ভাগীরথীতীরের অশিক্ষিত গোপপল্লী। রাধা বড়ায়িকে ভাগীরথী কূলে গোবিন্দকে খুঁজিতে বলিয়াছিল—সেটা অসঙ্গত কথা নয়। প্রথম যৌবনের উদ্দীপ্ত লালসার তৃপ্তির জন্য এই যুবক উদ্‌গ্রীব, প্রেমের মর্য্যাদা সে বুঝে না। সে নিষ্ঠুর, নির্ম্মম, দাম্ভিক, প্রতিহিংসাপরায়ণ ও শঠ। রাধা তাহার ফুল তাম্বূল উপেক্ষা করিয়াছিল বলিয়া তাহার অহমিকায় আঘাত লাগিয়াছিল—তাহার দম্ভ ও প্রতিহিংসা যেন তাহার লালসাকে প্রচণ্ড করিয়া তুলিয়াছিল। এই শ্রীকৃষ্ণ নিষ্ঠুর ব্যাঘ্র যেমন দীনপ্রাণা হরিণীকে

আক্রমণ করে—সেই ভাবে নির্জ্জন বনপথে অসহায়া সাশ্রুনয়না বালিকা রাধাকে আক্রমণ করিতেছে।

সে দীনা বালিকার কাছে কেবল নিজের বলবীর্য্যের আস্ফালন করিতেছে—সতীধর্ম্মকে উড়াইয়া দিতেছে—পরদারগমনকে পুরাণের উপাখ্যান তুলিয়া সমর্থন করিতেছে। সে মিথ্যাচারের আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে—ছল করিয়া মহাদানী সাজিতেছে—কাণ্ডারী সাজিতেছে—মাঝ যমুনায় নৌকা ডুবাইয়া নিজের ইন্দ্রিয়বৃত্তির চরিতার্থ করিতেছে—রাধার অঙ্গের অলঙ্কারগুলি অপহরণ করিতেছে। রাধার জীবন লইয়া সে বিড়াল যেমন ইঁদুর লইয়া খেলা করে, তেমনি করিয়া খেলা করিতেছে—রাধার দেহের উপর অত্যাচারের ত কথাই নাই—বার বার তাহার জীবন-সংশয় হইতেছে।

এই শ্রীকৃষ্ণ সাধ করিয়া আবার রাধার ভার বহন করিতেছেন তাহার মাথায় ছাতা ধরিতেছেন। আবার রোষ-প্রকাশের সময় বলিতেছেন—"আমাকে দিয়া সে ভার বইয়েছে—ছাতা ধরিয়েছে—তাকে আমি ক্ষমা করব না।" শ্রীকৃষ্ণ ভালবাসেন মনে করিয়া সরলা রাধা একবার মান করিয়াছিল—শ্রীকৃষ্ণ মামুলী বচনে একবার মানভঙ্গের চেষ্টা করিয়া শেষে উগ্রমূর্ত্তি ধরিলেন—বনের ফুলফল ভাঙ্গার মিথ্যা দোষারোপ দিয়া রাধাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিলেন। ক্ষণিক মিলনের পর শ্রীকৃষ্ণ রাধাকে ত্যাগ করিয়া লুকাইলেন।

রাধা যখন শ্রীকৃষ্ণের বিরহে পাগলিনী, তখন এই শ্রীকৃষ্ণই আবার সাধু সাজিয়া বলিলেন—"আমি পরস্ত্রী গ্রহণ করিতে পারি না—তুমি মাতুলানী—'এবে সে জানিল হইল কলি অবতার। সবজন থাকিতে ভাগিনা চাহে জার।' আমি এখন যোগ অভ্যাস করিতেছি—আমি এখন জিতেন্দ্রিয়।" এসব কথা নিদারুণ ব্যঙ্গ।

অনেক সাধাসাধির পর বড়ায়ির অনুরোধে কৃষ্ণের দয়া হইল। কৃষ্ণের

ঊরুতে মাথা রাখিয়া রাধা ঘুমাইয়া পড়িল। সেই সুযোগে কৃষ্ণ মথুরায় পলায়ন করিলেন। লম্পট বন্ধু ফাঁকি দিয়া চম্পট দিলেন। রাধা হাহাকার করিতে লাগিল—বড়াই তাহার দুঃখ দেখিতে না পারিয়া কৃষ্ণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া দুঃখের কথা বলিল। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—রাধার আচরণ আমি ভুলিব না—তাহার মুখের কথা বড়ই কড়া কড়া, সে আমাকে অনেক দুঃখ দিয়াছে—আমার অপমান করিয়াছে। তাহাকে আর আমি চাই না। আমার এখানে গুরুতর কাজ আছে। কংসবধ করিতে হইবে।

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের প্রথম যৌবনের প্রচণ্ড লালসার তৃপ্তির জন্যই যেন রাধাকে প্রয়োজন হইয়াছিল। এখন লালসানল নির্বাপিত হইয়াছে আর তাহাকে প্রয়োজন নাই। একটা অজুহাত দেখাইয়া রাধার প্রতি কৃষ্ণ অক্লেশে ঘৃণাবিতৃষ্ণা প্রকাশ করিলেন। উৎসব-নিশীথের উপভুক্ত মালতীমালার ন্যায় শ্রীমতী বৃন্দাবনে ধূলিশয্যায় পড়িয়া থাকিল। তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের কি আসে যায়?

এই শ্রীকৃষ্ণের কীত্তিকলাপের যদি একটা রূপকার্থ কল্পনা করা না যায়—তাহা হইলে কৃষ্ণকীর্ত্তনের কি গতি হইবে? তার পর কবি রাধিকার দুর্দশার কথা বলিয়া গ্রন্থ শেষ করিয়াছেন। বসন্তকাল আসিলে—রাধার তাপ ও অনুতাপ দুইই দেখা দিল। শ্রীমতী আক্ষেপ করিয়া বলিল—"কেন কালঘুম ঘুমাইলাম! কেন কৃষ্ণের ফুল তাম্বূলের অসম্মান করিয়াছিলাম! সাগরসঙ্গমে গিয়া গায়ের মাংস কাটিয়া মকরের ভোজ দিব—আর জন্মে যেন এ বিচ্ছেদ না হয়।" শ্রীমতী স্বপ্ন দেখিল—প্রথম প্রহরে কৃষ্ণ চুম্বন করিলেন—দ্বিতীয় প্রহরে তিনি আত্মসমর্পণ চাহিলেন, আমি অনুমতি দিলাম না—তৃতীয় প্রহরে আমার চিত্ত চঞ্চল হইল।

> চউঠ পহরে কাণ করিল অধর পান মোর ভৈল রতিরস আশে।
>
> দারুণ কোকিল নাদে ভাঁগিল আমার নিদে গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে।

এই স্বপ্নই সমস্ত কাব্যখানির মর্ম্মকথা।

রাধার আক্ষেপের ক্ষতে বড়াই মুণের ছিটা দিয়া বলিল—

কাহ্নের তাম্বূল রাধা দিলোঁ মোর হাথে। সে তাম্বুল তো ভাঁগিলি মোর মাথে
এবেঁ ঘুসঘুসাআঁ পোড়ে তোর মন। পোটলি বান্ধিআঁ রাখ নহুলী যৌবন।

ইহার উত্তরে শ্রীমতী যাহা বলিল তাহা কৃষ্ণকীর্ত্তনের মান রাখিয়াছে—

এ ধন যৌবন বড়ায়ি সবই অসার। ছিণ্ডিআঁ পেলাইবোঁ গজমুকুতার হার।
মুছিআঁ পেলাইবোঁ সিসের সিন্দুর। বাহুর বলয়া মো করিবোঁ শঙ্খচূর।
দারুণী বড়ায়ি গো দেহ প্রাণদান। আপনার দৈবদোষে হারায়িলোঁ কাহ্ন।
মুণ্ডিআঁ পেলাইবোঁ কেশ জাইবোঁ সাগর. যোগিনী রূপ ধরি লইবোঁ দেশান্তর।
যবে কাহ্ন না মিলিহে করমের ফলে। হাথে তুলিআঁ মো খাইবোঁ গরলে।

এই কথাইত পরবর্ত্তী বৈষ্ণব-কবিরা বিভিন্ন ভাষায় বলিয়াছেন।

একে একে সব কথা মনে পড়িতেছে—আর শ্রীমতীর অনুতাপ জ্বালা 'ঘসির আগুন যেহ্ন দহদহ জ্বলে।' প্রত্যেক ত্রুটির জন্য রাধা ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছে—আমি তখন নিতান্ত 'শিশুমতী' ছিলাম তোমার মহিমা বুঝি নাই।

পানফুল না লইলোঁ যাইলোঁ তোর দূতী। সেহো দোষ খণ্ড মোর মদনমুরুতি॥
আর যত দুখ দিলোঁ কদম্বের তলে। সেহো দোষ খণ্ড কাহ্ন না জানিলোঁ ভোলে॥
বারে বারে যত তোক বুইলোঁ আহঙ্কারে। সেহো দোষ খণ্ড মোর দেবগদাধরে॥
যেবা কিছু দুখ দিলোঁ পার হইতে নাএ। সেহো দোষ খণ্ড কাহ্ন ধরোঁ তোর পাএ॥
আর দুখ দিলো তোক বহায়িগোঁ ভার। সেহো দোষ জগন্নাথ খণ্ডহ আহ্মার।
অনাথী নারীর কত থাকে অভিমান। আলিঙ্গন দিআঁ কাহ্নে রাখহ পরাণ।

রাধাবিরহ শেষ হইয়াছে—শ্রীরাধার বারমাস্যা গানে। এই 'বারমাস্যা' রচনার পদ্ধতি সাহিত্যে এইখান হইতে সুরু হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের ছন্দ সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিতে হয়। প্রাকৃত-পিঙ্গলের পজ্ঝটিকা বিদ্যাপতিতে তরলায়িত হইয়া বাঙ্গালা পয়ারের কাছাকাছি

আসিয়াছিল। বাঙ্গালাদেশে চর্য্যাপদের পজ্ঝটিকা হইতে পয়ারের জন্মের মাঝামাঝি অবস্থাগুলির পরিচয় কোন গ্রন্থে পাওয়া যায় না। মনসামঙ্গল ও মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের পয়ার শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের পয়ারের পরের অবস্থায় অবস্থিত বলিয়া মনে হয়। কৃত্তিবাসের আসল রচনা পাওয়া যায় না। ঢাকা হইতে যে কৃত্তিবাসের আদিকাণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে তাহার পয়ারের রূপ ও শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের পয়ারের রূপ একই প্রকারের। তবে চণ্ডীদাসের একটি পদে পজ্ঝটিকার আসল রূপ পাওয়া যায়। নীলজলদসম কুন্তলভারা। বেকত বিজুলি শোভে চম্পকমালা। শিশত শোভএ তোর কাম সিন্দূর। প্রভাত সময়ে যেন উয়ি গেল সূর। ইহাতে 'নীলের' ঈকারের দীর্ঘ উচ্চারণ ধরা হইয়াছে এবং কুন্তল, চম্পক ও সিন্দুর এই তিনটি শব্দে যুক্তাক্ষরের জন্য দুই মাত্রা ধরা হইয়াছে। চণ্ডীদাসের পয়ারে ১৩—১৪—১৫—১৬ অক্ষর পর্য্যন্ত আছে। যেখানে ১৩ অক্ষর আছে—যেখানে একটি দীর্ঘস্বরকে পজ্ঝটিকার মত দুই মাত্রা ধরা হইয়াছে। যেমন—

কাঠ কাটিল গিআঁ বিবিধ বিধানে। মাঅ বাপত বড় গুরুজন নাহী।
হেনক কুমতীএঁ হরিরে ভিখারী। সুন্ধি কেতকী সম সজাইআঁ দহী।
দধি বিকে যা আজি মথুরার রাজ। আঁচ কনয়া যেহ্ন দেহের বরণ।

যেখানে ১২টি অক্ষর সেখানে দুইটি দীর্ঘস্বরকে দুই দুই মাত্রায় ধরা হইয়াছে। ইহা রীতিমত পজ্ঝটিকারই মত। যেমন—

এ যুগতী পুত্রা বোলহ আহ্মারে। রাধিকা বুঝাইআঁ লঞা গেলী ঘর।
কালমেঘের জলে জীএ সংসার। গণ্ডযুগ শোভে মধুক অখণ্ড।
সুন্দরী রাধা ল সরোবরমধী।

যেখানে ১৫ বা ১৬ অক্ষরে পংক্তি রচিত হইয়াছে সেখানে—**আই-আউ** ইত্যাদিকে একটি অক্ষর ধরা হইয়াছে অথবা পরবর্ত্তী হসন্তবর্ণ সহ ব্যঞ্জনবর্ণকে একমাত্রায় ধরা হইয়াছে। এপ্রথা পরবর্ত্তী কাব্য-সাহিত্যে খুব চলিয়াছিল।

বড়ায়ি (বড়াই) ও কাহ্নাঞি শব্দ দুটিকে মাঝে মাঝে দুই মাত্রায় ধরা হইয়াছে, বাসলীকে সর্ব্বত্রই চারি মাত্রা ধরা হইয়াছে।

১। রাধার পন্থ নেহালিঞা রহিলা কাহ্নাঞি। ২। কোন বাটে আন্ধা লঞা জাইবেঁ ল বড়ায়ি। ৩। যমুনার ঘাট জাইতেঁ আছে পথ দুই। ৪। হাটি জাইতেঁ নিষধল সাসুড়ী আইহনে। ৫। আইস জাই তোর সামী সাসুড়ীর থানে। ৬। আনাইআঁ জানাইল সব গোআলিনী সহী। ৭। ঘাটের ঘাটিআল মোরে ঝাঁটি কর পার। ৮। কালমেঘের পাশে শোভে পুনমির চন্দ। ৯। বাহু তোর মৃণাল কর রাতা উতপল।

দীর্ঘস্বর যুক্ত শেষাক্ষরকে দুই মাত্রায় ধরিয়া ১৩ অক্ষরেও পংক্তি গঠন করা হইয়াছে। ইহা 'গগনে গরজে মেঘ ঘন বরষা' ইত্যাদির পূর্ব্বাভাস।

সোনার চুপড়ী রাধা রুপার ঘড়ী। নেতের আঁচল তাত দিআঁ ওহাড়ী।

একই চরণে দীর্ঘস্বরকে দুইমাত্রা—অথচ হসন্ত-অক্ষরযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণকে এক মাত্রাও ধরা হইয়াছে।

প্রচলিত পয়ারে যেরূপ শব্দের আক্ষরিক বিন্যাসের প্রথা নিয়মিত হইয়াছে, চণ্ডীদাস সে প্রথা বহু পংক্তিতেই অনুসরণ করেন নাই। শব্দের মধ্যে যতি সংস্থানেও তাঁহার আপত্তি ছিল না। বলা বাহুল্য সুর করিয়া পড়িলে বা গাহিলে ইহাকে ত্রুটী বলিয়া ধরা যায় না। তবে একথা এখানে বলিতে হয়—চণ্ডীদাসের অধিকাংশ পয়ার-পংক্তিই বর্ত্তমান প্রথার বিচারেও নির্দোষ।

চৌদ্দ অক্ষরের পয়ার পংক্তির সঙ্গে দশ অক্ষরের পংক্তির মিল দিয়াও চণ্ডীদাস ছন্দ রচনা করিয়াছেন।

১৪ + ১০ কি মোর ঝগড় পাত যমুনার ঘাটে। জাইবোঁ ঝাঁটি মথুরার হাটে।
মতি পাঞা মোরে তোএঁ করসি ধামালী।
বাপে মাএঁ দিবোঁ তোরে গালি।
গরু রাখি তোর কাহ্নে গেলিরে জরমে। তৈঁসি তোর এসব করমে।

এঁবে যমুনার ঘাটে ভৈলা মহাদানী। দান ছলেঁ বোল পাপবাণী।

দশ অক্ষরের পংক্তির হ্রস্ব পয়ারও কৃষ্ণকীর্ত্তনে যথেষ্ট।

চাহ মোরে মুখশশী তুলী। তোহ্মে রাধা আহ্মে বনমালী।
তোর মোর ভৈল পরিচএ। এবে পরিহর তোহ্মে ভএ॥

বারো অক্ষরের অর্থাৎ ৬+৬ অক্ষরের হ্রস্ব পয়ারও পাওয়া যায়। এই শ্রেণীর পংক্তি পরে লঘু ত্রিপদীর স্তবকে অন্তরার কাজ করিয়াছে।

৬+৫ অক্ষরের একাবলী ছন্দও পাওয়া যায়। তবে ৬+৬ এর সঙ্গে অধিকাংশ ক্ষেত্রে মিশ্রিত।

শুনীএ যবেঁ সে আইহন বীর। করেতে তোহ্মা করিব চীর।
মাণিক জিনিআঁ দশন তোরে। তা দেখি দাড়িম ফল বিদরে।
কম্বু সম তোর শোভএ গলে। কুচ যুগ রাধা যোড় শ্রীফলে।

প্রাকৃত বৃত্তনরেন্দ্র ও ভরহট্টা ও দীর্ঘ ত্রিপদীর মাঝামাঝি অবস্থার ত্রিপদী কৃষ্ণকীর্ত্তনে পাওয়া যায়।

৮+৮+৮+৪--জাইবার না দিলি। মথুরার হাটে ল। দানছলে রোধসি। বাটে।
গোপীগণ সঙ্গে আহ্মে। ছচ্ছন্দে বুলিলোঁ ল। বিকো জাওঁ মথুরার। হাটে।

দুই পার্শ্বে মিল-দেওয়া সম্পূর্ণাঙ্গ দীর্ঘ ত্রিপদীও কৃষ্ণকীর্ত্তনে পাওয়া যায়। তবে এই ছন্দে অনেকস্থলে মাত্রার নিয়ম রক্ষা করা হয় নাই।

৮+৮+(৮+২)১০—

পামরি হেনারি নারী। হআঁ বড় [illegible] ছিনরী।
অসহন বোলহ সকলে।
তোর ভাল বিত নহে। কে তোহোর হেন সহে।
দান লৈলোঁ ধরিআ অকলে।
আইহন সে জীএ কিকে। হেন নারী পাঠাএ বিকে।
[illegible] ধনের কাতরে॥

যার ঘরে হেন নারী। সে কেহে ধনভিখারী।
তোহ্মা বান্ধা দেউ মোর ঘরে।

রাধা-বিরহের—আছিলোঁ সোঁ শিশুমতী—না জানি গো রঙ্গবতী—ইত্যাদি পদটি এই ছন্দের প্রায় নির্খুত নিদর্শন। ভুজযুগ ধরি কাহ্নে আল কৈল আলিঙ্গনে—পদটিতে অনিয়মিত হইলেও ৮+৮+৮+৬ অক্ষরের দীর্ঘ ত্রিপদী ছন্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

প্রাকৃত দোহা ছন্দের অনুসরণও ২।১টি পদে দেখা যায়। দোহা ছন্দের নিয়ম কবি কাঁটায় কাঁটায় রক্ষা করিতে পারেন নাই।

৮+৬+৮+৪—পূরুব জরমে। কাহ্নাঞি ল। আল আছিলোঁ তোর। নারী।
ইহ জরমে কেবা। পাতিআএ। আপণে বুঝহ মু। রারী।
মো নাহিঁ নাশি তোর। বৃন্দাবনে। সুনল সুন্দর কা। হ্নাই।
পথিক লোক তাক। উপভোগল। তাত মোর দোষ। নাই॥

কবির লঘু ত্রিপদী ছন্দটি বড়ই অনিয়মিত। ইহাতে দীর্ঘস্বরকে কখনও কখনও দুইমাত্রা ধরা হইয়াছে—অনেকস্থলে পদাংশকেও (Syllable) একমাত্রায় ধরা হইয়াছে—ফলে অক্ষর-মাত্রা, স্বরমাত্রা ও পদাংশমাত্রা—তিন প্রকার মাত্রারই সমবায় হইয়াছে—ইহার ফলে এই ছন্দের কবিতাগুলি একেবারেই সুশ্রাব্য নয়। মাঝে মাঝে সুনিয়মিত পংক্তিও পাওয়া যায়।

প্রাচীন লঘুত্রিপদী—চারি দিগেঁ তরু। পুষ্প মুকুলিল। বহে বসন্তের। বাএ
আম্বডালে বসি। কুয়িলী কুহলে। লাগে বিষবাণ। ঘাএ

বর্ত্তমান যুগের " —হাসিতেঁ খেলিতেঁ। গোপনারীগণ। লাগিলা যমুনা। তীরে
কাহ্নাইর মুখ। কমল দেখিআঁ। কেহো না ভরিল। নীরে।

প্রাকৃত রূপের অনুস্মৃতি—পাইল রাধা। কালীদহকূলে। লইআঁ সখি-স। মাজে
ঘাটত ভেটিল। নান্দের পো। কাজ না বুঝিল। লাজে।

ত্রিপদী ছন্দের অধিকাংশ স্থলে এই তিন রীতির মিশ্রণ ঘটিয়াছে।

এই বড়ু চণ্ডীদাস পদাবলীও রচনা করিয়াছিলেন কিনা ইহা লইয়া ঘোরতর বাদানুবাদ হইয়াছে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ হইতে প্রকাশিত চণ্ডীদাসের পদাবলীতে ডাঃ সুনীতিকুমার ও হরেকৃষ্ণ বাবু বহু সতর্কতার সহিত চণ্ডীদাসের শতশত পদ হইতে ২৪টি পদকে বড়ু চণ্ডীদাসেরই রচনা বলিয়া নির্বাচন করিয়াছেন। ভাবে, ভাষায় বিষয়বস্তুর অবতারণার প্রকারে ও অলঙ্কারে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের সহিত যে পদগুলির সাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়াছেন কেবল সেই পদগুলিকে বড়ু চণ্ডীদাসের বলিয়া তাঁহারা গ্রহণ করিয়াছেন। ডাঃ শহীদুল্লাহ সাহেব কেবল ভণিতার দিক হইতে বিচার করিয়া ঐ ২৪টি পদের অধিকাংশকেই বড়ু চণ্ডীদাসের নয় বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে দীন চণ্ডীদাসের পদাবলী প্রকাশিত হইয়াছে। এই দীন চণ্ডীদাস শ্রীচৈতন্যের বহুপরে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ইঁহার রচনা অপকৃষ্ট শ্রেণীর। চণ্ডীদাসের নামে প্রচলিত উৎকৃষ্ট পদগুলিকে ইঁহার রচিত বলিয়া কেহই স্বীকার করেন না। ফলে চণ্ডীদাসের নামে প্রচলিত পদগুলির জন্য ইঁহারা দ্বিজ চণ্ডীদাস বলিয়া তৃতীয় চণ্ডীদাসের কল্পনা করিয়াছেন। এই চণ্ডীদাস বড়ু ও দীনের মাঝামাঝি সময়ে আবির্ভূত হইয়া থাকিবেন। ইতিমধ্যে ইঁহাদের বিচারে চণ্ডীদাসের নামে প্রচলিত বহু পদ অন্যান্য কবির ভণিতায় কোথাও না কোথাও পাওয়া যাওয়ার জন্য সেগুলিকে কোন চণ্ডীদাসেরই নয় বলিয়া ইঁহারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। বড়ু চণ্ডীদাসের সম্বন্ধে পদাবলীর কোন পদেরই আলোচনা নিরাপদ নয় বলিয়া মনে করি।

গোবিন্দদাস

গোবিন্দদাসের পরিচয় নরহরিদাসের পদের দ্বারাই দেওয়া যাইতে পারে।—

রামচন্দ্র কবিরাজ বিখ্যাত ধরণীমাঝ তাহার কনিষ্ঠ শ্রীগোবিন্দ।
চিরঞ্জীব সেন পুত কবিরাজ নামে খ্যাত শ্রীনিবাস শিষ্য কবিচন্দ।
তেলিয়া বুধরিগ্রামে জন্মিলেন শুভক্ষণে মহা শাক্ত বংশে * দুইভাই।
পরে পিতৃধর্ম্মত্যাগী ঘোরতর পীড়া লাগি বৈষ্ণব হইলা দোঁহে তাই।
হইল আকাশবাণী কহিলেন কাত্যায়নী গোবিন্দ গোবিন্দপদ ভজ।
বিপত্তে মধুসূদন বিনে নাই অন্যজন সার কর তাঁর পদরজ।
শ্রীখণ্ডের দামোদর কবিকুলে শ্রেষ্ঠতর গোবিন্দের হন মাতামহ।
সুরগুরু সঙ্গে যার তুলনায় বারবার লোকে যশ গায় অহরহ।
বুঝি মাতামহ হৈতে কবিকীর্ত্তি বিদিমতে পাইলা গোবিন্দ কবিরাজ।
কহে দীন নরহরি তাই ধন্য ধন্য করি গায় গুণ পণ্ডিত-সমাজ।

অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থ হইতে বুঝা যায়—শ্রীখণ্ডেই গোবিন্দদাসের জন্ম। বাড়ী কুমারনগর, তেলিয়া বুধরিগ্রামে পরে বাস করেন।

* গোবিন্দদাস যে প্রথম জীবনে শাক্ত ছিলেন তাহার প্রমাণ স্বরূপ একটি পদ হরেকৃষ্ণবাবু বৃন্দাবনদাসের রস-নির্য্যাস হইতে উৎকলিত করিয়াছেন—

হেমহিমগিরি দুই তনু ছিরি আধ নর আধ নারী।
আধেক উজর আধ কাজর তিনই লোচন ধারী।
না দেব কামিনী না দেব কামুক কেবল প্রেম পরকাশ।
গৌরীশঙ্কর চরণে কিঙ্কর কহই গোবিন্দদাস।

এই পদ হইতে গোবিন্দদাসের পরিকল্পিত কামগন্ধহীন বিশুদ্ধ প্রেমের একটি মনোরম

[illegible] তিন জন। একজন গোবিন্দদাস ঝা ইনি মিথিলার কবি। বিদ্যাপতির অনুসরণে ইঁহার লিখিত মৈথিলী ভাষার কয়েকটি পদ বঙ্গদেশেও প্রচলিত আছে। আর একজন গোবিন্দদাস চক্রবর্ত্তী। ইনিও পদকর্ত্তাদের মধ্যে বিখ্যাত কবি। ইঁহার রচিত পদগুলি প্রধানতঃ বাঙ্গালাভাষায় লিখিত। তৃতীয় গোবিন্দদাস তেলিয়া বুধরি (মুর্শিদাবাদ) গ্রাম নিবাসী ভক্ত রামচন্দ্র কবিরাজের ভ্রাতা। শ্রীখণ্ডে মাতুলালয়ে ইঁহার জন্ম ও প্রতিপালন। গোবিন্দদাস বাংলায় ২।৪টি ও ব্রজবুলিতে বহু পদ রচনা করিয়াছেন। গোবিন্দ দাস বঙ্গের একজন মহাকবি। ইঁহার পদাবলীর কবিত্ব ভক্তির আতিশয্যে অভিভূত হয় নাই। নিজে খুব বড় ভক্ত ছিলেন বটে, কিন্তু ইনি ভক্তির ভাবাকুলতা সংবরণ করিতে পারিতেন। ফলে, ইঁহার পদে কবিত্বের অবাধ স্ফুরণ হইয়াছে। গোবিন্দদাসের কবিত্ব প্রাণের গভীর আকূতির স্বতঃস্ফূর্ত্ত বিকাশ নয়—সেজন্য বিরহের কবি চণ্ডীদাসের কবিত্ব-মহিমা তিনি লাভ করিতে পারেন নাই। গোবিন্দদাসের কবিতায় ভাবানন্দের সহিত বোধানন্দের মিলন ঘটিয়াছে। পদরচনাকে ইনি আর্টের পর্য্যায়ে উত্তীর্ণ করেন। কবিতার বহিরঙ্গের সৌষ্ঠব-সাধনে কবির কোথাও অঙ্গহানি হয় নাই। যেমন ছন্দের বৈচিত্র্য, তেমনি পদবিন্যাসের চাতুর্য্য, তেমনি ভাব-প্রকাশের কৌশল, তেমনই আলঙ্কারিকতা। কোথাও কোথাও অনুপ্রাস, যমক ইত্যাদি শব্দালঙ্কারের আতিশয্যে ও অর্থালঙ্কারের জটিলতায় তাঁহার কোন কোন পদ পঙ্গু হইয়া পড়িয়াছে একথা স্বীকার করিতে হইবে। স্থলে [illegible] Strained

চিত্র পাওয়া যায়। গোবিন্দদাস যে ব্রজলীলা বর্ণনার আগেই ব্রজবুলিতে গৌরীশঙ্করের মহিমা গান করিতেন—তাহারও প্রমাণ পাই। সেকালে ব্রজবুলিই সকলপ্রকার কবিতা রচনার ভাষা হইয়া পড়িয়াছিল।

গোবিন্দদাসের মাতামহ দামোদর একজন বড় কবি ও পণ্ডিত ছিলেন। জ্যেষ্ঠভ্রাতা রামচন্দ্র কবিরাজও একজন ভক্ত ও পণ্ডিতলোক ছিলেন।

Mataphorও আছে। গোবিন্দদাস তাঁহার পদে অর্থশ্লেষ, রূপকালঙ্কার, কাব্যলিঙ্গ, মালারূপক, অতিশয়োক্তি, বিষম, সূক্ষ্ম, সন্দেহ, মীলিত, লুপ্তোৎপ্রেক্ষ. ইত্যাদি অর্থালঙ্কারের ভূরি ভূরি প্রয়োগ করিয়াছেন। উপমা যদি কালিদাসস্য হয়, তবে উৎপ্রেক্ষা গোবিন্দদাসস্য বলিতে হয়। গোবিন্দদাসের কবিতায় সংস্কৃত কবিদের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রভাব দৃষ্ট হয়। তিনি বহু সংস্কৃত শ্লোককে পদের রূপ দান করিয়াছিলেন—বহু সংস্কৃত কবির অলঙ্কার তিনি প্রয়োগ করিয়াছেন এবং বহু সংস্কৃত কবি প্রৌঢ়োক্তি তাঁহার কাব্যে স্থান পাইয়াছে। বিদ্যাপতির কাছেও গোবিন্দদাস ঋণী, শুধু ভাষা ও ছন্দের জন্য নয়—বিদ্যাপতির রচনাভঙ্গী ও পদবিন্যাস-চাতুর্য্যও তিনি অধিগত করিয়াছিলেন—অবশ্য বহুস্থলেই শিষ্য গুরুকে ছাড়াইয়া গিয়াছেন। ছন্দ ও পদলালিত্যের জন্য গোবিন্দদাস জয়দেবের কাছেও ঋণী। বিদ্যাপতির মত গোবিন্দদাস সম্ভোগের কবি, উল্লাসরসের কবি। রাসারম্ভের "শরদচন্দ্র পবনমন্দ বিপিনে ভরল কুসুমগন্ধ ফুল্ল মল্লী মালতীযূথী মত্ত মধুপ ভোরনি" ইত্যাদি পদের মত উল্লাস রসের পদ পদাবলী-সাহিত্যেও নাই। 'বাজত ডম্ব রবাব পাখোয়াজ' একটি উল্লাসের পদ। গোবিন্দদাস অভিসারের কবি। জ্যোৎস্নাভিসার, দিবাভিসার, গ্রীষ্মাভিসার, তিমিরাভিসার ইত্যাদি অভিসারের এত বৈচিত্র্য কাহারও পদে দেখা যায় না। বঙ্গীয় পদকর্ত্তাদের মধ্যে গোবিন্দদাসের মত ধাৎসারনী স্বাধীনতা কাহারও পদে দেখা যায় না,—প্রকাশের ভাষার আলঙ্কারিকতা ও মণ্ডনকলার গুণে অশ্লীলতা ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে। গোবিন্দদাসের রূপানুরাগ, রূপোল্লাস, রসালস্য, প্রেমবিহ্বলতা, মোহমাদকতা, মিলনাকুলতা ও স্বপ্নমাধুর্য্যের পদগুলি জগতের সাহিত্যভাণ্ডারের সম্পদ। গোবিন্দদাসের গোষ্ঠবিহারের পদও চমৎকার। গোবিন্দদাসের গৌরচন্দ্রিকা গানে যে ছন্দ, অলঙ্কার ও পদবিন্যাসের ঐশ্বর্য্য তাহা যদি কেহ বুঝে তবে কীর্ত্তনীয়ার মৃদঙ্গই বুঝে। চাতুর্য্যের দ্বারা যে কতটা মাধুর্য্যের সৃষ্টি করিতে

পারা যায় তাহা গোবিন্দদাস দেখাইয়াছেন। প্রতাপাদিত্যের মত পাষাণও যে এই গানে গলিয়া যাইত—তাহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই।

গোবিন্দদাসের কবিতা যে তাঁহার জীবদ্দশাতেই যথেষ্ট সমাদর লাভ করিয়াছিল—তাহার অনেক প্রমাণ আছে—

অনুরাগ-বল্লীতে দেখিতে পাই—

বড় কবিরাজ ভ্রাতা গোবিন্দ কবিরাজ নাম।
সংক্ষেপে কহিয়ে কিছু তাঁর গুণগ্রাম।
তিঁহো গীত পাঠাইলা শ্রীজীব গোসাঞিের স্থান।
তাহা শুনি ভক্তগণের জুড়ায় পরাণ।
গোসাঞি সগণ তাহা কৈল আস্বাদন।
বিচারিয়া-দেখ দিয়া নিজ নিজ মন।

আমরা ভক্তি-রত্নাকরে দেখিতে পাই—

গোবিন্দ শ্রীরাম চন্দ্রানুজ ভক্তিময়।
সর্ব্বশাস্ত্রে বিজ্ঞ কবি সবে প্রশংসয়।
শ্রীজীব শ্রীলোকনাথ আদি বৃন্দাবনে।
পরমানন্দিত যাঁর গীতামৃত পানে।
কবিরাজ খ্যাতি সবে দিলেন তথাই।
কত শ্লাঘা কৈল শ্লোকে ব্রজস্থ গোসাঁই।

সেই শ্লোকটি এই—

শ্রীগোবিন্দ কবীন্দ্র চন্দনগিরেশ্চঞ্চদ্বসন্তানিলৈ-
রানীতঃ কবিতাবলী-পরিমল কৃষ্ণেন্দু সম্বন্ধভাক্।
শ্রীমজ্জীব মুরারি-পাদ্মরজুষো ভৃঙ্গান্ সমুন্মাদয়ন্
সর্ব্বস্যাপি চমৎকৃতিং ব্রজবনে চক্রে কিমস্মৎ পরম্॥

কবি নরহরি বলিয়াছেন—

শ্রীগোবিন্দ কবীন্দ্র কৃপানিধি ধীর মহামন গৌর চরিত্র।
নির্ম্মল প্রেম প্রচার চারুগুণ যাক কাব্য করু ভুবন পবিত্র।

কবিবল্লভ একটি পদে তাঁহাকে দ্বিতীয় বিদ্যাপতি বলিয়াছেন—

শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ বন্দিত কবিসমাজ কাব্যরস অমৃতের খনি।
বাগ্দেবী যাঁহার দ্বারে দাসীভাবে সদা ফিরে অলৌকিক কবিশিরোমণি।
ব্রজের মধুর লীলা যা শুনি দরবে শিলা গাইলেন কবি বিদ্যাপতি।
তাহা হতে নহে ন্যূন গোবিন্দের কবিত্বগুণ গোবিন্দ দ্বিতীয় বিদ্যাপতি।
অসম্পূর্ণ পদ বহু রাখি বিদ্যাপতি পহুঁ পরলোকে করিলা গমন।
গুরুর আদেশ ক্রমে শ্রীগোবিন্দ ক্রমে ক্রমে সে সকল করিল পূরণ।
এমন সুন্দর তাহা আচার্য্য-রত্ন শুনি যাহা চমৎকার ভাবে মনে মনে।
তাই গুরু মহানন্দে কবিরাজ শ্রীগোবিন্দে উপাধিটি করিলা প্রদানে।
গোবিন্দের কবিত্বশক্তি সাধন ভজন ভক্তি অতুলন এমহী মণ্ডলে।
ধন্য শ্রীগোবিন্দ কবি কবিকুলে যেন রবি এ বল্লভ দঢ় করি বলে।

আলঙ্কারিকতার জন্য গোবিন্দদাস বঙ্গসাহিত্যে অপরাজেয়। অলঙ্কৃত করিয়া না বলিলে কোন বক্তব্য কাব্য হইয়া উঠে না তাহাই তাঁহার বিশ্বাস ছিল। বঙ্গভাষাকে তিনি অতি দুর্লভ অলঙ্কারে মণ্ডিত করিয়া রাজরাজেশ্বরী রূপ দিয়াছিলেন। তাঁহার এই আলঙ্কারিকতা কালিদাস বা রবীন্দ্রনাথের মত স্বাভাবিক ভাবে প্রবুদ্ধ হয় নাই। মনে হয় তিনি অলঙ্কারশাস্ত্রের পুস্তক,—বিশেষতঃ উজ্জ্বলনীলমণি, রসমঞ্জরী, অলঙ্কারকৌস্তুভ ইত্যাদি রসশাস্ত্রের পুস্তক মন দিয়া অধ্যয়ন করিয়া অলঙ্কার-প্রয়োগে পারদর্শী হ'ন। অনেক সময় মনে হয়, অলঙ্কার-প্রয়োগের কৃতিত্ব প্রকাশের জন্যই কোন কোন পদ রচনা করিয়াছেন। অনলঙ্কৃত সরল ভাষায় বৃন্দাবনলীলার কোন কোন অঙ্গকে প্রকাশ করিলে তাহা অশ্লীল হইয়া উঠে, গোবিন্দদাস

বৃন্দাবনলীলার অতি গুহ্যতম অংশকেও বাণীরূপ দিয়াছেন—কিন্তু আভরণের আবরণে সে সমস্ত বিশেষ অশ্লীল হইয়া উঠিতে পারে নাই।

গোবিন্দদাসের অলঙ্কার কঠোর স্বর্ণহীরকের অলঙ্কার নয়—ফুলের অলঙ্কার। তাই ইহার সৌরভ আছে। অলঙ্কারগুলির ব্যঞ্জনা ও ধ্বনিই এই সৌরভ। কবির একটি ব্যঞ্জনাগর্ভ পদের এখানে উদাহরণ দিই—এখানে সুরভিত অলঙ্কারের পরিচয় পাওয়া যাইবে—

আধক আধ আধ দিঠি অঞ্চলে যবধরি পেখলুঁ কান।
কতশত কোটি কুসুমশরে জর জর রহত কি যাত পরাণ।
সজনি, জানলুঁ বিধি মোহে বাম।
দুহুঁ লোচন ভরি যো হরি হেরই তছু পায়ে মঝু পরণাম।
সুনয়নি কহত কানু ঘনশ্যামর মোহে বিজুরি সম লাগি।
রসবতি তাক পরশরসে ভাসত হামারি হৃদয়ে জলু আগি।
প্রেমবতি প্রেম লাগি জিউ তেজত চপল জিবনে মঝু সাধ।
গোবিন্দদাস ভণে শ্রীবল্লভ জানে রসবতি রস মরিযাদ॥

ভাবাকুলতার সংযমের সহিত অলঙ্কার প্রয়োগের ফলে গোবিন্দদাসের পদে যেরূপ পারিপাট্য ও পরিচ্ছন্নতার সৃষ্টি হইয়াছে এরূপ কোন বৈষ্ণব কবির কাব্যে দৃষ্ট হয় না। গোবিন্দদাসের অনেক পদে অলঙ্কার-প্রয়োগেরও ক্রম-শৃঙ্খলা দৃষ্ট হয়।

১। ভীতক চিতভুজগ হেরি যো ধনি চমকি চমকি ঘন কাঁপ
অব আঁধিয়ারে আপন তনু ঝাঁপই কর দেই ফণিমণি ঝাঁপ।
মাধব, কি কহব তুয়া অনুরাগ।
তুয়া অভিসারে অবশ নব নাগরি জীবই বহু পুন ভাগ॥
যো পদতল থলকমল সুকোমল ধরনি পরশে উপচঙ্ক।
অব কণ্টকময় সঙ্কট বাটহি আয়ত যায়ত নিঃশঙ্ক।

মন্দির মাঝ সাজ নাহি তেজত দেহলি মানয়ে দূর।
অব কুহু যামিনি চলয়ে একাকিনি গোবিন্দদাস কহ ফূর।

২। যোমুখ চান্দ নয়নে নাহি হেরলুঁ নয়ন দহন ভেল চন্দ।
সোই মধুর বোল শ্রবণে না শুনলুঁ মধুকর ধনি ভেল দন্দ।
যো কর কিসলয় পরশ উপেখলুঁ অব কিসলয়ে তনু ফোর।
নব নব মেহ সুধারস নিরসলুঁ গরলে ভরল তনু মোর।
সো কর বিরচিত হার উপেখলুঁ হার ভুজঙ্গম ভেল।
গোবিন্দ দাস কহ সো অতিতুরগহ যো ঐছন মতি দেল।

এই দুইটী পদের পংক্তিপরম্পরা সম্পূর্ণ আলঙ্কারিক ক্রম (Rhetorical Sequence) অবলম্বনে রচিত। একই অলঙ্কারের মালিকা। অলঙ্কার ও ফুরাইল পদও শেষ হইল। এখানে আবেগাত্মক (Emotional Sequence) ক্রম আলঙ্কারিক ক্রমের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এই Rhetorical Sequence এর দৃষ্টান্ত—'ভাল ভেল মাধব তুঁহু রহুঁ দূর।' পদটিতেও দেখা যায়। কবি এই ক্রম-শৃঙ্খলা সংজ্ঞাবাচক শব্দের বিশিষ্টার্থক সুপ্রয়োগেও রক্ষা করিয়াছেন—নামহি অক্রূর ক্রূর নাহি যো সম সো আওল ব্রজমাঝ এই পদটি তাহার দৃষ্টান্ত। গোবিন্দ দাসের অধিকাংশ রচনার Sequenee Emotional নয়, Intellectual ও নয়—Rhetorical. অলঙ্কৃত বাক্যধারায় নিজস্ব একটা ক্রম আছে—গোবিন্দদাস সেই ক্রমই অবলম্বন করিয়াছেন—আলঙ্কারিক ভঙ্গী যে ভাবে কবিকে পরিচালিত করিয়াছে—কবির লেখনী সেই ভাবেই চলিয়াছে। অলঙ্কারের দিক হইতেই ইহাদের উৎকর্ষের সন্ধান করিতে হইবে।

গোবিন্দদাসের আলঙ্কারিকতার উদাহরণ—

রূপক-মূলক কাব্যলিঙ্গ—

যো তুহুঁ হৃদয়ে প্রেমতরু রোপলি শ্যাম জলদরস আশে।

যো অব নয়ন নীর দেই সীচহ কহতহি গোবিন্দদাসে।
তব অপেয়ানে কয়লি তুহুঁ ঐছন অব সুপুরুষ বধ জান।
উচ কুচ চুম্বক সরস পরশ দেই উদঘাটহ দিঠি বান।

শ্লেষ—কাননে কুসুম তোড়সি কাহে গোরি·········পূজহ পশুপতি নিজ তনুদান ইত্যাদি পদটি শ্লেষের একটি বিশিষ্ট উদাহরণ। আর একটি উদাহরণ—

সৌরভে আগরি রাই সুনাগরি কনকলতা সম সাজ।
হরি চন্দন বলি কোলে আগোরল কৃষ্ণে ভুজঙ্গম রাজ।

শ্লেষ—যা কর লাগি মনহি মন গোই। গঢ়ল মনোরথ না চঢ়ল সোই।

অতিশয়োক্তি—এসখি শ্যাম সিন্ধু করি চোর
কৈছে ধরলি কুচ কনয় কটোর।

মালারূপক—অধর পবার দশন মণি জ্যোতি
রোচন তিলক মৈনাকক জ্যোতি।

শ্লেষমূলক বিষমালঙ্কার—

যো গিরি গোচর বিপিন হি সঙ্কট কুশ কটি কর অবগাহ।
চন্দ্রক চারু শটা পরিমণ্ডিত অরুণ কুটিল দিঠি চাহ।
সুন্দরি, ভালে তুহুঁ হরিণ নয়ানি
সো চঞ্চল হরি হিয়া পিঞ্জর ভরি কৈছনে ধরলি সেয়ানি।

সূক্ষ্ম অলঙ্কার—

বিঘটি মনোরথ আন চপল হরি তাহি তুহুঁ সঙ্কেত রা...,
কুসুম হার অরু মুকুলিত সরসিজ গোবিন্দদাস এক সাখী।

মালোপমা—

তনু তনু মীলনে উপজল প্রেম। মরকত যৈছন বেড়ল হেম।
কনকলতায় জনু তরুণ তমাল। নব জলধরে জনু বিজুরি রসাল।
কমলে মধুপ যেন পাওল সঙ্গ। দুহুঁ তনু পুলকিত প্রেম-তরঙ্গ।

সামান্য -

চান্দ নিরঞ্জনি উজোরোলি গোরি। হরি অভিসার বড় সরস ভোরি।
ধবল বিভূষণ অম্বর বনই। ধবলিম কৌমুদি মিলিত তনু চলই।
হেরইতে পরিজন লোচন ভুর। রঙ্গ পুতলি কিয়ে রস মাহা বুর।

[জ্যোৎস্নার মধ্যে ধবলবসনা গৌরাঙ্গী রাধিকাকে চেনা যাইতেছে না। যেন রাঙের পুতুল পারদের মধ্যে ডুবিয়াছে।]

রূপক—

(১) বেণুক ফুকে ফুকে মদনানল কুল ইন্ধন মাহাজারি।
দরশ পানি দুহুঁ পরশে সোহাগল প্রমজল জোরনবারি।

(১) কিয়ে করব কুল বিবস দীপ তুল প্রেমপবনে ঘন ডোল।
গোবিন্দ দাস যতন করি রাখত লাজক জালে আগোল॥

(৩) নীরদ নয়নে নীর ঘন সিঞ্চনে পুলক মুকুল অবলম্ব।
স্বেদ মকরন্দ বিন্দু বিন্দু চুয়ত বিকসিত ভাবকদম্ব।

* * *

চঞ্চল চরণ কমলদলে ঝঙ্করু ভকত ভ্রমরগণ ভোর।

সাঙ্গরূপক—মাধব মনমথ ফিরত আহেরা।
একলি নিকুঞ্জে ধনি ফুলশরে জরজর পন্থ নেহারত তেরা।
ইত্যাদি পদ।

শ্লিষ্ট রূপক—কিসলয় দহন সেজ অব সাজহ আহুতি চন্দন পঙ্কা।
দ্বিজকুল নাদমন্ত্রে তনু জারব দূরে যাউ প্রেম কলঙ্কা॥

পরম্পরিত রূপক—

অম্বরে উয়ল শ্যামর ইন্দু। উছলল মনহিঁ মনোভব সিন্ধু॥

ভ্রান্তি—হরি হরি বোলি ধরনি ধরি উঠই বোলত গদগদ ভাখ।
নীল গগন হেরি তোহারি ভরমভরে বিহি সঞে মাগয়ে পাখ।

সমুচ্চয়—কামিনি করি কোন বিহি নিরমায়ল তাহে পুন কুল মরিযাদ
তাহে পুন হরি সঙ্গে নেহ ঘটায়ল তাহে বিঘটন পরমাদ ॥

পর্য্যায়োক্ত

এবহুঁ বিপদে জিউ রহয়ে একান্ত। বুঝলুঁ নেহারত লায়ক পন্থ ॥

বিশেষোক্তি—

হৃদয় বিদারত মনমথ বাণ। কো জানে কাহে নহত দুই ঠাম।
জলু বিরহানল মন মাহা গোয়। কঠিন শরীর ভসম নাহি হোয় ॥

ব্যাজস্তুতি (১) পুর নাগরি সঙ্গে রসিক শিরোমণি পূরহ মনমথ কেলি।
বনচরি নারি তোহারি গুণ গাওব পুতনিক সঙ্গে মেলি।
(২) ভাল ভেল মাধব তুহুঁ রহুঁ দূর।
অযতনে ধনিক মনোরথ পুর ইত্যাদি।

সন্দেহ—(১) সবে নাহি সমুঝিয়ে নিকর রীত।
কিয়ে শীতল কিয়ে তপত চরীত।
গোবিন্দদাস কহ এতহুঁ সংবাদ।
তছু জিবন দুহুঁ ধনিক বিবাদ।
(২) ঘন ঘন চুম্বনে লুবধ ভেল তুহুঁ বিগলিত স্বেদ উদবিন্দু
হেরি হেরি মরম ভরম পরিপূরল কো বিধুমণি কো ইন্দু।

মীলিত—কুন্দ কুসুমে ভরু কবরিক ভার। হৃদয়ে বিরাজিত মোতিম হার।
ধবল বিভূষণ অম্বর বনই। ধবলিম কৌমুদি মি তছু চলই।

উৎপ্রেক্ষামূলক ব্যতিরেক—

ভালে সে চন্দন চান্দ কামিনী মোহন ফান্দ
আন্ধারে করিয়া আছে আলা।
মেঘের উপর কিবা সদাই উদয় করে
নিশি দিশি শশি-ষোলকলা।

বিনোক্ত—তনুমন জোরি গোরি তোহে সোঁপল কনয়া জড়িত মণিরাজ।

গোবিন্দ দাস ভান কনয়া বিহনে মণি কবহুঁ হৃদয়ে নাহি সাজ।

ধ্বনিগর্ভ সামান্য অলঙ্কার—

যাবক চীত চরণ পর লীখই মদনপরাজয় পাত।

গোবিন্দদাস কহই ভালে হোয়ল কামুক অরেকত হাত।

[রক্তবর্ণ হস্তে আলতার দাগ বুঝা যাইবে না।]

নিদর্শনা—রসিক শিরোমণি নাগর-নাগরী লীলা স্ফুরব কি মোয়।

জনু বাউন করে ধরব সুধাকর পঙ্গু চড়ব কিয়ে শিখরে।

অন্ধ ধাই কিয়ে দশদিশ খোজব মিলব কল্পতরু নিকরে।

ব্যতিরেক—(১) জলদহি জলদ বিজুরি দিঠিলোপক মরকত কনয় কঠোর।

এ দুহুঁ তনু মন নয়ন রসায়ন নিরুপম নওল কিশোর।

(২) চল চল সজল জলদ তনু শোহন মোহন অভরণ সাজ।

অরুণ নয়ন গতি বিজুরি চমক জিতি দগধল কুলবতি লাজ।

পরিণাম—যাঁহা যাঁহা অরুণ চরণে চলি যাত। তাঁহা তাঁহা ধরণী হউ

মঝু গাত। যো দরপণে পহু নিজ মুখ চাহ। মঝু অঙ্গ জ্যোতি

হউ তছু মাহ। ইত্যাদি—

রূপকাত্মক পর্য্যায়—

মনমথ মকর চরহি ভর কাতর মঝু মানস হ্রদ কাঁপ।

ভুয়া হিয়ে হার-তটিনি তটে কুচ ঘট উছলি পড়ল দেই ঝাঁপ।

পুন দেই ঝাঁপ পড়ল যব আকুল নাভি সরোবর মাহ।

তাহি লোমাবলি ভুজগি সঙ্গ ভয়ে ত্রিবলি বেণি অবগাহ।

উপমাত্মক—

নীল অলকাকুল অনিলে হিলোলত নীলতিমিরে চলু গোই।

নীল নলিনি জনু শামর সায়রে লখই না পারই কোই।

শ্লিষ্ট বিরোধাভাস—তৈখনে দক্ষিণ পবন ভেল বাম
সহই না পারিয়ে হিমকর নাম।

সংসৃষ্টি—অব কিয়ে করব উ-পায়
কালভুজগ কোরে ছোড়ি মৃগধি সখি গমন যুগতি না যুয়ায়।
চন্দ্রকচারু ফণাগণ মণ্ডিত বিষ বিষমাকুল দীঠ।
রাইক অধর লুবধ অনুমানিয়ে দশনক দংশন মীঠ।
[বিশেষোক্তি, বিভাবনা, অপহ্নুতি ইত্যাদি অলঙ্কারের মিশ্রণ।]

পুনরুক্তবদাভাস যুক্ত বিরোধাভাস—
বিগলিত অম্বর সম্বর নহে ধনী সুরঙ্গতা ঝরে নয়নে।
কমলজ কমলেই কমলজ ঝাঁপল সোই নয়নব[illegible]নে।

উৎপ্রেক্ষা—
ঘনঘন ঝাঁপর কুচগিরি কাঁচর হাসি হাসি তহি পুন হেরি।
জনু মধু মন হরি কনয়া কুম্ভ ভরি মুদরি রাখিল কত বেরি।

ধ্বনিগর্ভ অতিশয়োক্তি—
(১) কোমল চরণ চলত অতি মন্থর উতপত বালুক বেল।
হেরইতে হামারি সজল দিঠি পঙ্কজ তুহুঁ পাদুক করি নেল।
(২) আধক আধ আধ দিঠি অঞ্চলে যব ধরি পেখলুঁ কান
কতশত কোটি কুসুমশরে জরজর রহত কি যাত পর

বিষমালঙ্কার—
(১) চান্দ নেহারি চন্দনে তনু লেপই তাপ সহই না পার।
ধবল নিচোল বহই না পারই কৈছে করব অভিসার।
যতনহি মেঘমল্লার আলাপই তিমির পয়ান গতি আশে।
আওত জলদ ততহি উড়ি যাওত উতপত দীঘ নিশাসে।
(২) যো কর বিরচিত হার উপেখলুঁ হার ভুজঙ্গম ভেল।

অসঙ্গতি—

পদনখ হৃদয়ে তোহারি। অন্তর জ্বলত হামারি॥
অধরহিঁ কাজর তোর। বদন মলিন ভেল মোর।
হাম উজাগরি রাতি। তুয়া দিঠি অরুনিম কাঁতি
হামারি রোদন অভিলাষ। তুহুঁ কহ গদগদ ভাষ।

একাবলী—কুলবতী কোই নয়নে জনি হেরই হেরত পুন জনি কান।
কানু হেরি জনি প্রেম বাঢ়ায়ই প্রেম করই জনি মান।

রূপকাতিশয়োক্তিমূলক উৎপ্রেক্ষা—

সো মুখ চান্দ নয়নে নাহি হেরলুঁ নয়ন দহন ভেল চন্দ ইত্যাদি পদটি।

ভ্রান্তি—সুন্দরি জানলি তুয়া দুরভান।
হরিউর মুকুরে হেরি নিজ ছাহরি তাহে সৌতিনি করি মান। *

গোবিন্দদাস রচনার উপাদান, উপকরণ, পদ্ধতিরীতি ইত্যাদি বিষয়ে প্রচলিত সংস্কার অনুসরণ করেন নাই যে তাহা নয়। রূপবর্ণনায় তিনি প্রচলিত উপমানগুলিকেই গ্রহণ করিয়াছেন, অভিসারের আয়োজন-উপকরণ পূর্ব্ববর্ত্তী কবিদের রচনা হইতেই লইয়াছেন, বিপ্রলব্ধা, খণ্ডিতা, কলহান্তরিতা ইত্যাদি নায়িকার রীতি-প্রকৃতি বিষয়েও নূতনত্ব কিছুই দেখান নাই, মানভঞ্জন,

* এইসঙ্গে আছে—কাহে মিনতি কর কান। তুহুঁ হাম এক পরাণ। শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে সম্ভোগ-চিহ্ন দেখিয়া শ্রীরাধার রোষের অবধি নাই।—এই দুই চরণে কি দারুণ শ্লেষই না ব্যক্ত হইয়াছে! কাব্যপ্রকাশে এই অলঙ্কারের একটি সুন্দর উদাহরণ আছে—গোবিন্দদাস তাহারই অনুসরণ করিয়াছেন।

জস্‌সেঅ বণো তস্‌সেঅ বেঅনা ভণই তং জণো অলিঅম্।
দন্তকুখঅং কবোলে বহুএ বেঅনা সবত্তীণম্॥

[লোকে বলে যার ব্রণ তাহারি বেদনা,—কাজে দেখি ইহা মিথ্যা কথা।
বধূর অধরে হেরি দশনের ক্ষত তবে কেন সপত্নীর ব্যথা?]

সম্ভোগ ও বিরহের বর্ণনায় যে মামুলি রীতি আছে তাঁহার রচনায় তাহার বৈতথ্য দেখি না। গোবিন্দদাসের কৃতিত্ব এই,—পুরাতন উপাদান উপকরণ লইয়া তিনি যে সৃষ্টি করিয়াছেন—তাহা সম্পূর্ণ নূতন বস্তু। অধিকাংশ পদেই তাঁহার নিজস্ব শক্তির একটা মুদ্রাঙ্ক আছে। তিনি অন্যান্য অনেক কবির মত অনুসারক বা অনুকারক মাত্র নহেন—তিনি একজন স্রষ্টা। পুরাতন উপকরণে তিনি অভিনব সৃষ্টি করিয়াছেন। শ্রেষ্ঠ শিল্পীর হাতে পড়িলে চিরপুরাতন বিষয়বস্তু ও উপাদান যে কি রমণীয় রসঘন রূপ ধরিতে পারে—তাহা গোবিন্দদাস দেখাইয়াছেন।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গের যে উপমানগুলি সংস্কৃত কবিরা প্রয়োগ করিয়াছেন—গোবিন্দদাস সেই উপমানগুলিকেই গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু পূর্ব্ববর্ত্তী কবিরা যে মামুলী ব্যতিরেক, উপমা ও উৎপ্রেক্ষার দ্বারা রূপবর্ণনা করিতেন, গোবিন্দদাস তাহা না করিয়া ঐগুলি লইয়া নানা কৌশলের সৃষ্টি করিয়াছেন। যেমন বিরহিণী রাধার প্রসঙ্গে কবি বলিয়াছেন—

এত দিনে গগনে অথিল বহু হিমকর জলদে বিজুরি রহু ধীর।
চামরি চমরু নগরে পরবেশউ মদন ধনুয়া ধরু ফীর ॥
মাধব বুঝলুঁ তোহে অবগাই।
এক বিয়াগে বহুত সিধি সাধলি অতয়ে উপথলি রাই ॥
কুমুদিনিবৃন্দ নিন্দি অব হাসউ বান্ধুলি ধরু নব রঙ্গ।
মোতিম পাঁতি কাঁতি ধরু উজর কুঞ্জর চলু গতি ভঙ্গ

গোবিন্দদাস বিয়োগের কথা বলিয়া এখানে অবশ্য দুর্ব্বল করিয়া ফেলিয়াছেন—বিদ্যাপতি এখানে বিরহিণী রাধিকার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কান্তি শোকে দুঃখে ম্লান হইয়া গিয়াছে এই ধ্বনি লক্ষ্য করিয়া উপমেয় অপেক্ষা উপমানের প্রাধান্যজনিত ব্যতিরেক অলঙ্কারের সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তদ্দ্বারা শিল্পকে ছাড়াইয়া গিয়াছেন।

শরদক শশধর মুখরুচি সোঁপলক হরিণক লোচন লীলা।
কেশ পাশ লয়ে চমরীকে সোঁপল........ ইত্যাদি—

চিকুরে চোরায়সি চামরকাঁতি। দশনে চোরায়সি মোতিম পাঁতি ইত্যাদি পদে বিদ্যাপতির অনুসরণে গোবিন্দদাস একটি কৌশলের প্রয়োগ করিয়াছেন। রূপকাত্মক পর্য্যায় অলঙ্কারের সাহায্যে 'মনমথ মকর ডরহিঁ ডর কাতর' ইত্যাদি পদটিতে কৌশলে মনোমীনের নানা অঙ্গে আশ্রয়ের উল্লেখচ্ছলে রূপবর্ণনার একটি কৌশল দেখাইয়াছেন। 'ঘন রসময় তনু অন্তর গহীন। নিমগন কতহুঁ রমনিমনোমীন,'—এই রূপকাত্মক পদে কৌশলে কবি কতকগুলি উপমাকে গাঁথিয়াছেন অঙ্গসৌষ্ঠব বর্ণনার জন্য। গোবিন্দদাস অনেক সময় বক্তব্যকে জোরালো ও রসালো করিবার জন্য Antithesis এর প্রয়োগ করিয়া Emphasis দিয়াছেন। বিদ্যাপতির অনুসরণ হইলেও এই ধরণের রচনারীতি তাঁহার নিজস্ব। ভীতকচীত ভুজগ হেরি,·......কুলমরিযাদ কপাট উদঘাটলুঁ ইত্যাদি পদ ইহার দৃষ্টান্ত।

১। যাহে বিছু নিমিখ আধ কত যুগ সম সোঅব আনত যাব।
কঠিন পরাণ অবহুঁ নাহি নিকসয়ে পুন কিয়ে দরশন পাব।
২। আনন্দনীরে নয়ন যব ঝাঁপয়ে তবহি পসারিতে বাহ।
কাঁপয়ে ঘনঘন দৈছে করব পুন সুরতজলধি অবগাহ।

এগুলিও আলঙ্কারিক কৌশলের সুন্দর দৃষ্টান্ত।

কবি প্রত্যেক পংক্তিকে অলঙ্কৃত ও ভাবগর্ভ করিয়া প্রকাশ করিতে চাহিয়াছেন বলিয়া তাঁহার রচনা রসঘন হইয়াছে, অবান্তর কথা একেবারে নাই, তরল সুলভ বাক্যের পদে স্থান হয় নাই—বক্তব্যের ব্যাখ্যান বা বিশদ বিবৃতি পদের মধ্যে নাই—চরণগুলিতে ব্যঞ্জনা প্রচ্ছন্ন আছে—বাগ্‌বিন্যাসে আতিশয্য নাই—দীনতাও নাই। ইহাতে স্থলে স্থলে প্রসাদগুণের অভাব

হয়ত হইয়াছে—কিন্তু রচনা হইয়াছে গাঢ়বন্ধ,—শ্রেষ্ঠ সংস্কৃত কবিদের ঘন-গুম্ফিত শ্লোকের ন্যায়।

কবি চাতুর্য্যের সহিত মাধুর্য্যের অপূর্ব্ব সমন্বয় ঘটাইয়াছেন। এই শ্রেণীর পরিপাট্য, পরিচ্ছন্নতার সহিত মাধুর্য্য সৃষ্টি এক সংস্কৃত কবিদের মধ্যেই দেখা যায়। এখানে কয়টি পদের উল্লেখ করি।

১। কুল মরিযাদ কপাট উদঘাটলুঁ তাহে কি কাঠকি বাধা।
নিজ মরিযাদ সিন্ধু সঞে পঙরলুঁ তাহে কি তটিনি অগাধা॥
সহচরি, মঝু পরিখণ কর দূর।
যৈছে হৃদয় করি পন্থ হেরত হরি সোঙরি সোঙরি মন ঝুর।
কোটি কুসুমশর বরিখয়ে যছুপর তাহে কি জলদজাল লাগি।
প্রেম দহন দহ যাক হৃদয় সহ তাহে কি বজরক আগি॥
যছু পদতলে নিজ জীবন সোঁপলুঁ তাহে কি তনু অনুরোধ।
গোবিন্দদাস কহই ধনি অভিসার সহচরি পাওল বোধ।

২। কণ্টক গাড়ি কমলসম পদতল মঞ্জির চীরহি ঝাঁপি
গাগরি বারি ঢারি করু পীছল চলতহি অঙ্গুলি চাপি
মাধব তুয়া অভিসারক লাগি।
দূতর পন্থ গমন ধনি সাধয়ে মন্দিরে যামিনি জাগি
কর যুগে নয়ন মুন্দি চলু ভামিনি তিমির পয়ানক আশে।
কর কঙ্কণ পণ ফণি মুখ বন্ধন শিখই ভুজগ গুরু পাশে॥
গুরুজন বচন বধির সম মানই আন শুনই কহ আন।
পরিজন বচন মুগধি সম হাসই গোবিন্দদাস পরমাণ।

৩। পদনখ হৃদয়ে তোহারি। অন্তর জলত হামারি।

কাহে মিনতি করু কান। তুহুঁ হাম একই পরাণ।
সবে নহ তনু তনু সঙ্গ। হাম গোরি তুহুঁ শ্যাম অঙ্গ।
অতয়ে চলহ নিজ বাস। কহতহিঁ গোবিন্দদাস।

যে সকল পদে কবি চাতুর্য্য সৃষ্টির কথা ভুলিয়া কেবল মাধুর্য্যের সৃষ্টি করিয়াছেন—তাহার দুই একটির উদাহরণ দিই—

১। দারুণ দৈব কয়ল দুহু লোচন তাহে পলক নিরমাই।
তাহে অতি হরিষে ভুল দিঠি পূরল কৈসে হেরব মুখ চাই।
তাহে গুরু দুরুজন লোচন-কণ্টক সঙ্কট কতহুঁ বিথার।
কুলবতি বাদ বিবাদ করত কত ধৈরজ লাজ বিচার।

২। মাধব কি কহব দৈববিপাক।
পথ আগমন কথা কত না কহিব হে যদি হয় মুখ লাখে লাখ।
মন্দির তেজি যব পদচারি আওলু নিশি হেরি . পত অঙ্গ।
তিমির দুরন্ত পথ হেরই না পারিয়ে পদযুগে বেড়ল ভুজঙ্গ।
একে কুলকামিনি তাহে কুহু যামিনি ঘোর গহন অতিদূর।
আর তাহে জলধর বরিখয়ে ঝর ঝর হাম যাওব কোন পুর।
একে পদপঙ্কজ পঙ্কে বিভূষিত কণ্টকে জর জর ভেল।
তুয়া দরশন আশে কছু নাহি জানলু চির দুখ অব দূর গেল।
তোহারি মুরলি রব শ্রবণে প্রবেশল ছোড়লুঁ গৃহসুখ আশ।
পন্থক দুখ তৃণহুঁ করি না গণলুঁ কহত হি গোবিন্দদাস।

এইগুলি ছাড়া—(১) মোহে উপেখি রাই কৈসে জীয়ব সে দুখ করি অনুমান। রসবতি হৃদয় বিরহ জরে জারব ইথে লাগি বিদরে পরাণ ইত্যাদি (২) নব নব গুণগণ শ্রবণ রসায়ন, নয়ন রসায়ন ইত্যাদি পদ অবিমিশ্র মাধুর্য্যের দৃষ্টান্ত।

অনেক স্থলে অলঙ্কৃতিতে কেবল চাতুর্য্য নয়—নিবিড় মাধুর্য্যও আছে। এগুলি বর্ত্তমান যুগের বিচারেও রসগর্ভ। এগুলি মামুলী ধরণের নয়।

১। চন্দন কেশর মাখা তনু। রঙ্গিণীর প্রাণ বাটি ে আছে জনু।

২। ও মুখ সমুখে ধরি নয়ন অঞ্জলি ভরি পিবইতে করে সাধ।

৩। বিরহক ধূমে ঘুম নাহি লোচনে মোছত উতপত বারি।

৪। অধর সুধা ঝর মুরলি তরঙ্গিনি বিগলিত রঙ্গিনি হৃদয় দুকূল।

৫। ঝর ঝর লোরহি লোহিত কাজর বিগলিত লোচন নিন্দ

৬। রূপকে কূপে মগন ভেল কাম। ৭। মুরলি নিসান শ্রবণ ভরি পিবই।

গোবিন্দদাস প্রধানতঃ চাতুর্য্যের কবি। এই চাতুর্য্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইতে গিয়া তিনি অনেক সময় কৃচ্ছ্রকল্পিত অলঙ্কারের জটিলতারও সৃষ্টি করিয়াছেন। অনেক সময় শ্লিষ্টরূপক ক্লিষ্টরূপকে (Strained metaphor) পরিণত হইয়াছে। নিম্নলিখিত পদগুলি তাহার দৃষ্টান্ত।

১। ঘন রসময় তনু অম্বর গহীন। নিমগন কতহুঁ রমনিমনমীন।

২। কাজর ভমর তিমির জনু তনুরুচি নিবসই কুঞ্জ কু
বাঁশি নিশাসে মধুর বিষ উগরই গতি অতি কুটিল ঝু।

৩। যো গিরি গোচর বিপিনহি সঞ্চরু কৃশ কটি কর অবগা
চন্দ্রক চারু শটা পরিমণ্ডিত অরুণ কুটিল দিঠি চাহ।

৪। বেণুক ফূকে ফূকে মদনানল কুল ইন্ধন মাহাজারি।
পরশ পাণি তুহুঁ পরশে সোহাগল শ্রমজল জোরণ বারি।

৫। আকুল চিকুর চূড়োপরি চন্দ্রক ভালহি সিন্দুর দহনা।
চান্দন চাঁদ মাহা মৃগমদ লাগল তাহে বেকত তিন নয়না।

৬। সহজই গোরি রোখে তিন লোচন কেশরি জিনি মাহা খীন।
হৃদয় পাষাণ বচনে অনুমানিয়ে শৈলসুতাকার চীন।

৭। মনমথ মকর ডরহি ডর কাতর মঝু মানস ঝষ কাঁপ।
তুয়া হিয়ে হার তটিনি তট কুচ উছলি পড়ল দেই ঝাঁপ।

গোবিন্দদাসের ভণিতাতেও বেশ চাতুর্য্য আছে।

১। হুনিক পুতলি তনু মহিতলে শূতলি দারুণ বিরহ হুতাশে।
জীবন আশে শ্বাস বহ না রহ পরিখত গোবিন্দদাসে।

২। তনু মন জোরি গোরি তোহে সোঁপল কনয়া জড়িত মণিরাজ।
গোবিন্দদাস ভনে কনয়া বিহনে মণি কবহু হৃদয়ে নাহি সাজ।

৩। চরণে বেড়ি চারু অরুণ সরোরুহ মধুকর গোবিন্দদাস।

৪। বিহিপায়ে লাগি মাগি নিব এক বর চেতন রহু মঝু দেহ।
... কহই হরি পরশ হি সো পুন হোত সন্দেহ।

৫। গোবিন্দদাস কহ ইথে কি সন্দেহ। কিয়ে বিঘিনি যাহা নূতন নেহ।

৬। কি করব চন্দ চন্দন ঘন লেপন কিসলয় কুসুম শয়ান।
আন বেয়াধি আন পথে ঔখদ গোবিন্দদাস নাহি মান।
[এখানে কবিরাজ কথাটী থাকিলে আরও ..ন হইত]

৭। অব রূপ লালস কিয়ে দরশায়সি নীলজ দেহ ..লান।
গোবিন্দদাস কহ আপন পরশ দেহ হেম ধরউ নিজ বাণ।

৮। করইতে কোরে পরশ সঞে জানল কানুক কপট বিলাস।
নানা পরশি হাসি দিঠি কুঞ্চিত হে .. গোবিন্দদাস।

৯। গোবিন্দদাস দেখব সাঁচ। কাক.. অঙ্গনে কো পুন নাচ।

১০। যো তুহুঁ হৃদয়ে প্রেমতরু রোপলি শ্যাম জলদরস আশে।
সো অব নয়ননীর দেই সীচহ কহতহি গোবিন্দদাসে।

১১। যো মুখ চান্দ হৃদয়ে ধরি পৈঠব কালিন্দি বিষহ্রদনীরে
পামরি গোবিন্দদাস মরি যায়ব সাজি আনল তছু তীরে।

১২। ইথে বিনু নাগদমন রস পান। গোবিন্দদাস মণিমন্ত্র না জান।

এইগুলি হইতে লক্ষ্য করিতে হইবে—পদের মূল মাধুর্য্য ও ভাবের কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণতা না ঘটাইয়া গোবিন্দদাস কত কৌশলে ভণিতাগুলি দিয়াছেন। মূল ভাবের সহিত কবির ভণিতার কি করিয়া সামঞ্জস্য ঘটিতে পারে? কবি যদি বর্ণিত লীলার কোন অংশ গ্রহণ না করেন—তবে সামঞ্জস্য কি করিয়া হইবে? কবি সকল সময়ই শ্রীমতীর সখীস্থানীয়। কেবল তিনি লীলার বর্ণনা করিতেছেন না—তিনি লীলা-সঙ্গিনী,—নিজের চোখে লীলা-রস উপভোগ করিতেছেন, তিনি শ্রীমতীর ব্যথার ব্যথী—সাধের সাথী—সুখে সুখী। কবি লীলার মধ্যে নিজেকে বিলাইয়া ও মিলাইয়া দিতেছেন। এই সখ্যভাবটি গোবিন্দদাসের পদের ভণিতা-প্রসঙ্গে যেরূপ চমৎকার ফুটিয়াছে—এমনটি আর কোন কবির পদে নয়।

গোবিন্দদাসের পদগুলির মূল অঙ্গে কোথাও লোকোত্তর ব্যঞ্জনা নাই। এই ভণিতার চাতুর্য্য ও মাধুর্য্যের গুণেই পদগুলি আর সাধারণ লৌকিক গণ্ডীতে পরিচ্ছিন্ন থাকিতে পায় নাই—একটা এমনই লোকোত্তর-বিচ্ছিত্তির সৃষ্টি হইয়াছে, যাহা ভাগবতী-লীলায় পর্য্যবসিত হইতেছে। এই সখীদের আকূতি, আর্ত্তি ও রসানুভূতি প্রেম সাধনার সেই আনন্দ-লোকেরই ইঙ্গিত করিতেছে—সখ্যরস যাহার একটি বিশিষ্ট সোপান। ইহার বেশি পরমার্থতার অন্য ইঙ্গিত বৃন্দাবন-লীলার পদে দিবার উপায়ও নাই। দিলে তাহাতে রসাভাস হয়। গোবিন্দদাসের মত সে কথা অতি অল্প কবিই বুঝিয়াছিলেন।

গোবিন্দদাসের অনুপ্রাসের কথা আর কি বলিব? গোবিন্দদাসের রচনা শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কার দুইয়েতেই ঋদ্ধ। গোবিন্দদাস পদের প্রত্যেক শব্দের আদিতে এক বর্ণ বা সমধ্বন্যাত্মক বর্ণ বসাইয়াই কতকগুলি পদ রচনা করিয়াছেন। পদের প্রত্যেক চরণের আদিতেও একই বর্ণ বসাইয়াছেন। যেমন—

১। শিশিরক শীতসমাপলি সুন্দরি শোহন সুরত সন্দেশে।

২। মদন মোহন মূরতি মাধব মধুর মধুপুর তোই।

৩। পরখি পেখলু পুরুব-উত্তম পুরুখ পাহুন জাতি।

৪। কাঁচা কাঞ্চন কাঁতি কমলমুখি কুসুমিত কানন জোই।

৫। যামিনি জাগি জাগি জগ জীবন জপতহি যদুপতি নাম।

৬। তাপনি তীর তীর তরু তরুতল তরল তরলতরু ছায়।
তরুণ তমাল তরকি তোহে তরঙ্গিত তরুণি তোহারি পথ চায়।

এইগুলিকে অনুপ্রাস না বলিয়া 'অনুপ্রয়াসই' বলিব। এগুলি জগদানন্দের উপযুক্ত, গোবিন্দদাসের নয়। *

গোবিন্দদাসের অধিকাংশ পদে অনুপ্রাস ওতপ্রোতভাবে অনুস্যূত, অনেকস্থলে দুই একটি জোরালো অনুপ্রাসের প্রয়োগে রচনা ললিত-মধুর। আবার ছন্দোহিল্লোলের সহিত সুবিবেচিত অনুপ্রাস প্রয়োগ অনেকস্থলে আবৃত্তিকেই সঙ্গীত করিয়া তুলিয়াছে। যেমন—

১। মেঘ যামিনি চল বিলাসিনি পহিরি নীল নিচোল রে।
সঙ্গে না... কুসুম শায়ক ছোড়ি মঞ্জীর লোল রে।
গুরুয়া কুচভরে চলিতে পদ টলে পীন জঘনক ভার রে।
হেরি দামিনি ফটিক তরু জানি চমকি দক নীর ধার রে।

২। কঞ্জ চরণ যুগ যাবক রঞ্জন খঞ্জন গঞ্জন মঞ্জির বাজে।
নীল বসন মণি কিঙ্কিনি রণরণি কুঞ্জর গমন দমন খিন মাঝে।
কনক কটোর চোর কুচ কোরক জোরে উজোরল মোতিক দাম।
ভুজযুগ থীর বিজুরি দলি মণিময় কঙ্কণ ঝনকিতে চমকিত কাম।

৩। নব যৌবনি ধনি জগ জিনি লাবনি মোহিনিবেশ বনায়লি তাই।
মনমথ চীত ভীত নাহি মানত কুঞ্জরাজ পর সাজলি রাই।

---

* পক্ষান্তরে পদুমিনি পুন পরবোধহ মোয়। পীতাম্বর-পদ-পঙ্কজ পরিহরি পামরি পীতরে রোয়—এইরূপ পংক্তি রচনায় কবির কোন প্রয়াস হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

নয়নে নয়নে বাণ ভুজে ভুজে সন্ধান তনু তনু পরশে নাহি জয় ভঙ্গ।
গোবিন্দদাস চিতে অব নাহি সমুঝল বাজত কিঙ্কিনি কোন তরঙ্গ।

কুঞ্জে সুন্দর শ্যামর চন্দ।
কামিনি মনহি মূরতিময় মনসিজ জগজন নয়ন আনন্দ।
তনু তনু অনুলেপন ঘন চন্দন মৃগমদ-কুঙ্কুম-পঙ্ক।
অলিকুল চুম্বিত অবনি বিলম্বিত বনি বনমাল বি-টঙ্ক।
অতি সুকুমার চরণতল শীতল জীতল শরদরবিন্দ।
রায় সন্তোষ মধুপ অনুসন্ধিত নন্দিত দাস গোবিন্দ॥

গোবিন্দদাসের বারমাসিয়া পদটি হিল্লোলিত অনুপ্রাসের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এই পদে দীর্ঘস্বর গুলিই অনুপ্রাসের কাজ করিয়াছে। পদটি অন্যত্র তুলিয়া দেওয়া হইল। অনেকসময় কবি যমক-মূলক অনুপ্রাসের প্রয়োগে পদ-লালিত্যের সৃষ্টি করিয়াছেন। যেমন—

ঝলকত দামিনি যামিনি ঘোর। কামিনি কি তেজই কামুক কোর।

অন্যান্য দৃষ্টান্ত—

(ক) পাতর সে ভেঁল আঁতর বারি। (খ) নিজ কুল দূষণ ভূষণ করি মানলু তেঞি ভেল ঐছন শাতি। (গ) মরমহি শ্যামর পরিজন পামর ঝামর মুখ অরঁবিন্দ। ঝর ঝর লোরহি লোলিত কাজর বিগলিত লোচন নিন্দ। (ঘ) মন্দির গহন দহন ভেল চন্দনা। (ঙ) নয়ন পঙ্কজ জোরে ঝর ঝর লোরে মহি করু পঙ্ক। (চ) করতলে বয়ন নয়ন ঝরু নীঝর কপুগে কাজর হারা। (ছ) চম্পক দাম হেরি চিত অতি কম্পিত গোপনে বহে অনুরাগ। তুয়া রূপ অন্তরে জাগয়ে নিরন্তর ধনি ধনি তোহারি সোহাগ। (জ) দগধ মান মঝু বিদগধ মাধব রোখে বৈমুখী ভৈ গেল।

গোবিন্দদাসের পদের চরণে চরণে এবং পর্ব্বে পর্ব্বে মিলগুলি অনবদ্য। দোহা, চর্চরী, বৃত্তনরেন্দ্র, ভরহট্টা ইত্যাদি ছন্দে পর্ব্বে পর্ব্বে মিল দেওয়ার

প্রথা বলবতী ছিল না, গোবিন্দদাস এ প্রথার অনুসরণ করিয়াছেন অধিকাংশ স্থলে। গোবিন্দদাসের মিল শুধু অনবদ্য নয়, কলা কৃতিত্বেরও পরিচায়ক।

১। ধরনি শয়ন করি সঘন নয়ন ঝরি সহচরি রহত অগোরি।

২। কি রসে রিঝায়ব কৈসে নিঝায়ব বিষম কুসুম শরজালা।

৩। অঞ্জন গঞ্জন জগজন রঞ্জন জলদপুঞ্জ জিনি বরণা।
তরুণারুণ থল কমল দলারুণ মঞ্জির রঞ্জিত চরণা।

৪। ভ্রমর করম্বিত জানু বিলম্বিত কেলি কদম্বক মাল।

৫। গীম বিভঙ্গিম নয়ন তরঙ্গিম কত কুলবতি মতি মাতি।

গোবিন্দদাসের কোন কোন পদে অনুপ্রাস-যমকাদি শব্দালঙ্কার অর্থালঙ্কারেরও নিয়ন্ত্রণ করিয়াছে এবং রচনার পংক্তিবিন্যাসের ক্রম নির্দেশ করিয়াছে। ইহা যুগপৎ পদের বহিরঙ্গে মাধুর্য্য ও অন্তরঙ্গে চাতুর্য্যের সৃষ্টি করিয়াছে। দৃষ্টান্ত—

কুঞ্জ কুঞ্জর ভেল কোকিল শোকিল বৃন্দাবন বনদাব।
চন্দ মন্দ ভেল চন্দন কন্দন মারুত মারত ধাব।
কতএ আরাধব মাধব তোহে বিহু রাধাময়ি ভেল রাধা।
কঙ্কণ ঝঙ্কন কিঙ্কিনী শঙ্কিনী কুণ্ডল কুণ্ডলি ভান।
যাবক পাবক কাজর জাগর মৃগমদ মদকরি মান।
মনমথ মনমথে চড়ল মনোরথে বিষম কুসুমশর জোরি।
গোবিন্দদাস কহয়ে পুন এতি খনে না জানিয়ে কিয়ে গোরি।

একই শব্দের কলাসম্মত পুনরাবৃত্তির দ্বারা গোবিন্দদাস অনেক স্থলে পদলালিত্য ও রসমাধুর্য্যের সৃষ্টি করিয়াছেন। যেমন—

নব নব গুণগণ শ্রবণ রসায়ন নয়ন রসায়ন অঙ্গ।
রভস সম্ভাষণ হৃদয় রসায়ন পরশ রসায়ন সঙ্গ।

ছন্দোহিল্লোল গোবিন্দদাসের পদাবলীর একটি বৈশিষ্ট্য। দীর্ঘহ্রস্ব উচ্চারণের মর্য্যাদা রক্ষা করার জন্য স্বভাবতই ব্রজবুলির পদে ছন্দোহিল্লোলের

সৃষ্টি হয়। গোবিন্দদাস এই হিল্লোলকে নিয়মিত এবং অধিকতর নর্ত্তনপর করিবার জন্য কোন কোন পদ রচনা করিয়াছেন। এসকল পদের অন্য ঐশ্বর্য্য না থাকিলেও হিল্লোলিত প্রবাহের জন্য উপাদেয়।

নন্দনন্দন চন্দচন্দন গন্ধ নিন্দিত অঙ্গ।
জলদ সুন্দর কম্বু কন্ধর নিন্দি সিন্ধুর ভঙ্গ॥
প্রেম আকুল গোপ গোকুল কুলজ কামিনি কন্ত।
কুসুম রঞ্জন মঞ্জু বঞ্জুল কুঞ্জ মন্দির সন্ত॥
গণ্ড মণ্ডল লোল কুণ্ডল উড়ে চূড়ে শি-খণ্ড।
কেলি তাণ্ডব তাল পণ্ডিত বাহু দণ্ডিত দণ্ড॥
কঞ্জলোচন কলুষ মোচন শ্রবণ রোচন ভাষ।
অমল কোমল চরণ কিসলয় নিলয় গোবিন্দদাস॥

সাধারণ পজ্ঝটিকাও তাঁহার রচনায় হিল্লোলিত হইয়াছে।

মন্দির বাহির কঠিন কপাট। চলইতে শঙ্কিল পঙ্কিল বাট।
তঁহি অতি দূরতর বাদর দোল। বারি কি বারই নীল নিচোল।
সুন্দরি কৈছে ক-রবি অভিসার। হরি রহ মানস সুরধুনি পার।

গোবিন্দদাস বিদ্যাপতির প্রধান শিষ্য। তিনি গুরুর উদ্দেশে বলিয়াছেন—

বিদ্যাপতি পদ-যুগল সরোরুহ নিস্যন্দিত মকরন্দে।
তছু মঝু মানস মাতল মধুকর পিবইতে করু অনুবন্ধে।
হরি হরি আর কিয়ে মঙ্গল হোয়।
রসিক শিরোমনি নাগর নাগরী—লীলা স্ফুরব কি মোয়।
জনু বাউন্ করে ধরব সুধাকর পঙ্গু চঢ়ব কিয়ে শিখরে।
অন্ধ ধাই কিয়ে দশদিশ খোজব মিলব কল্পতরু নিকরে।
সো নহ অন্ধ করত অনুবন্ধহি ভকত নখর মনি ইন্দু।
কিরণ ঘটায় উদিত ভেল দশদিশ হাম কি না পায়ব বিন্দু।

সোই বিন্দু হাম যৈখনে পায়ব তৈখনে উদিত নয়ান।
গোবিন্দদাস অতয়ে অবধারল ভকত কৃপা বলবান।

গোবিন্দদাস স্বভাবসিদ্ধ বৈষ্ণবোচিত বিনয় বশতঃ একথা লিখিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে গোবিন্দদাস গুরুর অনুপযুক্ত শিষ্য নহেন, বরং স্থলে স্থলে ভাবের গূঢ়তায় ও অলঙ্করণের চাতুর্য্যে গুরুকেও অতিক্রম করিয়াছেন।

বিদ্যাপতির কোন কোন পদের কতকটা এদেশে প্রচলিত ছিল—গোবিন্দ সেগুলিকে সম্পূর্ণাঙ্গ করিয়াছেন। নিম্নে কয়েকটি পদের উল্লেখ করিতেছি।

(১) প্রেমক অঙ্কুর জাত আত ভেল না ভেল যুগল পলাশা।

(২) মুদিত নয়নে হিয়া ভুজযুগ চাপি। শূতি রহল হরি কছু না আলাপি।

(৩) বেনল সঞে ঘন ন উতারলুঁ লাজে লাজায়লি গোরি।

(৪) পরাণ পিয় সখি হামারি পিয়া। অবহুঁ না আওল কুলিশ হিয়া।

বিদ্যাপতির বারমা পদের দুইমাসের বর্ণনা গোবিন্দদাসের রচিত। বিদ্যাপতির ভাব ও ভঙ্গী লইয়াও তিনি বহু পদ রচনা করিয়াছেন।

১। আকুল চিকুর চূড়োপরি চন্দ্রক ভালহি সিন্দূর দহনা—এই পদটি বিদ্যাপতির 'কতহু মদন তনু দহসি হামারি'—পদের অনুস্মৃতি।

২। অঙ্গুলিক মুদরি সোই ভেল কঙ্কণ, কঙ্কণ গীমক হার। যোখন মান তো বিম্ব যুগ লাখ। অম্বরে উথলল মনোভব-সিন্ধু। বৃন্দাবন বন ভেল।—ইত্যাদি বিদ্যাপতির ভাষারই রূপান্তর।

৩। যাহাঁ যাহাঁ নিকসয়ে তনু তনু জ্যোতি—ইত্যাদি পদ বিদ্যাপতির 'যঁহা যঁহা পদযুগ ধরই তঁহি তঁহি সরোরুহ ভরই' পদেরই প্রতিধ্বনি।

৪। ভজহু রে মন নন্দ নন্দন অভয় চরণারবিন্দ রে—পদটি বিদ্যাপতির প্রার্থনারই প্রতিধ্বনি।

৫। 'গোবিন্দদাসের এ ধনি আঁচরে বদন ঝাঁপাউ' পদটি বিদ্যাপতির 'আঁচরে বদন ঝাপায়হ গোরি' পদটির প্রতিধ্বনি।

৬। কুচযুগ কনক মহেশ সম জানিয়ে তা পর ধরি হাম পাণি ইত্যাদি পদের শপথের ছল · ˜ ··· বিদ্যাপতি হইতে পাইয়াছেন।

৭। মাথহি তপন তপত ভেল বালুক আতপ দহন বিথার ইত্যাদি দ্বিপ্রহরীয় অভিসারের পদ বিদ্যাপতির তপনক তাপে তপত ভেল মহীতল ইত্যাদি পদের রূপান্তর মাত্র।

৮। "দুরজন বচন শ্রবণে তুহুঁ ধারলি কোপহি রোখলি মোয়" মানের এই পদটি বিদ্যাপতির অনুরূপ পদের প্রতিধ্বনি।

৯। বিদ্যাপতির—রিতুপতি রাতি রসিকবররাজ। রসময় রাস রভসময় মাঝ ইত্যাদি একই অক্ষরের অনুপ্রাসে পদরচনা পদ্ধতি গোবিন্দদাস অনুকরণ করেন।

গোবিন্দদাস বৈষ্ণবাচার্য্যগণের কোন কোন শ্লোককেও সুললিত পদে পরিণত করিয়াছেন। দুই এক স্থলে অনুবাদ, অধিকাংশ স্থলে মর্ম্মানুবাদ।

১। যাহা পহু অরুণ চরণে চলি যাত—পদটি উজ্জ্বল নীলমণির পঙ্কজং তস্করেতু ভূতনিবহাঃ স্বাংশে বিশন্তি স্ফুটাঃ ইত্যাদি শ্লোকের মর্ম্মানুবাদ।

২। ঋতুপতি রচিত বিরহজরে জাগরি গোতি উপেখলি রাধা—এই পদটি উজ্জ্বল নীলমণির—দূত্যোনাদ্য সুহৃজ্জনস্য······প্রাণানপি ত্যজামি সম্প্রতি······তনুম্—ইত্যাদি শ্লোকের মর্ম্মানুবাদ।

৩। মঝু মুখ বিমল কমল বর পরিমলে জানলুঁ তুহুঁ ভিভোর—এই পদটি উদ্ধবসন্দেশের মদ্বক্ত্রাম্ভোরুহ-পরিমলোন্মত্ত সেবানুবদ্ধে ইত্যাদি শ্লোকের অনুবাদ।

৪। 'সজনি কি কহব রাইক সোহাগি' পদটি উজ্জ্বল নীলমণির একটি শ্লোকের তাৎপর্য্যানুবাদ। কবি তাহাতে একটি 'সূক্ষ্ম' অলঙ্কারের নিজস্ব চারিচরণ যোগ দিয়া কাব্যাংশে উন্নত করিয়াছেন।

৫। সজনি, মরণ মানিয়ে বহু ভাগি। কুলবতী ভিন পুরুখে ভেল আরতি জীবন কিয়ে সুখ লাগি—এই পদটি রূপগোস্বামীর বিদগ্ধমাধবের একস্য শ্রুতমেব লুম্পতি মতিং কৃষ্ণস্য নামাক্ষরং ইত্যাদি শ্লোকের অনুবাদ।

৬। দরশনে লোর নয়ন যুগ ঝাঁপি ইত্যাদি পদটি কাব্যপ্রকাশের ধন্যাসি যা কথয়সি প্রিয় সঙ্গমেঽপি ইত্যাদি শ্লোকের প্রতিধ্বনি।

৭। কাঁহা নখচিহ্ন চিহ্নলি তুহুঁ সুন্দরি এ নহ কুঙ্কুমরেহ—পদটি উজ্জ্বল নীলমণির একটি শ্লোকের ভাবানুবাদ।

৮। গোবিন্দদাসের রাসলীলার দুইটি পদ ভাগবতের ভাবে অনুপ্রাণিত।

গোবিন্দদাস রাধার রূপের লাবণ্য-চ্ছবিটুকু রাখিয়া স্থূলাংশ ও দেহাশ্রয় হরণ করিয়া লইয়াছেন। এই নিরবলম্ব সৌন্দর্য্যের ভাবপ্রতিমার সহিত কোন শরীরীর প্রণয় সম্ভব নয়। এই সৌন্দর্য্য স্তম্ভিত করে—দিশেহারা করে,—প্রেমমুগ্ধ করে না। এ সৌন্দর্য্য মানব চক্ষুকে অতিক্রম করিয়া বিশ্বপ্রকৃতিকে সৌন্দর্য্যময় করিয়া তুলে—বিশ্বপ্রকৃতি এই সৌন্দর্য্যের পরিবেষ্টনী মাত্র নয়—পরিবেষ মণ্ডলে পরিণত হয়।

যাঁহা যাঁহা নিকসয়ে তনু তনুজ্যোতি। তাঁহা তাঁহা বিজুরি চমকময় হোতি।
যাঁহা যাঁহা অরুণ চরণ চল চলই। তাঁহা তাঁহা থল কমল দল খলই।
যাঁহা যাঁহা ভঙ্গুর ভাঙ বিলোল। তাঁহা তাঁহা উছলই কালিন্দি হিলোল।
যাঁহা যাঁহা তরল বিলোচন পড়ই। তাঁহা তাঁহা নীল উতপল বন ভরই।
যাঁহা যাঁহা হেরিয়ে মধুরিম হাস। তাঁহা তাঁহা কুন্দ কুমুদ পরকাশ।
—এই রাধাকে চিনিয়াও চেনা যায় না।

এই সৌন্দর্য্য কোন রক্তমাংসের দেহে সম্ভব নয়। এই সৌন্দর্যই ছিল কবির মানসলোকে। গোবিন্দদাস তাঁহার মানসলোকের নিখিল সৌন্দর্য্য রাধাকে অবলম্বন করিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন।

গোবিন্দদাস রাধা-প্রেমের স্বরূপ বড় কৌশলেই প্রকাশ করিয়াছেন। রাধা বলিতেছেন—"পিশুনগণের জন্য দক্ষিণ নয়নে দেখিতে পাই না,—পরিজনগণের জন্য বাম নয়নের অর্দ্ধেক দৃষ্টিও দিতে পারি না। তবু

আধক আধ-আধ দিঠি অঞ্চলে যব হরি পেখলুঁ কান,
কতশত কোটি কুসুমশরে জরজর রহত কি যাত পরাণ।
সজনি জানলুঁ বিহি মোহে বাম—
দুহুঁ লোচন ভরি যো হরি হেরই তছু পায়ে মঝু পরণাম।
সুনয়নি কহত কানু ঘনশ্যামর মোহে বিজুরিসম লাগি,
রসবতি তাক পরশরসে ভাসত হামারি হৃদয়ে জলু আগি।
প্রেমবতি প্রেম লাগি জিউ তেজত চপল জীবনে মঝু সাধ,
গোবিন্দদাস ভনে শ্রীবল্লভ জানে রসবতি রস মরিযাদ।

এই পদটির দ্বারা গোবিন্দদাস অন্য গোপীগণ হইতে—শ্রীকৃষ্ণের অন্য বল্লভাগণ হইতে—এমন কি জগতের সকল প্রণয়িনীর গণ্ডী হইতে শ্রীরাধাকে অপূর্ব্ব স্বাতন্ত্র্য দান করিয়াছেন। এমন কোন প্রেমিকা আছে যে—প্রিয়জনের 'পরশরসে' ভাসে না? রাধার হৃদয়ে জলে আগুন। অন্যে দেখে ঘনশ্যাম—রাধা দেখে বিদ্যুন্ময়। কবিরাজ গোস্বামীর কৃষ্ণ-প্রেমের স্বরূপের কথা মনে পড়ে। প্রিয়ের জন্য প্রিয়ার প্রাণ দেওয়াটাই জগতের সাহিত্যে চরম কথা। শ্রীরাধা প্রাণোৎসর্গের চির বিচ্ছেদ বরণ করিতে চান না।

সেই এক শ্রীকৃষ্ণ বংশীতানে সকল গোপীদেরই চঞ্চল করিতেছেন—রাধার অন্তরে এমন সৃষ্টিছাড়া ব্যাপার কেন? ইহার কারণ শ্রীকৃষ্ণে নয়—রাধারই ব্যক্তিগত চরিত্রে। কবি এই চরিত্রের স্বাতন্ত্র্য বেশ করিয়া বুঝাইয়াছেন।

গৌরচন্দ্রিকার পদে গোবিন্দদাসের সমকক্ষ কেহ নাই। যাঁহারা শ্রীচৈতন্য-দেবের সামসময়িক, তাঁহারা স্বচক্ষে শ্রীচৈতন্যের লীলা, তাঁহার ভাববিহ্বলতা, তাঁহার ভুবনমোহন রূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। তাঁহারা গৌরাঙ্গের লীলা

বিলাসের কথা লিখিয়াছেন, তাহাতে প্রেমভক্তির গভীরতা, সরলতা, ভাবাকুলতা ও মাধুর্য্য আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু সেগুলির অধিকাংশই কবিতার পদবীতে উঠে নাই। রস-সাহিত্যের দিক হইতে সেগুলির অধিকাংশেরই কোন মূল্য নাই। সেগুলির তুলনায় লোচনদাস, গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস ও বলরামদাসের গৌরচন্দ্রিকার পদাবলী সাহিত্যের দিক হইতে উৎকৃষ্টতর। ইহাদের মধ্যে আবার গোবিন্দদাসের পদগুলি রূপে, রসে, ছন্দে, ঝঙ্কারে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

গোবিন্দদাস আপন মনের মাধুরী মিশাইয়া শ্রীগৌরাঙ্গের ভাবমূর্ত্তিকে যে বাণীরূপ দিয়াছেন—তাহা পূর্ব্ববর্ত্তী কবিদের প্রত্যক্ষ-দৃষ্ট রূপের চেয়ে ঢের বেশি উজ্জ্বল ও মধুর হইয়া উঠিয়াছে। এই রূপসৃষ্টি কেবল কল্পনার সবলতার জন্যই সম্ভব হয় নাই। তাহার সহিত অবশ্য অগাধ ভক্তিরও যোগ আছে। তাহাতেই যথেষ্ট হয় নাই। তাঁহার মত অপূর্ব্ব নির্ম্মল অনবদ্য প্রকাশভঙ্গী আর কাহারও ছিল না। গোবিন্দদাসের গৌরচন্দ্রিকার পদাবলী শিবজটা হইতে বিমুক্ত সুরধুনীধারার ন্যায় শুচি, স্বচ্ছ, নির্ম্মল ও কলতরঙ্গময়। 'জটা হইতে মুক্ত' বলিলাম অলঙ্কারের জটিলতা এইগুলিতে নাই বলিয়া।

যে অলঙ্কারের সাহায্যে মহাপুরুষের ঐশ্বর্য্য বাণীরূপ ধরে, সেই উদার সরল উদাত্ত অলঙ্কারই এ ক্ষেত্রে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে।

মহাপ্রভুর প্রেমের ঐশ্বর্য্য কবি একদিকে যেমন অত্যুজ্জ্বল করিয়া দেখাইয়াছেন—নিজের বৈষ্ণবোচিত দীনতা ও আকিঞ্চন তেমনি গভীর আন্তরিকতার সহিত প্রকট করিয়াছেন—

ভাব-গজেন্দ্রে চড়ায়ল অকিঞ্চনে ঐছন পহুক বিলাস।
সংসার কালকূট বিষে তনু দগদগ একলি গোবিন্দদাস।

গোবিন্দদাস পরম ভক্ত কবি ছিলেন—তাঁহার প্রার্থনা-সঙ্গীত ও গৌর চন্দ্রিকায় তাঁহার ভক্তির গভীরতা পরিস্ফুট। কিন্তু তিনি ব্রজ পদাবলীর

প্রেম-মাধুর্য্যের মধ্যে কোথাও ভক্তির ঐশ্বর্য্যের মিশ্রণ ঘটান নাই। তাঁহার রাধা-বিরহের যে কবিতাগুলি প্রসিদ্ধ—সেগুলির মধ্যে কোন আধ্যাত্মিক ভাবের দ্যোতনা নাই। সেগুলি বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের মত উৎকৃষ্ট শ্রেণীরও নয়। বিদ্যাপতি অলঙ্কার-প্রয়োগের পক্ষপাতী ছিলেন,—কিন্তু মাথুর বিরহের পদাবলীতে তিনি অলঙ্করণের লোভ অনেকটা সংবরণ করিয়াছিলেন—গোবিন্দদাস তাহা করেন নাই। গোবিন্দদাস মাথুর বিরহের সুরকে দেশকালের সীমা উত্তরণ করিতে পারেন নাই। তবে গোবিন্দদাসের পদেও অনেকস্থলে আধ্যাত্মিক অর্থ আবিষ্কার করা যাইতে পারে। যাঁহারা ভক্তবৈষ্ণব তাঁহাদের কাছে সমস্তটাই আধ্যাত্মিক, তাঁহাদের পক্ষ হইতে বলিতেছি না।

সজনি, কি ফল বেশ বনান।

কান্থ পরশমণি পরশক বাধন অংভরণ মৌতিনি মান।

ইহার একটা আধ্যাত্মিক অর্থ বাহির করা যাইতে পারে। কিন্তু এই ভাবই রসমঞ্জরীতেও আছে—সেখানে কেহ আধ্যাত্মিক অর্থ সন্ধান করে না। গোবিন্দদাসের পদের আধ্যাত্মিক গৌরব অর্থনিহিত নয়—তিনি যে সমাজে লালিত পালিত হইয়া, যে সমাজের "রস-তরঙ্গিত" মুখের পানে চাহিয়া এই পদগুলি লিখিয়াছেন—সে সমাজের দ্বারাই আরোপিত (attributed)।

আধ্যাত্মিক গৌরবের কথা বাদ দিলেও গোবিন্দদাসের মত কবি শুধু বাঙ্গালায় কেন ভারতবর্ষেও দুর্লভ।

গোবিন্দদাসের কবিতায় প্রকৃতির সহিত মুখ্যভাবে না হউক গৌণভাবে মানব-হৃদয়ের সংযোগ দেখানো হইয়াছে। প্রকৃতি শ্রীমতীর উল্লাসে উল্লসিত হইয়াছে, বিরহে সহমর্ম্মিতা করিয়াছে। অভিসারের পথে বিঘ্ন ঘটাইয়াছে বটে, কিন্তু তাহাতে রাধার প্রেমের দুর্নিবারতাই বাড়াইয়াছে—অভিসার-পথে আবার সহায়তাও করিয়াছে। প্রকৃতি রাধাকৃষ্ণের রূপবর্ণনায় যে নব নব উপমান যোগাইয়াছে—তাহা অবশ্য সকল বৈষ্ণব কবির সম্পর্কেই খাটে। মাসে মাসে

প্রকৃতির প্রভাবে বেদনার বর্ণ পরিবর্তিত হয়, কবি তাহা বুঝিতেন। তাঁহার বারমাস্যার কবিতাটি প্রকৃতির সহিত মানব-হৃদয়ের গভীর সংযোগের নিদর্শন।

আঘন মাস রাস রস সায়র নাগর মাথুর গেল।
পুররঙ্গিণীগণ পূরল মনোরথ বৃন্দাবন বন ভেল॥
আওল পৌষ তুষার সমীরণ হিমকর হিম অনিবার।
নাগরীকোরে ভোরি রহু নাগর করব কোন পরকার॥
মাঘে নিদাঘ কড়ন পাতিয়ায়ব আতপ মন্দ বিকাশ।
দিনমণি তাপ নিশাপতি চোরল কানু বিনু সঘন হুতাশ॥
ফাগুনে গুনিগুনি গুণমণি গুণগণ ফাগুয়া খেলন রঙ্গ।
বিরহ-পয়োধি অবধি না পাইয়ে দুরতর মদন-তরঙ্গ॥
আওল চৈত চীত কত বারব ঋতুপতি নব পরবেশ।
দারুণ মনমথ ফুলশরে হানই কানু রহল কোন দেশ॥
মাধবি মাস সাধ বিধি বাদল পিককুল পঞ্চম গান।
দারুণ দখিন পবন নহি ভায়ত ঝুরি ঝুরি না রহ পরাণ॥
জৈঠহি মীঠ কহত সব রঙ্গিনি চন্দন চান্দনি রাতি।
শীতল পবন মোহে নাহি ভায়ত দারুণ মনমথ শাতি॥
মাস আষাঢ় গাঢ় বিরহানল হেরি নব নীরদ পাঁতি।
নীরদ মূরতি নয়নে যব লাগয়ে নিঝরে ঝরয়ে দিনরাতি॥
শাওনে বরখন গগনে ঘন গরজন উনমত দাদুরি বোল।
চমকিত দামিনি জাগরে কামিনি জীবন কণ্ঠ হিলোল॥
ভাদরে দরদর দারুণ দুরদিন ঝাঁপল দিনমণি চন্দ।
শীকর নিকরে থীর নহ অম্বর দহই মনোভব মন্দ॥
আশিনমাসে বিকাশিত পদুমিনি মানস হংস নিসান।
নিরমল অম্বর হেরি সুধাকর ঝুরিঝুরি না রহ পরাণ॥

কাতিকমাস নিরাশ কয়ল বিধি লীলাময় রসরাস ।
নিকরুণ কাণ কোন পাতিয়ায়ব কহতহি গোবিন্দদাস ।

গোবিন্দদাস বিদ্যাপতির প্রবর্ত্তিত ছন্দই অনুসরণ করিয়াছেন। গোবিন্দদাসের ছন্দোবন্ধন একেবারে নিষ্কলঙ্ক। কয়েকটির দৃষ্টান্ত দিই—

পজ্ঝটিকা—প্রকৃত পজ্ঝটিকা ৪ + ৪ + ৪ + ৪ মাত্রায় গঠিত। যেমন—

সুরপতি । ধনু কি শি- । খণ্ডক চূড়ে ।
মালতি । কুরি কি ব- । লাকিনি উড়ে ॥

গোবিন্দদাসের পজ্ঝটিকার চরণ সাধারণতঃ ৪ + ৪ + ৪ + ৩ যেমন—

(১) চলু গজ । গামিনি । হরি অভি । সার ।
গমন নি- । রঙ্কুশ । আরতি বি- । থার ॥

(২) চৌদিশে অথির প- । বন দেই । দোল ।
জলভরি । শীকর । নিকর হি- । লোল ॥

৪ + ৪ + ২ বা ৩—মাত্রার চরণেও লঘুপজ্ঝটিকার ছন্দ বাঁধা হইয়াছে,—

৪ + ৪ + ২—দূর কর বিরহিনী । দুখ ॥ নিয়ড়ে-হেরবি পিয়া । মুখ ॥

৪ + ৪ + ৩—ও নব জলধর । অঙ্গ ॥ ইহ থির বিজুরী ত- । রঙ্গ ।
অতমিত যামিনি । কান্ত । বিকল ভেল মণি । মন্ত ॥

পজ্ঝটিকার এক চরণে ১২ মাত্রা, অন্য চরণে ১৬ মাত্রাও দেখা যায়।

৪ + ৪ + ৪—বিপুল পু- । লক ভর । লম্বে ।
৪ + ৪ + ৪ + ৪—বিকসিত । ভেল তহি । ভাব ক- । দম্বে ॥

বৃত্তনরেন্দ্র—৭ + ৯ + ৮ + ৪—

যো তুঙ্গ হৃদয়ে । প্রেমতরু রোপলি । শ্যাম জলদ রস । আশে
সো অব নয়ন । নীর দেই সীঞ্চল । কহতহি গোবিন্দ । দাসে ।

ভল্লহট্টা—৮ + ৮ + ৮ + ৩ বা ৪—(ইহাতে বৃত্তনরেন্দ্রের মিশ্রণ আছে)

(১) যো পদতল থল । কমল সুকোমল । ধরনি পরশে উপ । চঙ্ক ।

অব কণ্ট কময় । সঙ্কট বাটহি । আয়ত যায়ত নিঃ । শঙ্ক ॥

(২) নীরদ নয়ানে । নব ঘন সিঞ্চনে । পুলক মুকুল অব । লম্ব !

(৭+৯) স্বেদমকরন্দ । বিন্দু বিন্দু চুয়ত । বিকসিত ভাব-ক- । দম্ব ।

(৩) অম্বু বাঙন করে । ধরব সুধাকর । পঙ্গু চঢ়ব কিয়ে । শিখরে ।

অন্ধ ধাবই কিয়ে । দশ দিশ খোঁজব । মিলব কলপতরু । নিকরে ॥

গোবিন্দদাসের এই ছন্দের শেষ পর্বে ৩ মাত্রারই সংখ্যা বেশি । শেষের ৩ বা ৪ মাত্রার স্থলে ৫, ৬, ৭, ৮ মাত্রাও হইতে পারে । যেমন—

৮+৮+৮+৫—

চরণ কমল তলে । অরুণ বিরাজিত । মঞ্জীর রঞ্জিত । মধুর ধনি ।

৮+৮+৮+৬—

কুঞ্চিত কেশিনি । নিরুপম বেশিনি । রস আবেশিনি । ভঙ্গিনি রে ।

অধর সুরঙ্গিনি । অঙ্গতরঙ্গিনি । সঙ্গিনি নব নব । রঙ্গিনি রে ।

৮+৮+৮+৭—গদগদ ভাষ ম- । ধুর বচনামৃত । লহু লহু হাস বি- । কাশিত গণ্ড ।

পাষণ্ড খণ্ডন । শ্রীভুজ মণ্ডন । কনক খচিত অব- । লম্বন দণ্ড ॥

৮+৮+৮+৮—গতি অতি মন্থর । নব যৌবন ভর ।

নীল বসন মণি । কিঙ্কিণি বোলে ॥

গজ অরি মাঝরি । উপরে কনয়া গিরি ।

বীচহি সুরধুনি । মুকুতা হিলোলে ॥

চর্চ্চরী—(৩+৪)+(৩+৪)+(৩+৪)+৩—

নন্দ নন্দন । চন্দ চন্দন । গন্ধ নিন্দিত । অঙ্গ ।

জলদ সুন্দর । কম্বু কন্ধর । নিন্দি সিন্ধুর । ভঙ্গ ।

(৩+৪)+(৩+৪)+(৩+৪)+৫

জয়তি জয় বৃষ- । ভানুনন্দিনি । শ্যাম-মোহিনি । রাধিকে ।

কনয় শত বাণ । কান্তি কলেবর । কিরণ জিত কম- । লাধিকে ॥

প্রাকৃত ছয় মাত্রার ছন্দের স্তবকবদ্ধ দৃষ্টান্ত গোবিন্দদাসে একাধিক আছে। জগদানন্দ, বলরাম ও ঘনশ্যাম ইহার সার্থক অনুসরণ করিয়াছিলেন।

ছয় মাত্রার পর্বের স্তবক—

(১) ৬+৬, ৬+৬—চীত চোর। গৌর অঙ্গ। রঙ্গে ফিরত। ভকত সঙ্গ

৬+৪ (৫)—মদন মোহন। ছন্দুয়া।

৬+৬, ৬+৬—হেম বরণ। হরণ দেহ। পুরল তরুণ। করুণ মেহ।

৬+৪ (৫)—তপত জগত। বন্ধুয়া॥

(২) ৬+৬, ৬+৬—শরদ চন্দ। পবন মন্দ। বিপিনে ভরল। কুসুম গন্ধ।

৬+৬, ৬+৪—ফুল্ল মল্লী। মালতী যুথী। মত্ত মধুপ। ভোরনি।

৬+৬, ৬+৬—হেরত রাতি। ঐছন ভাতি। শ্যাম মোহন। মদনে মাতি

৬+৬, ৬+৪—মুরলি গান। পঞ্চম তান। কুলবতি চিত। চোরনি।

গোবিন্দদাসের সাধারণ দীর্ঘ ত্রিপদীছন্দে রচিত বাংলা পদও আছে। ইহাতে দীর্ঘ হ্রস্বের উচ্চারণ পার্থক্য ধরা হয় নাই—

৮+৮+(৮+২)

এইত মাধবীতলে। আমার লাগিয়া পিয়া। যোগী যেন সদাই ধেয়া। য়ায়।

পিয়া বিনা হিয়া কেনে। ফুটিয়া না পড়ে গো। নিলাজ পরাণ নাহি। যায়॥

প্রচলিত লঘু ত্রিপদী ছন্দে গোবিন্দদাস ব্রজবুলি ও বাংলাতে পদ লিখিয়াছেন।

৬+৬+৬+২—প্রাণ সহচরি। চরণে সাধই। কাহে মানয়বি। তোহি।

আঁখি মুদি কহে। অবহু মাধব। কানু না মিলব। মোহি।

কবি স্থলে স্থলে দীর্ঘস্বরকে দুই মাত্রাতেও ধরিয়াছেন। প্রাচীন ঢঙের লঘু ত্রিপদীর পদও আছে। ইহাতে প্রত্যেক অক্ষরে একমাত্রা ধরা হইত।

গলায় রঞ্জণ। কলিকার মালা। নারীমন বান্ধা। কান্দে।

বাহুর বলনি। অঙ্গের হেলনি। মন্থর চলন। ছান্দে॥

জ্ঞানদাস

জ্ঞানদাস ব্রজবুলি ও খাঁটী বাঙ্গালা দুই ভাষাতেই পদ রচনা করিয়াছেন। কোন কোন রচনায় ব্রজবুলি ও বাঙ্গালা দুই ভাষার মিশ্রণ আছে। যেমন—

কি কহব শতশত তুয়া অবতার।

একেলা গৌরাঙ্গ চাঁদ পরাণ আমার॥

সাধারণতঃ কবি যেখানে প্রাণের গভীর ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতে চাহিয়াছেন—সেখানে তিনি তাঁহার নিজস্ব মাতৃভাষারই আশ্রয় লইয়াছেন। যেখানে মামুলী ধরণের রূপাদি বর্ণনা করিতে চাহিয়াছেন, যেখানে ছন্দ অলঙ্কার ইত্যাদির ঐশ্বর্য্য দেখাইতে চাহিয়াছেন অথবা মণ্ডনকলার (Decorative art) চাতুর্য্য দেখাইতে চাহিয়াছেন অথবা কোন কবি-প্রসিদ্ধির ধারা (Convention and tradition) অনুসরণ করিতে চাহিয়াছেন—সেখানে অবিমিশ্র ব্রজবুলির সহায়তা গ্রহণ করিয়াছেন। যেমন—

তাম্বূল অধরে মধুর বিম্বফল কীর দংশন কিবা দেল।

কুচ গিরিফল বি-হগ কিয়ে বৈঠল তাহে অরুণরেখ ভেল।

এই শ্রেণীর রচনা বিদ্যাপতির ধারারই প্রতিধ্বনি।

চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির প্রভাব জ্ঞানদাসের রচনায় খুব বেশি। কবি বিদ্যাপতির পদাবলী হইতে ছন্দ, ভাষা-বিন্যাস, উপমা-ভঙ্গী, বর্ণনা-ভঙ্গীর আদর্শ গ্রহণ করিয়াছেন। অনেকস্থলে জ্ঞানদাসের ভাষাকে বিদ্যাপতিরই ভাষা বলিয়াই মনে হয়। খাঁটি বাংলাভাষায় রচিত পদাবলীতে চণ্ডীদাসের প্রভাব খুব বেশি। চণ্ডীদাসের গভীর আকূতি জ্ঞানদাসের পদাবলীতে বার বার প্রতিফলিত হইয়াছে। কোন কোন স্থলে চণ্ডীদাস ও জ্ঞানদাসের ভাব, ভাষা

প্রায় অভিন্ন। উদাহরণ স্বরূপ—

গুরুজন মাঝে যদি থাকিয়ে বসিয়া।
পরসঙ্গে নাম শুনি দরবয়ে হিয়া॥
পুলক পূরয়ে অঙ্গ আঁখে নামে জল।
তাহা নিবারিতে আমি হইয়ে বিকল। (চণ্ডীদাস)
গুরু গরবিত মাঝে রহি সখী সঙ্গে।
পুলকে পূরয়ে তনু শ্যাম পরসঙ্গে।
পুলক ঢাকিতে করি কত পরকার।
নয়নের ধারা মোর বহে অনিবার॥ (জ্ঞানদাস)

চণ্ডীদাসের প্রভাব জ্ঞানদাসের রচনায় এত বেশি যে জ্ঞানদাসের অনেক পদ চণ্ডীদাসের নামে এবং চণ্ডীদাসের অনেক পদ জ্ঞানদাসের নামে চলিয়া গিয়াছে। চণ্ডীদাসের পল্লীজীবন-মাধুর্য্য ও গভীর বাঙ্গালীয়ানা জ্ঞানদাসে নাই। জ্ঞানদাসের রচনায় এমনই অনেক কিছুই নাই—কিন্তু যাহা আছে তাহা এক গোবিন্দদাস ছাড়া অন্য কোন চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণবকবির মধ্যেও দেখা যায় না।

কবির রচনায় বিষয়-বৈচিত্র্য আছে—বৈশিষ্ট্যও কিছু আছে। জ্ঞানদাস গৌরচন্দ্রিকায় গৌরাঙ্গের প্রেমাবেশে রাধাকৃষ্ণের লীলা-মাধুর্য্য উপভোগ করিয়াছেন। তিনি কলিকালকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাল বলিয়াছেন—কারণ এই কালে শ্রীচৈতন্যের অবতার হইয়াছে।

কলা-চাতুর্য্য ছাড়া কেবল ভাবের ঐশ্বর্য্যে শ্রেষ্ঠ কবি হওয়া যায় না—একথা জ্ঞানদাস বেশ বুঝিতেন। কেবল ভাষাছন্দের পারিপাট্যেই তিনি কৌশল দেখান নাই—বলিবার ভঙ্গীর মধ্যে—গঠন-পারিপাট্যের মধ্যে—ঘটনা সংযোজনার মধ্যেও তিনি অনেক কৌশল দেখাইয়াছেন। উদাহরণ স্বরূপ—রাধার কুমারীলীলার একটি চিত্রের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। সরলা

বালিকা পূর্ব্বরাগ কাহাকে বলে জানে না। তাহার শিশুসারল্যের স্বচ্ছতায় কবি পরবর্ত্তী জীবনের চমৎকার আভাস দিয়াছেন। রাধার জননী জিজ্ঞাসা করিতেছেন—

প্রাণনন্দিনী রাধা বিনোদিনী কোথা গিয়াছিলা তুমি।
এ গোপনগরে প্রতি ঘরে ঘরে খুঁজিয়া ব্যাকুল আমি॥
অগোর চন্দন কস্তুরী কুঙ্কুম কে রচিল তোর ভালে।
কে বাঁধিল হেন বিনোদ লোটন নব মালিকার মালে।

রাধা উত্তর করিলেন—

মাগো গেনু খেলাবার তরে।
পথে লাগি পেয়ে এক গোয়ালিনী লৈয়া গেল মোরে ঘরে।
গোপ রাজরাণী নন্দের গৃহিণী যশোদা তাহার নাম।
তাহার বেটার রূপের ছটায় জুড়ায়ল মোর প্রাণ।
কি হেন আকুতে তার বামভিতে লৈয়া বসাল মোরে।
একদিঠে রহি তাহার আমার রূপ নিরীক্ষণ করে।
বিজুরি উজোর মোর দেহখানি সেহ নব জলধর।
সুমেল দেখিয়া দিবাকর ঠাঞি কি হেতু মাগিল বর।

এই চিত্রের দ্বারা কবি কি অপূর্ব্ব রসের সৃষ্টি করিলেন, তাহা রসিক জন বুঝিবেন। রাধার লাবণ্য বিজলির মত, শ্যামের লাবণ্য জলধরের মত। বিজলি ও জলধরে 'সুমেল' দেখিয়া যশোদা দিবাকরের পানে চাহিয়া কি যেন কি বর মাগিলেন। চমৎকার নয় কি এই রস-ব্যঞ্জনা?

তারপর মুরলী-শিক্ষার কথা। যে মুরলী কুলশীলমান লাজভয়ডর সব ভুলাইতে পারে—কুলবতীকে কুল হইতে টলায়—সে মুরলীর গূঢ় রহস্য রাধা সমাধান না করিয়া ছাড়িবে না, সে মুরলী শিখিতেই হইবে। রাধা আবদার ধরিয়া বলিল—

কোন রন্ধ্রেতে শ্যাম গাও কোন তান।
কোন রন্ধ্রের গানে বহে যমুনা উজান।
কোন রন্ধ্রের গানেতে কদম্ব ফুল ফুটে,
কোন রন্ধ্রের গানে রাধার প্রেম লুটে॥

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—রাধা হইয়া এই সাধা বাঁশীর রহস্য বুঝা যায় না, আমার ভাবে সম্পূর্ণ আবিষ্ট না হইলে এ বাঁশী অসাধ্য সাধন করিবে না।

ধরবা ধরবা ধর মোর পীতবাস পর, ধর দেখি রন্ধ্র মাঝে মাঝে।
চরণে চরণ রাখ কদম্ব হিলানে থাক তবে সে বিনোদ বাঁশী বাজে।

এইখানে কৌশলে কবি অপূর্ব্ব রসসৃষ্টি করিয়াছেন। বাৎস্যায়নের "তদ্রমো রতিঃ" এই সূত্রটিও এখানে মনে পড়ে। দয়িতের কাছে যাহা পরম প্রিয়, দয়িতার কাছে তাহাই হয় পরম প্রীতির ধন। এই বংশীর রন্ধ্র অনেক, এই বংশী কেবল রাধার চিত্ত হরণ করিতেছে না, সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতিকে উল্লসিত করিতেছে। যাহার ভিন্ন ভিন্ন রন্ধ্রের ভিন্ন ভিন্ন কাজ, তাহার সার্থকতাও অনেক। কেহ যদি ইহাতে ব্যঞ্জনাময় গভীর সার্থকতার সন্ধান করেন, করুন। যদি তাহা মিলে অধিকতর আনন্দেরই কথা। বাচ্যার্থ হইতেই আমরা যে মাধুর্য্য পাইতেছি—তাহাই যথেষ্ট মনে করি।

আর একটি দৃষ্টান্ত নৌকাবিলাস। মথুরার হাটে ক্ষীরসর বেচিবার জন্য গোপবধূগণ চলিয়াছেন। ঘাটে একখানি নৌকা লইয়া শ্যামরায় অপেক্ষা করিতেছেন। নাবিকবেশী শ্যাম গোপবধূদের পারে লইয়া যাইতে চাহিলেন—গোপবধূগণ নাবিককে ক্ষীরসর উপহার দিয়া নৌকায় আরোহণ করিল। বেলা শেষ হইয়া আসে—নৌকা আর নদী পার হয় না। মাঝ যমুনায় নৌকা যখন গেল তখন ঝড় উঠিল। গোপবধূগণ ভয় পাইয়া নাবিককে তিরস্কার করিতে লাগিল। নাবিক উত্তর দিল—

আমি কি করিব বল উথলে যমুনা জল কাণ্ডার করেতে নাহি রয়।

এতদিন নাহি জানি লোকমুখে নাহি শুনি যুবতীর যৌবন এত ভারী।
নিজঅঙ্গ বাস ছাড় যৌবন পাতল কর তবে ত বহিয়া যেতে পারি॥
খাওয়ায়ে ক্ষীরসরে কি গুণ করিলা মোরে আঁখি আর পালটিতে নারি।
আঁখি রৈল মুখ চাই জল না দেখিতে পাই তোমরা হৈলে এ প্রাণের বৈরী।

কবির ওস্তাদি এখানে লক্ষ্য করিতে হইবে।

এখানেও যদি কেহ আধ্যাত্মিক সার্থকতা সন্ধান করেন, তবে তিনিও বঞ্চিত হইবেন না। কেবল রস সৃষ্টির কৌশল মাত্র ধরিয়া লইলেও রসোপভোগে বাধা জন্মিবে না।

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের অনুসরণে জ্ঞানদাস শ্রীকৃষ্ণকে শুল্ক-গ্রহীতা দানীর ছদ্মে যমুনার ঘাটে আবিভূর্ত করিয়াছেন। রাধা বড়াইএর সঙ্গে ক্ষীরসর বেচিতে চলিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ পথ আগলাইয়াছেন—রাধা বলিতেছেন—

ঘরে বৈরী ননদিনী পথে বৈরী মহাদানী
দেহে বৈরী হইল যৌবন।
হেন মনে উঠে তাপ যমুনায় দিয়া ঝাঁপ
না রাখিব এ ছার জীবন।
অবলা বলিয়া গায় বলে হাত দিতে চায়
পসারিয়া আইসে দুটিবাহু।
কবি জ্ঞানদাস কয় মোর মনে হেন লয়
চাঁদে যেন গরাসয়ে রাহু।

রাধাকে বিব্রত করিয়া রঙ্গ দেখিবার জন্য কবির ইহাও এক রস-কৌশল।

গায়ন গাহিয়া চলেন—তিনি নিজেই জানেন না, কখন তাঁহার সঙ্গীত চরম উৎকর্ষের শিখরে উত্তীর্ণ হইবে। যে ধৈর্য্য ধরিয়া গোড়া হইতে শুনে সেই চরমোৎকর্ষের অপূর্ব্বতার আস্বাদ পায়। কবিও রচনা করিয়া চলেন—সহসা এক সময় তাঁহার রচনা পরম সত্যকে আবিষ্কার করিয়া চরম কথাটি রসঘন

ভাষণে প্রকাশ করিয়া ফেলেন। এই রসঘন ভাষণগুলির স্বতন্ত্র মূল্য আছে সত্য, কিন্তু সমগ্র রচনার অঙ্গীভূত হইয়া, বরং শিখরীভূত হইয়াই এইগুলি পরিপূর্ণ মূল্য-মর্য্যাদা লাভ করে। এইগুলির দ্বারা প্রমাণিত হয়, কবি রসলোকে কতটা উর্দ্ধে উঠিতে পারেন। এইগুলির দ্বারাই অথবা এইগুলি যে সকল কবিতার হৃৎমর্ম্ম সেই সকল কবিতার দ্বারাই একজন কবির কৃতিত্বের বিচার হওয়া উচিত। রসিক-চিত্ত তরুলতার অঙ্গে জীবন্ত ফুটন্ত ফুল দেখিতেই ভালবাসে—ফুলকে বোঁটা হইতে ছিঁড়িয়া নিষ্ঠুর পূজারী দেবপূজা করিতে পারে—অরসিক বিলাসী দেহগেহের শোভা বৃদ্ধি করিতে পারে,—হৃদয়হীন বৈজ্ঞানিক তাহার অঙ্গ বিশ্লেষণ করিতে পারে, রসিকজন তাহাতে ক্ষুব্ধই হয়। সমালোচনার কাজ অনেকটা বৈজ্ঞানিকের কাজ, সেজন্য আমি রসিকজনের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া জ্ঞানদাসের রসকুঞ্জ হইতে কয়েকটি কুসুম চয়ন করিয়া দেখাইতে চাই। যে সকল পদে নিম্নলিখিত অংশগুলি ফুলের মত ফুটিয়া উঠিয়াছে, রসিক বন্ধুগণের মনে যেন সেই পদগুলির রস আস্বাদে আগ্রহ জন্মে, ইহাই অভিপ্রায়। আমি কেবল সেই পদগুলির প্রকারান্তরে সন্ধান দিতেছি।

জ্ঞানদাস অতিরিক্ত আলঙ্কারিকতায় পক্ষপাতী ছিলেন না। একেবারে অলঙ্কৃতিকে বাদ দিয়া কোন প্রথম শ্রেণীর কবির রচনা চলিতে পারে না। কবিতার রসঘন অংশগুলি ও গভীর সত্যকথাগুলি অলঙ্কৃত ভাষাতেই প্রকাশ পাইতে চায়—সেজন্য অলঙ্কৃতিকে একেবারে বর্জ্জন করা সম্ভব হয় না। জ্ঞানদাসও তাহার চরম কথাগুলি কোথাও তাই অলঙ্কৃত পংক্তিতে, কোথাও আবার সহজ সরল ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে উৎপ্রেক্ষা, দৃষ্টান্ত ও উপমারই সাহায্য লইয়াছেন।

১। মিলনাকাঙ্ক্ষায় শ্রীমতীর কি দশা হইল—নিম্নলিখিত চারি পংক্তিতে তাহার পরাকাষ্ঠা দেখানো হইয়াছে—

অরুণ অধর বাঁধলি ফুল। পাণ্ডুর ভৈগেল ধুতুরা ফুল।
বসন বহিতে গুরুয়া ভার। অঙ্গুল অঙ্গুরী বলয়াকার॥

[বন্ধুজীবের মত অরুণ অধর ধুতুরার মত পাণ্ডুর হইয়া গেল। অঙ্গের বসনও ভারস্বরূপ হইল—আঙ্গুলগুলি এমনই শীর্ণ হইয়া গেল যে অঙ্গুরী বলয়ের মত ঢলঢল করিতেছে।]

২। পুলকি রহল তনু পুন পরসঙ্গ। নীপনিকরে কিয়ে পূজল অনঙ্গ॥

[সখী বলিতেছে—হে মাধব, পথে রাইএর সঙ্গে দেখা। তোমার প্রসঙ্গ তুলিলাম। তাহাতে তাহার অঙ্গ কণ্টকিত হইল—সে যেন কদম্বপুষ্প দিয়া অনঙ্গের পূজা করিল। তোমার প্রতি তাহার অনুরাগ যে কত তাহা কি আর তাহার মুখ হইতে শুনিতে হইবে?]

৩। কেনে তোর তনু হেন বিবরণ মলিন চাঁদের কলা।
মত্ত করিবরে মথিয়া থুঞাছে শিরীষ কুসুম মালা।

[ননদী শ্যামোপভুক্তা রাধার অঙ্গের বৈতথ্য দেখিয়া বলিতেছে—তোর তনুর এ দশা কেন হইল? চন্দ্রকলা যেন মলিন হইয়াছে। মত্ত করিবর যেন শিরীষ ফুলের মালা বিমথিত করিয়া রাখিয়াছে।]

৪। মরণ শরীরে পরাণ পাইল ঐছন সব ভেলি।
বন দাবানলে পুড়িয়া যেমন অমিয়া সাগরে কেলি॥

[বিরহপীড়িতা ব্রজবধূগণ কদম্বতলে শ্যামের সঙ্গে মিলিত হইল। তাহারা যেন মৃতদেহে প্রাণ পাইল। দাবানলে দগ্ধ মরালীরা যেন অমৃত-সাগরে কেলি করিতে লাগিল।]

৫। ঘর হৈতে বাহিরাইতে চাল না ঠেকিল মাথে
হাঁচি জেঠী না পড়িল বাধা,
হরিণী পালাঞে যাইতে ঠেকিল ব্যাধের হাতে
এমতি ঠেকিয়া গেল রাধা।

[ঘর হইতে বাহির হইবার সময় মাথায় চাল ঠেকিল না—হাঁচি টিকটিকি পড়িল না। কোন বিঘ্নের আশঙ্কা ত ছিল না। কিন্তু এ কি? ননদী বাঘিনীর হাত হইতে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য রাধা-হরিণী গৃহের বাহির হইল—কিন্তু পথে দানীর ছদ্মবেশে শ্যাম ব্যাধের হাতে পড়িল। (চণ্ডীদাসের অনুস্থিতি]

৬। কি দিব কি দিব করি মনে করি আমি।
যে ধন তোমারে দিব সেই ধন তুমি॥
তুমি সে আমার ধন আমি সে তোমার।
তোমার তোমাকে দিব কি যাবে আমার॥

[বঁধু তোমাকে কি দিব?—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধনই তোমাকে দিতে চাই—আমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধন তুমি। অতএব দান চলে না। তারপর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধন আমার জীবন। তাহারও ত তুমিই অধিকারী। নূতন করিয়া তাহা আর তোমাকে কি করিয়া দিব?]

আত্মসমর্পণের ভাষা ইহার চেয়ে অপূর্ব্ব আর কি আছে?

৭। এত দিনে অমিয়া সরোবরে আছিনু চিন্তামনি ছিল অঙ্কে।
চন্দন পবন হুতাশন হিমকরে বিষধর দিবসে কলঙ্কে॥

[শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় গিয়াছেন,—শ্রীরাধার কি দশা? শ্রীরাধা বলিতেছেন—এতদিন অমৃত-সরোবরে ছিলাম—অঙ্কে ছিল চিন্তামণি। আজ চন্দনাক্ত পবন হইয়াছে হুতাশন, চন্দ্রের কলঙ্ক আজ হইয়াছে বিষধর—চন্দ্র বি বর্ষণ করিতেছে।]

শ্রীকৃষ্ণের রূপবর্ণনা, শ্রীরাধার রূপবর্ণনা, রাধাকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ, গোষ্ঠবিহার, অনুরাগ, সম্ভোগ-মিলন, রাসলীলা, দানলীলা, অভিসার, মান, মানভঞ্জন, খণ্ডিতার আক্ষেপ, বিপ্রলব্ধার উচ্ছ্বাস ইত্যাদি বিষয়ে জয়দেব হইতে যে ধারা চলিয়া আসিয়াছে কবি সেই ধারাই অবলম্বন করিয়াছেন।

রূপ-বর্ণনায় উলট কদলী, কনক মহেশ, কষিত কাঞ্চন, তিলফুল, সিরিফল,

বাঁধুলী ইত্যাদির বিধিমত সমাবেশ আছে—কিন্তু রূপ-বর্ণনার বাড়াবাড়ি নাই। পূর্ব্বরাগের আয়োজনেরও বাড়াবাড়ি নাই। 'স্বপ্নদর্শনের' দ্বারা কবি পূর্ব্বরাগের অধিকাংশই সমাপ্ত করিয়াছেন। দুই একটি পংক্তিতে পূর্ব্বরাগের মাধুর্য্য দেখাইয়াছেন। যেমন—

হাসিয়া হাসিয়া মুখ নিরখয়ে মধুর কথাটি কয়।
ছায়ার সহিতে ছায়া মিশাইতে পথের নিকটে রয়।

শিশুকাল হৈতে বন্ধুর সহিতে পরাণে পরাণে নেহা ইত্যাদি পদও ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

কানুর প্রেমের দুর্নিবার আকর্ষণী শক্তির কথা কবি অতি অল্প কথায় ব্যক্ত করিয়াছেন—

কুল ছাড়ে কুলবতী সতী ছাড়ে নিজ পতি
সে যদি নয়ন কোণে চায়।

* * * *

যাচিয়া যৌবন দিতে কুলবতী ধায়।

চণ্ডীদাসের মত জ্ঞানদাসও লীলা-বিলাসের মাধুর্য্য বর্ণনা করিয়াছেন—

খেলত না খেলত লোক দেখি লাজ। হেরত না হেরত সহচরি মাঝ॥
বোলইতে বচন অলপ অবগাই। হাসত না হাসত মুখ মুচকাই॥
উলটি উলটি চলু পদ দুই চারি। কলসে কলসে জনু অমিয়া উগারি॥

এই চমৎকার রসচিত্র বৈষ্ণব-সাহিত্যেও দুর্লভ।

রসোদগারের পর্য্যায়ে অনুরাগের উল্লসিত উপচার বর্ণনায় চণ্ডীদাস, বলরামদাস, কবিরঞ্জন, গোবিন্দদাস ইত্যাদি অনেকেই পদ রচনা করিয়াছেন।

চণ্ডীদাস লিখিয়াছেন—

এমন পিরিতি কভু দেখি নাই শুনি। নিমিখে মানয়ে যুগ কোরে দূর মানি॥
সমুখে রাখিয়া করে বসনের বা। মুখ ফিরাইলে তার ভয়ে কাঁপে গা।

বাঙ্গালী বিদ্যাপতি লিখিয়াছেন—

হাত দিয়া দিয়া মুখানি মাজিয়া দীপ নিয়া নিয়া চায়।
দারিদ যেমন পাইয়া রতন থুইতে ঠাঞি না পায়।

নরোত্তম লিখিয়াছেন—

সমুখে রাখি মুখ আঁচরে মোছই অলকা তিলকা বনাই।
মদন রসভরে বদন হেরি হেরি অধরে অধর লাগাই।

ধরণীদাস লিখিয়াছেন—

ধরিয়া আমার করে বৈসায় আপন কোরে পুন দেই সিঁথায় সিন্দুর।
তাম্বুল সাজাঞা তোলে খাও খাও কত বোলে কত গুণ কহিব বন্ধুর।

বলরামদাস বলিয়াছেন—

বুকে বুকে মুখে চোখে লাগিয়া থাকে তবু মোরে সতত হারায়।
ও বুক চিরিয়া হিয়ার মাঝারে আমারে রাখিতে চায়।

এই সমস্তের তুলনায় জ্ঞানদাসের এই শ্রেণীর পদের রসের গাঢ়তা ও গভীরতা যেন বেশি। একমাত্র বলরামদাসই এ পর্যায়ের কবিতায় জ্ঞানদাসের নিকটবর্ত্তী।

১। হিয়ার উপর হইতে শেজে না ছোঁয়ায়।
বুকে বুকে মুখে মুখে রজনী গোঁয়ায়॥
নিদের আলসে যদি পাশ মোড়া দিয়ে।
কি ভেল কি ভেল বলি চমকি উঠিয়ে।
ইথে যদি মুঞি তেজি দীঘ নিশাস।
আকুল হইয়া পিয়া উঠয়ে তরাস॥

২। হিয়ায় হিয়ায় লাগিব বলিয়া চন্দন না মাখে অঙ্গে।
গায়ের ছায়া বায়ের দোসর সদাই ফিরয়ে রঙ্গে।

তিলে কত বেরি মুখানি হেরয়ে আঁচরে মোছয়ে ঘাম।
কোরে থাকিতে কত দূর হেন মানয়ে তেঞি সদা লয় নাম।

৩। হাসিয়া হাসিয়া মুখ নিরখয়ে মধুর কথাটি কয়।
ছায়ার সহিতে ছায়া মিশাইতে পথের নিকট রয়।
আমার অঙ্গের বরণ লাগিয়া পীতবাস পরে শ্যাম।
প্রাণের অধিক করের মুরলী লইতে আমার নাম।
আমার অঙ্গের বসন সৌরভ যখন যেদিগে পায়।
বাহু পসারিয়া বাউল হইয়া তখন সে দিগে ধায়।
লাখ কামিনী ভাবে রাতি দিনই যে পদ সেবিতে চায়।
জ্ঞানদাস কহে আহীর নাগরী পীরিতে বাঁধিল তায়।

কবি গোষ্ঠবিহারকে বর্জন করেন নাই বটে, কিন্তু সখ্যভাবকে তিনি বিশেষ প্রাধান্য দেন নাই। সুবল সাঙ্গাতকে অবশ্য মনের কথা বলিবার জন্য প্রয়োজন হইয়াছে—কিন্তু তাহা মধুর ভাবেরই উন্মেষের জন্য। বাৎসল্য ভাবের কবিতাও এই কবির নাই। অনুরাগের গভীরতা দেখাইবার জন্য কবি চেষ্টার ত্রুটী করেন নাই। অনুরাগ প্রসঙ্গে মাঝে মাঝে কবির লেখনী হইতে যে সমস্ত চমৎকার পংক্তি বিগলিত হইয়াছে তাহাদের দ্বারা যতটা গভীরতা ফুটিয়াছে—রাধার রূপ-বর্ণনায় বা রাধার হৃদয়োচ্ছ্বাসের আতিশয্যের অভিব্যক্তিতে ততটা ফুটে নাই। দৃষ্টান্ত—

১। তিলে কত বেরি মুখ নেহারয়ে আঁচরে মোছয়ে ঘাম।
কোরে থাকিতে কত দূর হেন মানয়ে তেঞি সদা লয়ে নাম।
জাগিতে ঘুমাতে আন নাই চিতে রসের পশরা কাছে।
জ্ঞানদাস কহে এমন পিরীতি আর কি জগতে আছে?

[কোরে থাকিতে কত দূর মানয়ে—চণ্ডীদাসের 'দুহুঁ কোরে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া—ইত্যাদি মনে পড়ায়। প্রেমবৈচিত্ত্যের অপূর্ব্ব বাগ্‌চিত্রণ।

গভীর প্রেমের মধ্যে দেহাত্মবোধ বিলুপ্ত হইলে ক্রোড়স্থাকেও দূরবর্তিনী মনে হয়।]

২। এক দুই গণনাতে অন্ত নাহি পাই।
রূপে গুণে রসে প্রেমে আরতি বাঢ়াই ॥
দণ্ডে প্রহরে দিনে মাসেকে বরিখে।
যুগ যুগান্তরে কত কলপে না দেখে ॥
দেখিলে মানসে যেন কভু দেখি নাই।
শঙ্খপদ্ম আদি কত মহানিধি পাই ॥

যাহা অসীম, অনন্ত তাহাতেই বৈচিত্র্য ও অপূর্বতা ফুরায় না। এ প্রেম অসীম ও অনন্ত মহাসিন্ধুর মত—তাই "দেখিলে মানসে যেন কভু দেখি নাই।" তাই ত অনুরাগ "তিলে তিলে নূতন হোয়।" তাই "জনম অবধি রূপ দেখিয়াও নয়ন তৃপ্ত হয় না।

৩। রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর।
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে।
পরাণ পীরিতি লাগি থির নাহি বান্ধে ॥ *

জ্ঞানদাসের এই পদটি তরুণ রবীন্দ্রনাথের মনে একটি চমৎকার সনেটের প্রেরণা দান করিয়াছিল। সেই সনেটটি এই—

প্রতি অঙ্গ কাঁদে তব প্রতি অঙ্গ তরে।
প্রাণের মিলন মাগে দেহের মিলন।

---

* দীনেশবাবু বলিয়াছেন—কে যেন জোড় ভাঙ্গিয়া বেজোড় করিয়া দিয়াছে। গল্প কথিত গ্রীক দেবতার ন্যায় কে যেন অখণ্ডকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলিয়াছে—সেই দুই খণ্ড পরস্পরের সঙ্গে জোড়া লাগিবার জন্য বিরহে হাহাকার করিতেছে। জীব যাহার অংশ তাহার বিরহে জীবের মন ব্যাকুল ....সে ইন্দ্রিয় দিয়া তাহাকে খুঁজিয়া বেড়ায়—তাই পরাণ পীরিতি তার থির নাহি বাঁধে।

হৃদয়ে আচ্ছন্ন দেহ হৃদয়ের ভরে
মূরছি পড়িতে চায় তব দেহ পরে।
তোমার নয়ন পানে ধাইছে নয়ন
অধর মরিতে চায় তোমার অধরে,
তৃষিত পরাণ আজি কাঁদিছে কাতরে,
তোমারে সর্বাঙ্গ দিয়ে করিতে দর্শন।
হৃদয় লুকানো আছে দেহের সাগরে,
চিরদিন তীরে বসি করিলো ক্রন্দন।
সর্বাঙ্গ ঢালিয়া আজি আকুল অন্তরে
দেহের রহস্য মাঝে হইব মগন।
আমার এ দেহ মন চির রাত্রি দিন,
তোমার সর্ব্বাঙ্গে যাবে হইয়া বিলীন।

এইখানে বলিয়া রাখি চণ্ডীদাসের হৃদয়াবেগের আতিশয্য ও গোবিন্দদাসের আলঙ্কারিকতার আতিশয্য দুইই রবীন্দ্রকাব্যকে প্রভাবান্বিত করে নাই। জ্ঞানদাসের সংযত প্রেমাবেগের আদর্শই রবীন্দ্রনাথের কাব্যে প্রভাব সঞ্চার করিয়াছে।

৪। ঘর হেন নহে মোর ঘরের বসতি।
বিষ হেন লাগে মোর পতির পীরিতি॥
আঁখে রৈয়া আঁখে নহে জাগিতে ঘুমিতে।
এক কথা লাখ হেন মনে বাসি ধাঁধি।
তিলে কতবার দেখি স্বপন সমাধি।
[প্রেমে আত্মহারা হৃদয়ের চমৎকার অভিব্যক্তি]

৫। কুটিল নেহারি গারি যবে দেয়বি তবহিঁ ইন্দ্রপদ মোর।
[প্রিয়ার মধ্যে মাধুরী ছাড়া আর কিছুই নাই—তাহার গালিও ইন্দ্রপদ-

গৌরবতুল্য। কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন—"প্রিয়া যদি মান করি করয়ে ভর্ৎসন। বেদস্তুতি হইতে হরে সেই মোর মন।" যে স্তবের যোগ্য এক গভীর প্রেম ছাড়া কেহ ত তাহাকে গালি দিতে পারে না।]

৬। হাসি দরশই মুখ ঝাঁপই গোই
বাদরে শশী জনু বেকত না হোই।
করে কর বারিতে উপজল প্রেম।
দারিদ ঘট ভরি পাওল হেম॥

[অভিমানিনী গৌরী রাধা হাসিয়া মুখ দেখাইয়া মুখখানি ঢাকিল, বাদলে যেন চাঁদ ব্যক্ত হইতে পাইতেছে না। হাতে হাত দিবামাত্র প্রেমসঞ্চার হইল—দরিদ্র যেন ঘট ভরিয়া সোনা পাইল।]

৭। শ্যাম সুধাকর নিকটহিঁ রোয়ত কুরু চিতকুমুদবিকাশ।
অঞ্চল অম্বর মানতিমির রহু দূরে রহু মদন হুতাশ।

[অভিমানিনী রাধাকে সম্বোধন করিয়া সখী বলিতেছে, শ্যাম সুধাকর নিকটে রোদন করিতেছে—চিত্তকুমুদ বিকসিত কর, মানের আঁধার আঁচলের আড়ালে থাকুক—মদনানল নির্বাপিত হউক।]

৮। তোমার মধুর গুণ কত পরখাপলু সবহু আন করি মানে।
যৈছন তুহিন বরিখে রজনীকর কমলিনী না সহে পরাণে।

[সখী শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছে—অভিমানিনী রাধার চিত্ত কিছুতেই ভুলাইতে পারিলাম না। তোমার গুণের কথা ফলাও করিয়া তাহার কাছে বিবৃত করিলাম—সে সব বিপরীত বুঝিল। চাঁদ হিম বর্ষণ করিলে কমলিনী যেমন সহ্য করে না—সেও তেমনি অনুরোধ উপরোধ সহ্য করিল না।]

৯। কাহে দেয়সি তুহুঁ আপন দীব।
আছয়ে জীবন সেহ কিয়ে নীব॥

[মানিনী শ্রীমতীর ভর্ৎসনার মধ্যেও কি গভীর দরদ ফুটিয়াছে! তুমি কেন নিজের দিব্য দিতেছ, তাহাতে তোমার অনিষ্ট হইতে পারে—তোমার নিজের অনিষ্ট সাধনের অর্থ ত আমার জীবন হরণ। জীবনটুকু এখনও আছে—তাহাও কি লইতে চাও?]

১০। অরুণন দুনয়নে নীর নাহি তেজই বিরহ অনলে দিয়া জারি।
পাবক পরশে সরস দারু যৈছে একদিশে নিকসয় বারি।

[বিরহ অনলে তনু জলিতেছে—চোখের জল অনবরত ঝরিতেছে। ভিজা কাঠ আগুনে দিলে যেমন ধিকি ধিকি জলিতে থাকে—অন্য একদিক দিয়া জল ঝরিতে থাকে—রাধার সেই দশা হইয়াছে।]

১১। আছিনু মালতী বিহি কৈল বিপরীত ভৈগেল কেতকী ফুলে।
কণ্টক লাগি ভ্রমর নাহি আওত দূরে রহি দুহুঁ মন ঝুরে॥

[শ্রীরাধা গুরুগঞ্জনায় ব্যাকুল হইয়া বলিতেছে—কুমারী অবস্থায় ছিলাম মালতী—বিবাহের ফলে হইলাম কেতকী—চারিদিকে কাঁটায় ঘেরা। কাঁটার জন্য ভ্রমর আর আসিতে পাইল না। ভ্রমর ও মালতী (অধুনা কেতকী) দূরে থাকিয়া দুইজনেই ছটফট করিতেছে।]

১২। কাঁদিতে না পাই বন্ধু কাঁদিতে না পাই।
নিশ্চয় মরিব তোমার চাঁদ মুখ চাই॥
চোরের রমণী যেন ফুকরিতে নারে।
এমতি রহিয়ে পাড়া পড়সীর ডরে।

[প্রাণ ভরিয়া ডুকরিয়া যে কাঁদিব তাহারও উপায় নাই। চোরের পত্নী যেমন ফুকারিয়া কাঁদিতে পারে না—আমারও সেই দশা হইয়াছে। চণ্ডীদাসের—চোরের মা যেন পোয়ের লাগিয়া ফুকারি কাঁদিতে নারে—এই পংক্তিই কি জ্ঞানদাস এখানে গ্রহণ করিয়াছেন?]

১৩। শুন শুন সই তোমাদেরে কই পড়িনু বিষম ফাঁদে।
অমূল রতন বেড়ি ফণিগণ হেরিয়া পরাণ কাঁদে।
গুরু গরবিত বোলে অবিরত এ বড়ি বিষম বাধা ॥
একুল ওকুল দুকুলে চাহিতে সংশয় পড়িল রাধা।

[একদিকে গুরু-গঞ্জনা অন্য দিকে শ্যামের পীরিতি—দোটানায় পড়িয়া রাধা বলিতেছে—অমূল্য রত্ন যেন ফণিগণে বেষ্টিত হইয়া আছে। রত্নের লোভও ছাড়িতে পারি না—ফণীর দংশনও সহ্য হয় না।]

১৪। সইলো পীরিতি দোসর ধাতা
বিধির বিধান সব করে আন না শুনে ধরম কথা।

[বিধির বিধান টলে না—বিধির বিধান সব অন্যথা করিয়া দেয়—কোন উপাসনা, কোন আবেদন, কোন ধর্মকথা শোনে না। শ্যামের পীরিতি হইয়াছে দ্বিতীয় বিধি—দ্বিতীয় ধাতা। বিধির বিধানের মত উহা আমাকে চালিত করিতেছে—জাতিকুল মান বা সতীধর্মের আবেদন কিছুই শুনিতে চায় না।]

চণ্ডীদাসকে বলা হয় দুঃখের কবি—আর বিদ্যাপতিকে সুখের কবি। বিরহ বা বিপ্রলম্ভ চণ্ডীদাসের আর সম্ভোগ-মিলন বিদ্যাপতির রসের মূল প্রেরণা। আমরা জ্ঞানদাসে দুইএরই মিলন দেখিতে পাই। জ্ঞানদাস কেবল বিপ্রলম্ভেই সাফল্য লাভ করেন নাই—সম্ভোগ-মিলনের কথাতেও কবির হৃদয়োচ্ছ্বাস অকুণ্ঠিত, তাহাতেও বিন্দুমাত্র অঙ্গহানি নাই। বসন্তোৎসব, হোলী, রাসলীলা ইত্যাদির উল্লাস-মাধুর্য্য কবির কাব্যে অপূর্ব্ব [illegible] ধারণ করিয়াছে।—বিদ্যাপতিকে ছাড়াইয়া যায় নাই বটে, কিন্তু এ বিষয়ে বিদ্যাপতির নীচেই জ্ঞানদাসের ঠাঁই।

পহিল হি হাস সম্ভাষ মধুর দিঠে পরশিতে প্রেম তরঙ্গ।
কেলি কলা কত দুহুঁ রসে উনমত ভাবে ভরল দুহুঁ অঙ্গ ॥
নয়ানে নয়ান ঢুলাঢুলি উরে উরে অধরে অমিয়া রস নেল।

রাস বিলাস শ্বাস বহে ঘনঘন ঘামে তিলক বহি গেল॥
বিগলিত কেশ কুসুম শিখিচন্দ্রক বেশভূষণ ভেল আন।
দুহুঁক মনোরথ পরিপূরিত ভেল দুহুঁ ভেল অভেদ পরাণ।

এই পংক্তিগুলিতে রসমত্ততা ফুটিয়াছে, কিন্তু লালসার জ্বালা নাই। জ্ঞানদাসের সম্ভোগরসের কবিতার বিশেষত্ব ইহাই। এই শ্রেণীর পদগুলি কবি ব্রজবুলিতে লিখিয়াছেন। তাহা দ্বারা তিনি গ্রাম্যতা আচ্ছন্ন করিতে পারিয়াছেন।

একদিকে গৃহে গুরুজনের গর্জ্জন, ক্ষুরধার স্বামীর তর্জ্জন—আর অন্যদিকে মুরলীধ্বনির আকর্ষণ—এই যে রাধা হৃদয়ের দোলাচল দ্বন্দ্ব—ইহাই হইয়াছে জ্ঞানদাসের বহুপদের প্রেরণা। প্রেমের চিরন্তনলীলার কোন অঙ্গ কবি বর্জ্জন করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না—কিশোরীর বাহিরে লজ্জা, অন্তরে পিপাসা, গরবিনীর মুখে কুলদর্প, সতীগৌরব, অন্তরে দাস্যভাবের পরাকাষ্ঠা, সাহসিকার অন্তরে সাহস, বাহিরে ভয়, অভিমানিনীর বহিরঙ্গে অহঙ্কারের স্তব্ধতা, অন্তরঙ্গে মিলন পিপাসার মুখরতা, উপেক্ষিতার বচনে জ্বালা—হৃদয়ে বরণমালা,—প্রেমলীলার এই চিরন্তন মিশ্রভাবগুলি কবির কাব্যে অপূর্ব্ব বাণীরূপ লাভ করিয়াছে।

কবি রসশাস্ত্রসম্মত পদ্ধতি রক্ষার জন্য রাধিকার অভিসারিকা, খণ্ডিতা, বিপ্রলব্ধা, মানিনী, কলহান্তরিতা ইত্যাদি বিবিধ নায়িকা রূপও চিত্রিত করিয়াছেন—এইগুলির মধ্যে বৈশিষ্ট্য বিশেষ কিছু নাই। কিন্তু মাথুর শ্রেণীর কবিতায় প্রোষিত-ভর্ত্তৃকা রাধার অন্তরের আর্ত্তি কবির কাব্যে করুণ আর্ত্তনাদে পরিণত হইয়াছে। ইহাতে কবি বিদ্যাপতিকেও অতিক্রম করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়।

জ্ঞানদাসের রচনায় অর্থালঙ্কার কিছু কিছু আছে—কিন্তু শব্দালঙ্কারের প্রতি তাঁহার আদৌ লোভ ছিল না। গোবিন্দদাস ও জগদানন্দ ছিলেন অতিরিক্ত অনুপ্রাসের ভক্ত—ছন্দোবৈচিত্র্যের দিকেও তাঁহাদের লোভ ছিল খুব বেশি।

বিদ্যাপতির রচনায় শ্লেষ যমকের ছড়াছড়ি—গোবিন্দদাস এ বিষয়ে বিদ্যাপতির ঘনিষ্ঠ শিষ্য। জ্ঞানদাস শব্দালঙ্কারের জন্য বিন্দুমাত্র ব্যস্ত হ'ন নাই—শাব্দিক চাতুর্য্য তাঁহাকে আবিষ্ট করে নাই। অতি সহজ সরল অনাড়ম্বর ভাষায় তিনি গভীর অনুভূতিগুলির অভিব্যক্তি দান করিয়াছেন। তাই বলিয়া তাঁহার ভাষার [illegible] ও অভাব নাই। স্বচ্ছ প্রাঞ্জল ভাষায় যতটা পারিপাট্য ও শ্রীসৌষ্ঠব দান করিতে পারা যায়—তাহাই তিনি দান করিয়াছেন—শব্দালঙ্কৃত ভাষার তুলনায় তাহা জোরালো ত হইয়াছেই—অর্থালঙ্কারমণ্ডিত ভাষার চেয়েও তাহা অধিকতর রোচনীয় হইয়াছে। মানভঙ্গের পর্য্যায়ে জয়দেব, বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস ইত্যাদি কবি শ্রীকৃষ্ণের মুখে অলঙ্কৃত ভাষা বসাইয়াছেন। যেন শ্রীমতী শ্রীকৃষ্ণের বাগ্‌বৈদগ্ধ্যে ও অলঙ্কার-চাতুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া মান পরিহার করিবেন। এ যেন 'অলঙ্কার' দিয়া গৃহিণীর মান ভাঙ্গানো। জ্ঞানদাস অলঙ্কৃত বাক্য একেবারে ব্যবহার করেন নাই তাহা নহে—তবে তাহাতে চাতুর্য্যের চেষ্টা নাই। যেমন—

শ্যাম সুধাকর নিকটহি রোয়ত কুরু চিত-কুমুদ-বিকাশ।
অঞ্চল অম্বর মানি তিমির বহু লোচন পড়ল উপাস॥

কিংবা প্রেমরতন জনু কনয়া কলস পুন ভাগ্যে যে হয় নিরমাণ।
মোতিমহার বার শত টুটয়ে গাঁথিয়ে পুন অনুপাম।

অনলঙ্কৃত ভাষার আকিঞ্চনই চমৎকার—

অবনীর ধূলি তুয়া চরণ পরশে। সোনা শতবাণ হৈয়া কাহে নাহি [illegible]ষে।
চাহ চাহ মুখ তুলি চাহ মুখ তুলি। পরশিতে চাই তুয়া চরণের ধূলি।
লেহ লেহ লেহ রাই সাধের মুরলি। নয়ান নাচনে নাচে হিয়ার পুতলি।

এক পংক্তিতে খণ্ডিতার আক্ষেপ কি গভীর ভাবেই ফুটিয়াছে দেখ—

'আমার বঁধুয়া আন বাড়ী যায় আমারি আঙিনা দিয়া।'

আবার এক কথায় কি মধুর অভিশাপ রাধার মুখে প্রকাশ পাইয়াছে

লক্ষ্য কর—রাধাকে যে চিনিয়াছে—রাধাচরিত্র যে জানে সে ইহার বেশি বলাইতে পারে না। "যে মোরে ছাড়িতে বলে হবে বধের ভাগী।"

অনলঙ্কৃত ভাষায় হৃদয়ের গভীর রসাবেগ প্রকাশের কয়েকটি দৃষ্টান্ত—

১। রূপের পাথারে আঁখি ডুবি সে রহিল।
যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল।
ঘরে যাইতে পথ মোর হইল অফুরান।
অন্তরে বিদরে হিয়া কি যে করে প্রাণ॥

[এখানে অলঙ্করণ নাম মাত্র—সহজ কথারই জোর বেশি।]

২। সখী বলিতেছেন—একি গো রাই, তোর সাজসজ্জা সব বিফল গেল? যদি শ্লথ শিথিল ধ্বস্ত স্রস্তই না হইল—তবে তোকে এত সাজাইলাম কি জন্য? তোর শ্যাম কি শিশু—না তোর হৃদয় কঠোর?

কস্তুরী চন্দন অঙ্গে বিলেপন দেখিয়ে অধিক উজোর।
বিবিধ কুসুমে বান্ধল কবরী শিথিল না ভেল তোর?
অমল বদন কমল মাধুরী না ভেল মধুপ সাত।
পুছইতে ধনি ধরণী হেরসি হাসি না কহছি বাত॥

এই অংশের ব্যঞ্জনা লক্ষণীয়।

৩। শ্রীকৃষ্ণের আদরের মধ্যে কি দরদই না প্রকাশিত হইয়াছে!

এস বস মোর কাছে রৌদ্র মিলয় পাছে
বসনে করি ে মন্দ বায়।
এ দুখানি রাঙা পায় কেমনে হাঁটিছ তায়
দেখিয়া হালিছে মোর গায়।

রবীন্দ্রনাথের 'পশারিণী' কবিতার শেষাংশ মনে পড়ে।

সহজে বরণ কালো তিমির পুঞ্জ ভেল অন্তর বাহির সমতুল।

৪। মরুক তোমার বোলে কলসী বাঁধিয়া গলে সে ধনী মজাক জাতি কুল।

একে হায় পরাধীনী তাহে কুল কামিনী ঘর হইতে আঙিনা বিদেশ।
যথাতথা থাকি আমি তোমা বই নাহি জানি সকলি কহসি সবিশেষ।
বড় বৃক্ষ ছায়া দেখি ভরসা করিনু মনে ফুলে ফলে কতই না গন্ধ।
সাধিলা আপন কাজ আমারে যে দিলা লাজ জ্ঞানদাস পড়ি রহু ধন্দ।

এখানে শ্রীরাধার আক্ষেপে কি বেদনাই ফুটিয়াছে !

৫। রাধার আক্ষেপ এই—প্রেমত অনেকেই করে—আমারই বা কেন এত জ্বালা—

কোন বিধি সিরজিল কুলবতী বালা।
কেবা নাহি করে প্রেম কার এত জ্বালা।
কিবা সে মোহন রূপ মোর চিত্ত বাঁধে।
মুখেতে না সরে বাণী দুটি আঁখি কাঁদে ॥

৬। প্রভাতে ব্রজশিশুগণ বাড়ীর সম্মুখের পথ দিয়া গোঠে যায়—প্রাণনাথকে সহজ ভাবে দেখিব তাহার উপায় নাই।—'হাতে প্রাণ ক'রে' তবে দেখিতে হয়।

অরুণ উদয় কালে ব্রজশিশু আসি মিলে
বিপিনে পয়ান প্রাণনাথ।
এক দিঠি গুরুজনে আর দিঠি পথ পানে
চাহিয়ে পরাণ করি হাথ।

৭। নিম্নলিখিত পংক্তিগুলি সুভাষিতের মর্য্যাদা লাভ করিয়াছে-

লঘু উপকার করয়ে যব সুজনক মানয়ে শৈল সমান।
অচলহিত করয়ে মুরুখ জনে মানয়ে সরিষ প্রমাণ।

[সুজনের লঘু উপকার করিলেও সে তাহাকে পর্ব্বত-প্রমাণ মনে করে—অচল-প্রমাণ হিত সাধন করিলেও মূর্খেরা তাহাকে সর্ষপ-প্রমাণ মনে করে।]

৮। শ্রীকৃষ্ণ অভিমানিনী রাধাকে বলিতেছেন—আমি এত সাধাসাধি

করিতেছি—উত্তর দিতেছ না, আমার নিবেদন না হয় উপেক্ষা করিলে,—'দারুণ দক্ষিণ পবন যব পরশব' তখন কি করিবে?

কোকিল নাদ শ্রবণে যব শুনবি তব কাঁহা রাখবি মান?
কোটি কুসুম শর হিয়া পর বরিখব তব কৈছে ধরবি পরাণ?

২। শ্রীকৃষ্ণ রাধাকে বলিতেছেন—

যে চাঁদের সুধা দানে জগৎ জুড়াও
সে চাঁদ বদনে কেন আমারে পোড়াও॥
অবনীর ধূলি তুয়া চরণ পরশে।
সোনা শতগুণ হইয়া কাহে নাহি তোষে॥
সে চরণ ধূলি পরশিতে করি সাধ।
জ্ঞানদাস কহে যদি কর পরসাদ॥

কবি রাধাশ্যামের মিলনকে বলিয়াছেন—'দুখ সঞে সুখ ভেল, দুহুঁ অতি ভোর।' রাধা অভিমান করিয়া বলিতেছেন 'বালিয়ার বাজি যেন তোমার পীরিতি হেন', "পানকেশ নহে গাঢ় পীরিতি।" রাধা প্রথম দর্শনকে 'পাষাণের রেখা' ও বৃথা প্রবোধকে বলিতেছেন 'পানির লিখন'। এই রূপ ছোট ছোট কথায় কবি অনেকটুকু ভাব সহজেই প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের বহুবল্লভতাকে কবি বলিয়াছেন 'ভ্রমর-বিলাস।' রাধাশ্যামের বহু আকাঙ্ক্ষিত আদরকে বলিয়াছেন 'ভাদরের বাদর।' 'সে সব আদর ভাদর বাদর কেমনে ধরিবে দে।'"

কয়েকটি বিখ্যাত কবিতা উদ্ধৃত করিয়া দেখাই জ্ঞানদাসের রচনা কিরূপ রসঘন—এই কবিতাগুলিতেই জ্ঞানদাসের বৈশিষ্ট্য পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান।

১। শ্রীকৃষ্ণের সহিত রাধার স্বপ্নে মিলন—একটি অপূর্ব্ব কবিতা।

মনের মরম কথা তোমারে কহিয়ে হেথা শুনশুন পরাণের সই।
স্বপনে দেখিনু যে শ্যামল বরণ দে তাহা বিনু আর কারো নই।

রজনী শাঙন ঘন ঘন দেয়া গরজন রিমিঝিমি শবদে বরিষে
পালঙ্কে শয়ন রঙ্গে বিগলিত চীর অঙ্গে নিন্দ যাই মনের হরিষে।
শিখরে শিখণ্ড রোল মত্ত দাদুরী বোল কোকিল কুহরে কুতূহলে।
ঝিঁঝিঁ ঝিনি ঝিনি বাজে ডাহুকী সে গরজে স্বপন দেখিনু হেনকালে।
মরমে পৈঠল সেহ হৃদয়ে লাগল লেহ শ্রবণে ভরল সেই বাণী।
দেখিয়া তাহার রীত যে করে দারুণ চিত ধিক রহু কুলের কামিনী।
রূপে গুণে রসসিন্ধু মুখছটা নিন্দে ইন্দু মালতীর মালা গলে দোলে।
বসি মোর পদতলে গায়ে হাত দেয় ছলে আমা কিন বিকাইনু বোলে।
কিবা সে ভুরুর ভঙ্গ ভূষণে ভূষিত অঙ্গ কাম মোহে নয়নের কোণে।
হাসি হাসি কথা কয় পরাণ কাড়িয়া লয় ভোলাইতে কত রঙ্গ জানে।
রসাবেশে দেই কোল মুখে না নিঃসরে বোল অধরে অধর পরশিল।
অঙ্গ অবশ ভেল লাজ মান ভয় গেল জ্ঞানদাস ভাবিতে লাগিল।

এই পদটি জ্ঞানদাসের একটি বিখ্যাত পদ।

"পরাণ নাথেরে স্বপনে দেখিলাম সে যে বসিয়া শিয়র পাশে।
নাসার বেশর পরশ করিয়া ঈষৎ মধুর হাসে।"

চণ্ডীদাসের এই পদটি স্বপ্নমিলনের পদ। সম্ভবতঃ এই পদটিকে অবলম্বন করিয়া জ্ঞানদাস প্রথম শ্রেণীর শিল্পীর মত উহাকে প্রথম শ্রেণীর কবিতায় পরিণত করিয়াছেন। একজন সমালোচক বলিয়াছেন—"নিরাভরণা সুন্দরীর গলে মোতির মালা পরাইয়া দিলে যেরূপ হয়, জ্ঞানদাস চণ্ডীদাসের পদটির তেমনি অঙ্গসৌষ্ঠব সাধন করিয়াছেন।" দুঃখের কবি চণ্ডীদাস স্বপ্নভঙ্গের বেদনাটির কথাও বলিয়াছেন। জ্ঞানদাস এমন মধুর স্বপ্নটিকে আর ভাঙ্গিতে দেন নাই। এই পদটি রামানন্দ বসুর—"তোমারে কহিয়ে সখি স্বপন কাহিনী" পদটিকেও মনে পড়ায়।

এই পদে রচনার সর্ব্বাঙ্গীণ পারিপাট্যের সহিত লক্ষ্য করিতে হইবে

সুখস্বপ্নের অনুকূল পরিবেষ্টনীটিকে। কবি যে প্রাকৃতিক আবেষ্টনীর মধ্যে রাধার নয়নে নিদ্রাবেশ ঘটাইয়াছেন—তাহা সুস্বপ্নের পক্ষে কেমন অনুকূল তাহাও লক্ষ্য করিতে হইবে। আর লক্ষ্য করিতে হইবে, বরিষণের রিনঝিম ধ্বনি, পালঙ্কের সুখশয্যা, ঝিল্লীর একটানা সুর, দাদুরী ডাহুকীর কলস্বর,—সর্বোপরি কবির কলচ্ছন্দের অনুরণন কেমন শ্রীমতীর ঘুমটিকে ঘনাইয়া আনিতেছে। তার পর স্বপ্নদৃষ্ট দয়িতের লীলা-মাধুরীটুকু স্বপ্ন ও তাহার ছন্দোময় রূপকে কি অপূর্বতা দান করিয়াছে—তাহাও লক্ষ্য করিতে হইবে।

এই কবিতাটি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের কল্পনাকে চঞ্চল করিয়াছিল। তিনি একস্থলে লিখিয়াছেন—"অন্ধকার বাদলা রাতে মনে পড়ছে ঐ পদটা—রজনী শাঙন ঘন ঘন দেয়া গরজন…………স্বপন দেখিনু হেন কালে।

সেদিন রাধিকার ছবির পিছনে কবির চোখের কাছে কোন্ একটি মেয়ে ছিল। ভালবাসা কুঁড়িধরা তার মন, মুখচোরা সেই মেয়ে, চোখে কাজল পরা, ঘাট থেকে নীল শাড়ি নিঙাড়ি নিঙাড়ি চলা। সে মেয়ে আজ নাই। আছে শাঙন ঘন, আছে সেই স্বপ্ন, আজো সমানই।"

আর একস্থলে কবি বলিয়াছেন—

সঘন নিশীথে গর্জিছে দেয়া রিমি ঝিমি বারি বর্ষে।
মনে মনে ভাবি কোন পালঙ্কে কে নিদ্রা যায় হর্ষে।
গিরির শিখরে ডাকিছে ময়ূর কবি কাব্যের রঙ্গে।
স্বপ্ন পুলকে কে জাগে চমকি বিগলিত চীর অঙ্গে।

২। মানস-গঙ্গার জল ঘন করে কলকল
দুকূল বহিয়া যায় ঢেউ,
গগনে উঠিল মেঘ পবনে বাড়িল বেগ
তরণী রাখিতে নারে কেউ।

নবীন কাণ্ডারী শ্যাম রায়।
কখনও না জানে কান বাহিবার সন্ধান
জানিয়া চড়িনু কেন নায়।
মেঘের নাহিক ভয় হাসিয়া কথাটি কয়
কুটিল নয়নে চাহে মোরে।
ভয়েতে কাঁপিছে দে এ জ্বালা সহিবে কে
কাণ্ডারী ধরিয়া করে কোরে।
অকাজে দিবস গেল নৌকা পার নাহি হলো
পরাণ হইল পরমাদ।
জ্ঞানদাস কহে সখি স্থির হইয়া থাক দেখি
এখনি না ভাবিহ বিষাদ।

নাবিকবেশী শ্রীকৃষ্ণ ব্রজগোপীগণকে যমুনা পার করিয়া দিতেছে—মানস গঙ্গার জলে তরণী টলমল—গগনে উঠিল মেঘ—পবনে বাড়িল বেগ। ব্রজগোপীরা ভয়ে আর্ত্তনাদ করিতেছে। ব্যাপার বিচিত্র কিছু নয়—কিন্তু এই কবিতা আমাদিগের চিত্তকে অজ্ঞাতসারে যমুনাতীর হইতে ভবনদীর পারে লইয়া যায়। কবি ইহাতে কোন Symbolical Significance হয়ত দিতে চাহেন নাই—কিন্তু রচনার গুণে পদটি বর্ত্তমান যুগের কবির চিত্তকে লোকোত্তর রসলোকে উত্তীর্ণ করিয়া দিতেছে।

দিবালোক যায় চ'লে, দিগন্তে পড়েছে ঢ'লে
ক্ষীণতেজা দিনান্ত-তপন,
মাথার উপর দূরে বকপাঁতি যায় উড়ে
কোথা রেখে ধবল স্বপন।
ও পারের পানে চাহি বসে আছি, তরী বাহি
কাণ্ডারী করিছে পারাপার।

খেয়াঘাটে বসি হেরি আমারো ত নেই দেরি,
চমকিয়া উঠি বার বার।
মানভার, লজ্জাভার, ঋণভার, সজ্জাভার,
মায়া-মোহ-শৃঙ্খলের বোঝা
সাথে মোর হাতে ঘাড়ে, শির পৃষ্ঠ স্কন্ধ ভারে
পার হওয়া মোর নয় সোজা।
ভারমুক্ত নাহি হ'লে 'মোরে পার কর' ব'লে
কাণ্ডারীরে ডাকিব কি করি ?
তরী বাহি যায় আসে কোন ভার লয় না সে,
কোন ভার সয় না সে তরী।
সব চেয়ে গুরুভার মনোবাস বাসনার,
ভারী যেন বিশাল পাষাণ,
কেমনে এ ভার কাটে ভাবি ব'সে পার ঘাটে,
স্মরি নৌকা-বিলাসের গান।
"মানস-গঙ্গার জল ঘন করে কলকল
দুকূল বহিয়া যায় ঢেউ,
গগনে উঠিল মেঘ পবনে বাড়িল বেগ,
তরণী রাখিতে নেই কেউ।"
দুকূল বহিছে বায় কাঁপিছে রাধার গায়,
ভাঙ্গা তরী সহেনাক ভর।
কানু কয় "এই নদী পার হ'তে চাও যদি
নীরে ডারো ক্ষীরদধিসর।
বলয়-নূপুর-হার আদি সব অলঙ্কার
এ সবের রেখ না মমতা,

অই সব ভার ধরি' টলমল মোর তরী
লঘু কর তব তনুলতা।
শুধু এই ভার কেন? তব বসনেরো জেন,
ভারটুকু এ তরী না সয়।
পার হবে ভরা নদী জয় কর ত্বরা যদি
সব মায়া, সব লজ্জাভয়।"
জানি না, কি ভাবি কবি এঁকেছেন এই ছবি,
হয় ত বা রসেরই কৌশল,
আজি খেয়া-ঘাটে পড়ি অই চিত্র শুধু স্মরি
চোখে মোর ঝরে অশ্রুজল।
বেদনা-বিধুর চিত্তে সেই অশ্রুজলে তিতে
বাসনা-বসন হয় ভারী।
বসনে গুছিত মন বাসনা-কুণ্ঠিত জন
অকূলে কেমনে দিবে পাড়ি?

সুখের লাগিয়া এঘর বাঁধিনু আগুনে পুড়িয়া গেল।
অমিয়া সাগরে সিনান করিতে সকলি গরল ভেল।
সখি কি মোর কপালে লেখি।
শীতল বলিয়া চাঁদ সেবিনু ভানুর কিরণ দেখি।

• • • •

পিয়াস লাগিয়া জলদ সেবিনু পাইনু বজর আগে
জ্ঞানদাস কহে পীরিতি করিয়া পাছে কর অনুরাগে।

ভাবটির জন্য নহে—ভাবপ্রকাশের ভঙ্গী এই কবিতায় এমনই চমৎকার যে ইহা বঙ্গসাহিত্যে চিরন্তনতা লাভ করিয়াছে। যুগেযুগে অভাগার কণ্ঠে ইহা প্রাণের ভাষা দিয়াছে বলিয়াই ইহা চমৎকার।

৪। মুড়াব মাথার কেশ ধরিব যোগিনী বেশ যদি সই পিয়া নাহি এল।
এহেন যৌবন পরশ রতন কাচের সমান ভেল॥
গেরুয়া বসন অঙ্গেতে পরিব শঙ্খের কুণ্ডল পরি।
যোগিনীর বেশে যাব সেই দেশে যেখানে নিঠুর হরি।
আপন বঁধুয়া আনিব বাঁধিয়া কেবা করিবারে পারে,
যদি রাখে কেউ তেজিব এ জিউ নারীবধ দিব তারে।
পুন ভাবি মনে বাঁধিব কেমনে সে শ্যাম বঁধুর হাতে।
বাঁধিয়া কেমনে ধরিব পরাণে তাই ভাবিতেছি চিতে।
জ্ঞানদাস কহে বিনয় বচনে শুন বিনোদিনী রাধা।
মথুরা নগরে যেতে মানা করি দারুণ কুলের বাধা।

৫। গগন ভরল নব বারিদরে বরখা নব নব ভেল,
বাদর দরদর ডাকে ডাহুকি সব শবদে পরাণ হরি নেল।
চাতক চকিত নিকট ঘন ডাকই মদন বিজয়ী দিকরাব।
মাস দশ আট গাত কত বিরহ বরখা কেমন গোঙাব।
সরসিজ বিনু সে শোভা না পাবই ভ্রমর, বিনু ধূন দেহা।
হাম কমলিনী কানু দেশান্তরে কত না সহব দুখ দেহা।
সঘন সঘন সৌদামিনী ঘন ঝিকিমিকি বিজুরি মার।
মাস শাঙনে আশ নাহি জীবনে বরিখয়ে জল অনিবার।
নিশি আঁধিয়ারে অধিক ঘোরতর ঝিঁকি কল কল ভাগ।
বিরহিণী হৃদয় বিদারণ ঘন ঘন শিখরে শিখণ্ডিনী ডাক।
উনমতি প্রকৃতি আরোপয়ে নিতি নিতি মনমথ সাধন লাগি।
ভাদর দরদর দেহ দোলন মন্দিরে একলি অভাগি।

প্রকৃতির সহিত মানবাত্মার গূঢ় সংযোগের তথ্য প্রাচীন কবিদের ধ্যাননেত্রে কেমন ধরা পড়িয়াছিল, এই কবিতা তাহার দৃষ্টান্ত।

৬। আজু পরভাতে কাক কলকলি আহার বাঁটিয়া খায়।
বন্ধু আসিবার নাম সুধাইতে উড়িয়া বৈসয়ে তায়।
বঁধুয়া আসিয়া হাসিয়া হাসিয়া মিলিব আমার পাশে।
তুরিতে হেরিয়া চকিতে উঠিয়া বদন ঝাঁপিব বাসে।
তা হেরি নাগর রসের সাগর আঁচরে ধরিবে মোর।
করে কর ধরি গদগদ করি কহিবে বচন থোর।
তবহি মিনন দেখিয়া বদন হইয়া লাগব ভোরে।
আঁখি ছল ছলে গদগদ বোলে কত না সাধিবে মোরে।
সময় জানিয়া থির মানিয়া পুরাব মনের আশ।
এ সকল বাণী ফলিবে এখনি কহে কবি জ্ঞানদাস।

ভাবিক অলঙ্কারের সাহায্যে কবি এখানে বিরহিণী রাধার মিলন-স্বপ্নকে অপূর্ব্ব বাণীরূপ দিয়াছেন।

৭। মাধব কৈছন বচন তোহার।
আজি কালি করি দিবস গোঙাইতে জীবন ভেল অতি ভার।
পন্থ নেহারিতে নয়ন আঁধায়ল দিবস লিখিতে নখ গেল।
দিবস দিবস করি মাস বরিখ গেল বরিখে বরিখে কত ভেল।
আওব করি করি কত পরবোধব অব জীউ ধরই না পার।
জীবন মরণ চেতন অচেতন নিতিনিতি ভেল তনু ভার।
চপল চরিত্র তুয়া চপল বচনে আর কতই করব বিশোয়াস।
ঐছে বিরহে যব জনম গোঙায়ব তব কি করব জ্ঞানদাস।

রাধার এই প্রতীক্ষা শবরীর প্রতীক্ষার চেয়েও করুণ। এই কবিতায় যে আর্ত্তি ফুটিয়াছে, তাহা কেবল রাধার ও কবির নয়, উহা নিখিল মানবের।

বৈষ্ণব কবিতার স্বরূপ

প্রেমলীলার গান বলিয়া বৈষ্ণব কবিতাকে যাঁহারা লালসা-সাহিত্য মনে করেন, তাঁহারা ভ্রান্ত। বৈষ্ণব পদাবলী আগাগোড়া বেদনারই কাহিনী। পূর্ব্বরাগ হইতে মাথুর পর্য্যন্ত সমস্তই বেদনার গভীর রঙে অনুরঞ্জিত।

শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া অবধি রাধার প্রাণে সোয়াথ (স্বস্তি) নাই। তাঁহার 'মন উচাটন, নিশ্বাস সঘন।' 'বিরতি আহারে রাঙা বাস পরে যেমত যোগিনী পারা।' "মন্দাকিনী ধারা কত শত ধারা ও দুটি নয়নে বহে।"

"সঘনহি শ্যামর পরিজন পামর ঝামর মুখ অরবিন্দ।"

"ঝর ঝর লোরহি লোলিত কাজর বিগলিত লোচন নিন্দ।"

"অরুণ অধর বান্ধুলি ফুল। পাণ্ডুর ভৈ গেল দুস্থর তুল।"

"অঙ্গুল অঙ্গুরী বলয়া ভেল।" "মন্দির গহন দহন ভেলা চন্দনা।"

"হিয়ার ভিতরে লোটায়্যা লোটায়্যা কাতরে পরাণ কান্দে।"

"বাহিরে সোয়াস নাই নিন্দ দূরে গেল গো হিয়া উহু উহু মন ঝুরে।"

"উহু উহু আনছান ধক ধক করে প্রাণ কি কৈল রহিতে নাহি ঘরে।"

"কালার ভরমে কেশ কোলে করি কালা কালা করি কান্দি।
কেশ আউলাইআ বেশ বনাইতে হাত নাহি সরে বান্ধি।"

এই সমস্ত কথা গভীর বেদনারই অভিব্যক্তি। রাধার অন্তরে এই যে আগুন জ্বলিল—এই আগুন একদিনের জন্যও নিভে নাই।

শ্রীকৃষ্ণের দর্শনও তথৈব চ। যে রূপশ্রীকে আশ্রয় করিয়া তথাকথিত লালসার গান তাহাও ত বেদনায় মলিন হইয়া গেল।

শ্রীমতী কৃষ্ণ-প্রেম প্রাণে পোষণ করিয়া চির দুঃখকেই বরণ করিলেন।

"পাসরিতে করি মনে পাসরা না যায় গো কি করিব কি হবে উপায়।"

"জ্বল নহে হিমে তনু কাঁপাইছে সব অঙ্গ প্রতি অণু শীতল করিয়া।"

"অস্ত্র নহে মনে ফুটে কাটারিতে যেন কাটে ছেদন না করে হিয়া মোর।
তাপ নহে উষ্ণ অতি পোড়ায় আমার মতি বিচারিতে না পাইয়ে ওর।"
"শঙ্খ-বণিকের করাত যেমন আসিতে যাইতে কাটে।"

যদিবা শ্যামের বাঁশরী রাগপীড়িতাকে রাধা রাধা বলিয়া আহ্বান করিল কিন্তু রাধা কি করিয়া শ্যামের সঙ্গে মিলিত হইবেন? শ্রীমতীর আকিঞ্চন—

হাম অতি দুখিত তাপিত তাহে পরবশ তাহে গুরুগঞ্জন বোল।
গৃহের মাঝারে থাকি যেমন পিঞ্জরে পাখী সদা ভয়ে চিউ উতরোল।

পরিজন গুরুজন মিলনের বাধা। তাহাদের তর্জন শাসন মাথার উপরে, "দুরুজন নয়ন পহরী চারিদিকে।" 'অনুখন গৃহে মোর গঞ্জয়ে সঘনে।"

"আর তাহে তাপ দিল পাপ ননদিনী।
বাঘের মন্দিরে যেন কম্পিত হরিণী॥"
বিষের অধিক বিষ পাপ ননদিনী।
দারুণ শাশুড়ী মোর জলন্ত আগুনি॥"
"শানায়ো ক্ষুরের ধার স্বামী দুরজন।
পাঁজরে পাঁজরে কুলবধূর গঞ্জন॥"

একদিকে কুলশীল, অন্যদিকে কালা। শ্রীমতী—

একূল ওকূল দুকূল চাহিতে পড়িল বিষম ফাঁদে।
অমূল্য রতন বেড়ি ফণিগণ দেখিয়া পরাণ কাঁদে।"

চণ্ডীদাস বলিয়াছেন—"ক্ষুরের উপর রাধার বসতি।"

এই রাধার জীবনে লালসার ঠাঁই কোথা?

তারপর কলঙ্কের জ্বালা। "গোকুলে গোয়ালা কুলে কেবা কি না বোলে। লোকভয় লাগিয়া যে ডরে প্রাণ হালে॥ চোরের রমণী যেন ফুকরিতে নারে। এমতি রহিয়ে পাড়া পড়শীর ডরে॥" "জগভরি কলঙ্ক" রহিয়া গেল। 'পাপিয়া পাড়ার লোকে' ঠারাঠারি করিতে লাগিল।

'পালঙ্কে শয়ন রঙ্গে বিগলিত চীর অঙ্গে' স্বপ্নেই তাহাকে পাওয়া যায়, সত্য সত্য রক্তমাংসের দেহে ত তাহার সহিত মিলন হয় না। কুলবতী রমণী কি করিয়া মিলন সুখ লাভ করিবে? "একে হাম পরাধীনী তাহে কুলকামিনী ঘর হৈতে আঙিনা বিদেশ।" এত ঝঞ্ঝাটের মধ্যে তাই 'গুরুজন নয়ন সকণ্টক বাটে' অভিসার। এই অভিসারে প্রকৃতির বাধাও কম নয়। আকাশের চাঁদও বাধা। "কৈছনে চান্দ উদয় ভেল দারুণ পশারল কিরণক দামা।" "হিমকর কিরণে গমন অবরোধল কী ফল চলতহুঁ গেহ।"

গ্রীষ্ম মধ্যাহ্নে পথঘাট নির্জ্জন বটে, কিন্তু তখনও প্রকৃতির বাধা কম নয়।

একে বিরহানল দহই কলেবর তাহে পুন তপন কি তাপ।
দামিনি গলয়ে তনু ক্ষীণ পুতলী জনু হেরি সখী করু পরিতাপ।

বর্ষা রজনী প্রিয় সঙ্গ ছাড়া কি করিয়া কাটে?

"মত্ত দাদুরী ডাকে ডাহুকী ফাটি যাওত ছাতিয়া।"
"দহয়ে দামিনি ঘন ঘনঝনি পরাণ মাঝারে হানে।"

পঙ্কিল পিচ্ছল বাটে কঠিন কবাট ঠেলিয়া অভিসারে যাইতে হয়। সে বাট কি ভয়ঙ্কর! ভুজগে ভরল পথ কুলিশ পাত শত আর কত বিঘিনি বিথার।

বর্ষার দুর্দ্দিনে রাধার দুর্গতির অবধি নাই। তাহার উপর শ্যামের জন্যও রাধার উদ্বেগের সীমা নাই।

"আঙিনার কোণে বঁধুয়া ভিজিছে দেখিয়া পরাণ কাটে।"
"গগনে অবঘন মেহ দারুণ সঘনে দামিনি ঝলকই।
কুলিশ পাতন শব্দ ঝন ঝন পবন খরতর বলগই॥
তরল জলধর বরিখে ঝরঝর গরজে ঘনঘন ঘোর।
শ্যাম নাগর একলি কৈছনে পন্থ হেরই মোর॥"

অভিসারে গিয়াও দয়িতকে পাওয়া যাইবে এ বিষয়েও স্থিরতা নাই। প্রতীক্ষার বেদনা আছে।

"পথ পানে চাহি কত না রহিব কত প্রবোধিব মনে।"

'পৌষলি রজনীতে' লোকে আপন গৃহে বসিয়াই কাঁপিতেছে। এহেন রজনীতে অভিসারে আসিয়াও কাহ্নর দেখা নাই।

"না দেখিয়া তঁহি বর নাগর কান। কাতর অন্তর আকুল পরাণ॥
গুরুজন নয়ন পাশগণ বারি। আয়লুঁ কুলবতি চরিত উঘারি॥
ইথে যদি না মিলল সো বর কান। কহ সখি কৈছনে ধরব পরাণ॥"

"ফুলশরে জরজর সকল কলেবর কাতরে মহি পড়ি যাই।
কোকিল বোলে ডোলে ঘন জীবন উঠি বসি রজনী গোঙাই॥"

দারুণ প্রতীক্ষায় 'সুদীঘল' রাত্রির মুহূর্তগুলিকে শ্রীমতীর এক একটি কল্প বলিয়া মনে হয়—অশ্রুতে সম্ভোগ-তত্ত্বের সহিত সংযোগ কল্প ও ভাসিয়া যায়।

'চৌরি পীরিতি' যতই মধুর হউক, রাধার পক্ষে মিলন দুর্লভ।—বিরহেরই প্রাধান্য ইহাতে। এই বিরহ বেদনার গানই বৈষ্ণব পদাবলীর প্রধান অঙ্গ।

১। যাহে বিহু সপনে আন নাহি দেখিয়ে অব মোহে বিছুরল সোই।

২। নব কিসলয় দলে শুতলি নারি। বিষম কুসুম শর সহই না পারি॥
হিমকর চন্দন পবন ভেল আগি। জীবন ধরয়ে তুয়া দরশন লাগি॥

৩। কবহু রসিক সনে দরশ হোয় জনি দরশনে হয় জনি নেহ।
নেহ বিচ্ছেদ জনি কাহুকে উপজয়ে বিচ্ছেদে ধরয়ে জনি দেহ॥

৪। অগোর চন্দন তনু অনুলেপন কো কহে শীতল চন্দা।
পিয়ে বিনে সো পুন আনল বরিখয়ে বিপদে চিনিয়ে ভালমন্দা॥

৫। অঙ্গুলক আঙুটি সে ভেল বাউটি হার ভেল অতিভার।
মনমথ বাণহি অন্তর জরজর সহই না পারিয়ে আর।

এই ভাবে বৈষ্ণব কবিগণ শ্রীমতীর বিরহ-বেদনার বর্ণনা করিয়াছেন। নিম্নে তাঁহাদের রচনার একটি সংক্ষিপ্তসার রচনা করিয়া দেওয়া হইল, সখীদের জবানীতে—

শ্যাম বুঝি শেষে পাতকী হইলে নারী হত্যার পাপে।
ননীর পুতলি পিয়ারী আজিকে গলিল বিরহ তাপে।
দীঘল নিশ্বাসে মুখ পঙ্কজ ঝামর হইয়া দুলে।
অঙ্গুরী আজি বলয় হইয়া অঙ্গুলি হতে খুলে।
বড় গুরুভার লাগে পিয়ারীর মুক্তাফলের মালা।
অম্বর তার খসিয়া পড়িছে নাহি সম্বরে বালা।
গহন বিরহ দহনে দহিয়া মুহুমুহু মুরছায়।
তোমার নামটি কর্ণে জপিলে তবে সে চেতনা পায়।
নির্জন পেলে তরুণ তমালে মোহে আঁকড়িয়া চুমে।
চারিদিকে তার হয়েছে আঁধার মনোজের ধূপধূমে।
নীল অম্বর সহিতে পারে না তব স্মৃতি মনে জাগে।
অরুণাম্বরে এ তনু ঝেঁপেছে যোগিনীর মত লাগে।
ঝরঝর করি বারিধারা চোখে কাজর গলায়ে ঝরে
তাহার সহিত নয়নের নীদ সারা নিশি গ'লে পড়ে।
নব জলধর গগনে উদিলে এমন করিয়া চায়।
মনে হয় যেন দীঘল নিশ্বাসে উড়াইয়া দিবে তায়।
হে শ্যাম জলদ, তোমার আশায় রোপিয়া প্রেমের তরু,
নয়নের জলে বাঁচায়ে রেখেছে সখীর জীবন-মরু।
বাঁধুলী অধর ধুতুরা হইল বিরহের বেদনায়,
বাঁশী তোমার দংশিয়া প্রাণে কি বিষে জারিল তায়।
খই হয়ে ফুটে মুকুতার হার বক্ষের তাপে জ্বলে।
কনক ভূষণ সোনার অঙ্গে মিশে যায় গ'লে গ'লে।
কবরী এলায়ে কালো কেশপাশ বক্ষের পরে দোলে।
বক্ষে চাপিয়া সেই কেশপাশ ক্ষণিক বেদনা ভোলে।

নবমী দশায় এসেছে পিয়ারী হ'য়ো না স্ত্রীবধপাপী।
তোমার বিরহে হয়ে পতঙ্গী শিখা,পরে মরে ঝাঁপি।
চরণ-নখরে মাটির উপরে কি যেন লিখিছে রাই,
যত তত তারে জিজ্ঞাসা করো কোন উত্তর নাই।
জলে দাবানল সারা তনু ভরি, পুড়ে সবি তারি আঁচে।
মর্মকুহরে আশার বাঁধনে প্রাণ-মৃগ বাঁধা আছে।
জ্বালা না জুড়ায় তালবৃন্তের বাজনের পরিমলে।
ধূমকুণ্ডলী ভেদি হুতাশন তায় আরো উঠে জ্বলে।
শিথিল হয়েছে আমার সখীর শিরীষ-পেলব তনু।
অলিদল তারে দলিত করেছে নির্দয় ফুলধনু।
দরদী বসন তেয়াগি বিলাস ছাড়িয়া সখীর বুক,
করিছে বাজন ঘুচায় ঘর্ম মুছায় তাহার মুখ।
তোমার দেখানে সোনার বরণ তোমারি মতন কালা,
লজ্জার সাথে সজ্জা লইছে আজিকে বিরহ জ্বালা।
সে যে হিমকরে হেরি অম্বরে প্রলাপ বকিতে রহে।
তুলা খানি তার নাসায় ধরিলে বুঝা যায় শ্বাস বহে।
কিসলয় শেজ মলিনিয়া যায় আর কি অধিক কব?
অঙ্গে তার তনু-কনক-মুকুরে শতেক বিম্ব তব।

বিরহের সঙ্গে অনুতাপ ও আত্ম-ধিক্কারের বেদনা আছে। লাজে জলাঞ্জলি দিয়া শ্রীমতী যাহার জন্য কলঙ্কের ডালা মাথায় লইলেন,সে যদি উপেক্ষা করে, তবে সে বেদনা রাখিবার স্থান নাই। অভিমানিনী রাধা শ্যামের সামান্য উপেক্ষাও সহিতে পারিতেন না। ক্ষণে ক্ষণেই তাঁহার মনে হইত দুষ্ট নট শ্যামনটবর বুঝি তাহাকে ভুলিয়া গেল। এই চিন্তায় রাধার বিরহ-বেদনা দ্বিগুণিত হইত। তখন রাধার অন্তরস্থ আক্ষেপ শত শিখায় ও ভাষায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত।

১। কাঞ্চন কুসুম জ্যোতি পরকাশ। রতন ফলিবে বলি বাঢ়ায়লুঁ আশ।
তাকর মূলে দিলুঁ দুধক ধার। ফলে কিছু না দেখিএ ঝনঝনিসার।

২। কাঠ-কঠিন কয়ল মোদক উপরে মাখিয়া গুড়।
কনয়া কলস বিষে পূরাইল উপরে দুধক পূর॥

৩। যত্ন করি রুপিলাম অন্তরে প্রেমের বীজ
নিরবধি সেঁচি আঁখিজল।
কেমন বিধাতা সে এমতি করিল গো
অমিয়া বিরিখে বিষ ফল।

৪। শীতল বলিয়া যদি পাষাণ কৈলাম কোলে।
এ দেহ অনলতাপে পাষাণ সে গলে।

৫। সোনার গাগরী বিষজলে ভরি কেবা আনি দিল আগে।
করিনুঁ আহার না করি বিচার এ বধ কাহার লাগে।
নীর লোভে মৃগ পিয়াসে যাইতে ব্যাধ-শর দিল বুকে।
জলের শফরী আহার করিতে বড়শী লাগিল মুখে।

৬। সুখের লাগিয়া এঘর বাঁধিনু অনলে পুড়িয়া গেল।
অমিয়া সাগরে সিনান করিতে সকলি গরল ভেল।

৭। জ্বালার উপর জ্বালা সহিতে না পারি।
বন্ধু হৈল বিমুখ ননদী হৈল বৈরী॥
গুরুজন কুবচন সদা শেলের ঘায়।
কলঙ্কে ভরিল দেশ কি হবে উপায়॥

শ্রীমতী বলিতেছেন—এক কাল হৈল মোর নহলি যৌবন। শুধু যৌবন নয়, বৃন্দাবন, যমুনার জল, কদম্বের তল, রতন ভূষণ, সবই কাল হইল শ্রীমতীর।

এ সব ত গেল [illegible] বাণী। রাধার পক্ষ হইতে দৈন্যঘন করুণ আবেদনও আছে—

১। রাতি কৈনু দিবস দিবস কৈনু রাতি। বুঝিতে নারিনু বন্ধু তোমার পীরিতি।
ঘর কৈনু বাহির বাহির কৈনু ঘর। পর কৈনু আপন আপন কৈনু পর।
বন্ধু তুমি যদি মোরে নিকরুণ হও। মরিব তোমার আগে দাঁড়াইয়া রও॥
২। এ দুখ কাহারে কব কে আছে এমন। তুমি সে পরাণ বন্ধু জান মোর মন।
৩। মোর দিব্য লাগে বঁধু মোর দিব্য লাগে।
চাঁদ মুখ দেখি মরি দাঁড়াও মোর আগে।

শ্রীমতী বলেন—"লোকভয়ে কান্দিতে না পাই বন্ধু কান্দিতে না পাই।"
"রন্ধনশালায় যাই তুয়া বঁধু গুণ গাই ধোঁয়ার ছলনা করি কান্দি"। বাদিত্রা শ্রীমতী দীনতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া বলিলেন—

কালা মাণিকের মালা গাঁথি নিব গলে। কানু গুণযশ কানে পরিব কুণ্ডলে।
কানু অনুরাগ রাঙ্গা বসন পরিয়া। দেশে দেশে ভরমিব যোগিনী হইয়া।

শ্রীমতী ভুলিবার চেষ্টা করিয়াও ভুলিতে পারেন না—

১। এ ছার নাসিকা মুঞি যত করি বন্ধ।
তবুও দারুণ নাসা পায় শ্যাম গন্ধ।
২। কানড় কুসুম করে পরশ না করি ডরে
এ বড় মনের এক বাধা।
যেখানে সেখানে যাই সকল লোকের ঠাঁই
কানাকানি শুনি এই কথা।
সই লোকে বলে কালা পরিবাদ।

কালার ভরমে হাম জলদে না হেরি গো তেজিয়াছি কাজরের সাধ।
কিন্তু তায় এমনি জ্বালা যে পাসরিলে না যায় পাসরা।
কালিন্দীর জল নয়ানে না হেরি বয়ানে না বলি কালা।
তবুও সে কালা অন্তরে জাগয়ে কালা হৈল জপ মালা।
মধুর মিলনের স্মৃতির বেদনাই কি কমনি দারুণ!

১। হাসিয়া পাঁজর কাটা কৈয়াছে কথা খানি
সোঙরিতে চিতে উঠে আগুনের খনি।
২। নিরবধি বুকে থুইয়া চায় চোখে চোখে।
এ বড় দারুণ শেল ফুটি রৈল বুকে।
৩। পহিলে পিয়া মোর মুখে মুখে হেরল তিলেক না ছোড়ল অঙ্গ।
অপরূপ প্রেমপাশে তনুতনু গাঁথল অব তেজল মোর সঙ্গ।

সঙ্কেতস্থানে গিয়া কানুর প্রতীক্ষায় শ্রীমতীর মনে নৈরাশ্যের বেদনার সঙ্গে যে সংশয়ের বেদনা জাগিতেছে—তাহা আরও সাংঘাতিক।

বন্ধুরে লইয়া কোরে রজনী গোঙাব এই সাধে নিরমিলুঁ আশাঘর।
কোন কুমতিনি মোর এ ঘর ভাঙ্গিয়া দিল আমারে পেলিয়া দিগম্বর।
বন্ধুর সঙ্গেতে আমি এ বেশ বনাইলুঁ গো সকল বিফল ভেল মোয়।
না জানি বন্ধুরে মোর কেবা লৈয়া গেল গো এ দার সাধিল জানি কোয়।

শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে সম্ভোগ-চিহ্ন ও অন্যান্য নিদর্শন দর্শনে শ্রীমতীর সংশয় সত্য বলিয়াই স্থির হইল।

নখগুণ সহিত সঘনে তনু দাহল রতিচিহ্ন হেরি প্রতি অঙ্গে।
চম্পতি পৈড় কপূর দব না দিলব তব মীলব হরি সঙ্গে।

শ্রীমতী বুঝিলেন—আমারি বঁধুয়া আন বাড়ী যায় আমারি আঙিনা দিয়া। তারপর খণ্ডিতার বেদনা—'ন মানিনী সংসহতেঽন্যসঙ্গমম্।' ইহা শ্রীমতীর নারী-মর্যাদায় দারুণ আঘাত।—ইহার বেদনা অপরিসীম। দারুণ বেদনায় শ্রীমতী বলিলেন—"দূরে রহ দূরে রহ প্রণতি আমার।"

চণ্ডীদাস বলিয়াছেন—"বলিলা কেমনে? চোর ধরিলেহ এত না কহে বচনে।" ইহার পর মান। স্বখাত হইলেও মান ব্যবধান। এই ব্যবধানের বিরহ দেশকাল-গত সাধারণ বিরহের চেয়েও দারুণতর। মানে বসিয়া শ্রীমতী শ্যামকে যে দণ্ড দিলেন—তাহার চেয়ে শতগুণ দণ্ড দিলেন নিজেকে।

মানের গানও বিরহেরই গান—তাই বেদনাঘন। অভিমানের ফলে শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যভিমান। তাহার ফলে কলহান্তরিতার বেদনা। মানভুজঙ্গের দংশনের জ্বালা ত কম নয়। "কবলে কবলে জিউ জরি যায় তায়।"
শ্রীমতী হাহাকার করিতেছেন—

কুলবতি কোই নয়নে জনি হেরই হেরত পুন জনি কান।
কানু হেরি জনি প্রেম বাঢ়ায়ই প্রেম করই জনি মান।
সজনি কাহে মোহে দুরমতি ভেল।
দগধ মান মঝু বিদগধ মাধব রোখে বিমুখী ভৈগেল।
গিরিধর নাহ কণ্ঠ ধরি সাধল হাম নহি পালটি নেহারি।
হাতক লছিমী চরণ পর ডারলুঁ অব কি করব পরকারি।

শ্রীমতী আর বেদনা সহিতে পারেন না। সো মুখচান্দ হৃদয়ে ধরি বৈঠব কালিন্দী বিস-তুর-নীরে। তারপর মানান্ত অবশ্য মিলন হইয়াছে। কিন্তু এই মিলনের গান উল্লাসরসে উচ্ছ্বসিত হয় নাই। কারণ, মানের ছায়া এ মিলনের উপর হইতে একেবারে অপসারিত হয় না। With some pain fraught থাকিয়া যায়। তাই রাধামোহন ঠাকুর এ মিলনকে বলিয়াছেন—'চরবণ তপত কুশারি।' কবিরাজ গোস্বামীর ভাষায়—তপ্ত ইক্ষু চর্বণ।

মানান্ত-মিলনের কথা ছাড়িয়া দিই। সহজ মিলনেই বা সুখ কই?

সজনি অব হাম না বুঝি বিধান।
অতিশয় আনন্দে বিপিন ঘটাওল হেরইতে ঝরয়ে নয়ান।
দারুণ দৈব কয়ল দুহুঁ লোচন তাহে পলক নিরমাই।
তাহে অতি হরষে দুহুঁ দিঠি পূরল কৈসে হেরব মুখ চাই।
তাহে গুরু দুরুজন লোচন কণ্টক সতত করহুঁ বিথার।
কুলবতি বাদ বিবাদ করত কত ধৈরজ লাজ বিচার।

তারপর প্রেম-বৈচিত্ত্য আছে—মিলনের মধ্যে তাহা হাহাকারের সৃষ্টি

করে। ভুজপাশে থাকিয়াও রাধা—'বিলাপই তাপে তাপায়ত অন্তর বিরহ পিয়ক করি ভান।' 'আঁচলক হেম আঁচলে রহু বৈছন খোজি ফিরত আন ঠাঞি।' সব চেয়ে মিলনে বিচ্ছেদের ভয়।—হারাই-হারাই ভাব। মিলনের মাধুর্য্য—অশ্রুজলে লবণাক্ত করিয়া দেয়। "প্রাণ কাঁদে বিচ্ছেদের ডরে।" "দুহুঁ ক্রোড়ে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।" চরম প্রাপ্তি না হওয়া পর্য্যন্ত মিলনেও তৃপ্তি নাই।

জনম অবধি হাম রূপ নেহারনু নয়ন না তিরপিত ভেল।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়া রাখনু তবু হিয়া জুড়ন না গেল॥

বর্ত্তমান যুগের কবির ভাষায়—

লাখ লাখ যুগ ধরি রাখি হিয়া হিয়া পরি হিয়া না জুড়ায়
মলয়জ চুয়া চীর ব্যবধানে সে অধীর প্রাণ পুড়ে যায়॥
নিমেষ অন্তর হ'লে কোটি কল্প যুগ ব'লে মনে হয় তারে।
সোহাগের বাণী যত কণ্ঠে এসে পরিণত হয় হাহাকারে।
মিলনে কোথায় স্বস্তি তুষানলে মজ্জা অস্থি পুড়ে হয় ছাই।
গ্রাসে তৃপ্তি পায় নয় গ্রাসে তুষ্টি, শুধু ভয়—হারাই হারাই।
এই প্রেমে কোথা সুখ? দ্রবীভূত হয় বুক এতে পলে পলে।
চুম্বনের সুধা তায় লবণাক্ত হয়ে যায় নয়নের জলে।
হাসিতে হাসি না আসে কামনা পলায় ত্রাসে ছিঁড়ে ফুলহার।
ভূষণে দূষণ বলি মনে হয়, যায় জ্বলি উৎসব-সম্ভার।
এ প্রেম বাধায় গড়া, মরণে বরণ করা অসহ্য জ্বালায়।
উল্লাস করিতে আসি নয়নের জলে ভাসি সখীরা পালায়।
শঙ্কর-গৌরীর তপ করে ইষ্টনাম জপ এ গভীর প্রেমে।
কণ্ঠে জুড়িয়া স্বর, অবশ পাণিতে স্বর রয়ে যায় থেমে।
বিরহ-নিদাঘ শেষে মিলন বরষা এসে কাঁদায় কাঁদিয়া।
দুহুঁ দোঁহা বুকে বাঁধে দুহুঁ ক্রোড়ে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।

মাথুর বেদনার কথা আর বলিলাম না। বেদনার সব নদীধারা যে মহাব্যথা-সিন্ধুতে মিশিয়াছে তাহার কথা না বলাই ভালো।

বেদনার কালিন্দী কূলে যে নিত্যলীলা—তাহারই সাহিত্য বৈষ্ণব সাহিত্য।

পদাবলী সাহিত্যের মধ্যে লালসার গীতি যে নাই তাহা নয়, কিন্তু সেগুলি যেন বিরহকেই গভীরতর করিয়া দেখাইবার উদ্দেশ্যে একটা প্রত্যাস্বাদের সৃষ্টির জন্য। বড়ু চণ্ডীদাসের রচনা পদাবলী সাহিত্যের মধ্যে পড়ে না। বিদ্যাপতির রচনাও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাদর্শের বাহিরে। গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস ইত্যাদির রচনায় কিছু কিছু লালসার জ্বালা আছে। অন্যদিকে তেমনি রাধাকৃষ্ণের প্রণয়কে যৌনবোধ-স্পর্শশূন্য করা হইয়াছে। লোচনদাস বলিয়াছেন —'আমায় নারী না করিত বিধি তোমা হেন গুণনিধি লইয়া ফিরিতাম দেশে দেশে।' রায় রামানন্দ বলিয়াছেন—প্রথমে নয়নের রাগে অনুরাগের সূত্রপাত হইয়াছিল বটে, কিন্তু 'অনুদিন বাড়ল অবধি না গেল।' "বৈছনে বাড়ত মৃণালক সূত" বাড়িতে বাড়িতে সে প্রেম অতি সূক্ষ্মভাব ধারণ করিল। তারপর—সে যে রমণ এবং আমি যে রমণী এ দ্বৈতভাব পর্যন্ত বিলুপ্ত হইল। এমন কি বিদ্যাপতি পর্যন্ত রাধার প্রেমকে শেষ পর্যন্ত নির্লালস করিয়া চিত্রিত করিয়াছেন। "অনুখন মাধব মাধব সুমরিতে সুন্দরী ভেলি মাধাই। ও নিজ ভাব স্বভাব হি বিসরল আপন গুণ লুবধাই। আপন বিরহে আপন তনু জরজর জীবইতে ভেল সন্দেহা।" তারপর ভাবসম্মিলনের পদে এই কবিগণই লৌকিক প্রেমের প্রাকৃতরূপ একেবারে হরণ করিয়া ফেলিয়াছেন। বৈষ্ণব পদাবলীর যাহা কিছু উৎকৃষ্ট—যাহা প্রধান অঙ্গ, তাহা কামনার গান নয়—বিপ্রলম্ভাত্মক অনুরাগের বেদনারই গান।
